সমরেশ মজুমদার

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ★ কলিকাতা-৭৩

—ত্রিশ টাকা—

পি, টি এস
জি, টি, প্রিন্টার্স প্রাঃ লিঃ
৩৩ ১এ, ডাক্তার লেন,
কলিকাতা ১৪

প্রচ্ছদপট
প্রচ্ছদ অলঙ্করণ—পূর্ণেন্দু রায়
ব্লক মুদ্রণ—নিউ ইণ্ডিয়ান প্রসেস
পুস্তক অলঙ্করণ
সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
ও
পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

ANI
An abridged juvenile edition of the novel
Utteradhikar by Samaresh Majumder
Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd. of
10 Shyama Charan Dey Street. Calcutta 700 073
ISBN 81-7293-019-4

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে এস এন
রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও জয়ন্ত বাকচি কর্তৃক পি এম বাকচি অ্যাণ্ড কোম্পানি
প্রাইভেট লিমিটেড ১৯ গুলু ওস্তাগর লেন, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

ছেলেবেলা
সেই সুন্দর ছেলেবেলা

এই লেখকের ছোটদের বই

- কিশোরসাহিত্য সমগ্র
- লাইটার
- দেড়দিন
- জুতোয় রক্তের দাগ
- শয়তানের চোখ
- ভগবানের ভাইবোন
- খুন খারাপি
- সীতাহরণ রহস্য
- হাঙরের পেটে হীরে
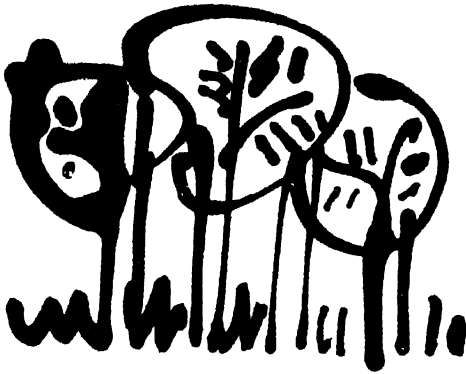
‘উত্তরাধিকার’ উপন্যাসটির বিপুল জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও আমার মনে একটা অস্বস্তি থেকেই গিয়েছিল। আট থেকে পনেরর অনিকে তার সমবয়সী পাঠকের হাতে তুলে দিতে অনেক অভিভাবক দ্বিধা করছেন। বড়দের জন্যে লেখা উপন্যাসের জটিলতা ছোটদের বোঝার কথাও নয়, অথচ অনির ছেলেবেলা আমাদের সবার স্মরণীয় দিন।

আর এই কারণেই সমবয়সীদের হাতে তুলে দিতে নতুন করে সম্পাদিত হল ‘অনি’। যে সোনার ছেলেবেলা তার অজস্র কৌতূহল, রেখাতে এবং সারল্য নিয়ে আমরা কাটিয়ে এসেছি তাই এখনকার কিশোরদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমি ধন্য।

আমি বিশ্বাস করি প্রতিটি দশ বারো বছরের বুকে যে রোমাণ্টিক হৃদয় শব্দ করে চলে তা অনিরই হৃদয়ের প্রতিধ্বনি।

সমরেশ মজুমদার

অনি

কাছাকাছি কোথাও বৃষ্টি হয়েছে। হয়তো ভুটানের পাহাড়ে বৃষ্টি নেমেছে। ঠান্ডা হাওয়া বইছে। পুরো হাতওয়ালা হলুদ পুলওভার পরে অনি দেখল দিনটা ফুরিয়ে যাচ্ছে। বাড়ির সামনে পাতাবাহারের গাছগুলোর ওপর নেতিয়ে পড়া হলুদ রোদটা কোথায় হারিয়ে গেল টুক করে। আরো দূরে, আঙরাভাসা নদী জড়িয়ে বিরাট খুঁটিমারীর জঙ্গলের মাথায় লাল বলের মত যে সূর্যটা হঠাৎ উঁকি দিয়েছিল একবার, যাকে সকাল থেকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে রাখতে চেয়েছিল ও, কেমন করে ব্যাডমিন্টনের কর্কের মত ঝুলে পড়ল ওপাশে, একরাশ ছায়া ছড়িয়ে দিল চারধারে। অনির খুব কান্না পাচ্ছিল।

খালি পায়ে বাড়ির পেছনে চলে এল অনি। ঘাসগুলো কেমন ঠান্ডা, নেতানো। পায়ের তলায় সিরসির করে। চটি না পরে বেরুলে মা রাগ করবেন, কিন্তু অনি জানে এখন ওদের কাউকে পাওয়া যাবে না। এই বিরাট কোয়ার্টারটার ঠিক মধ্যিখানের ঘরে এখন সবাই বসে গোছগাছ করছে। এদিকে নজর দেবার সময় নেই কারো।

এই বাড়িটার চারপাশে শুধু গাছপালা। দাদু এখানে এসেছিলেন প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগে। সব কটা গাছের আলাদা আলাদা গল্প আছে, মন ভালো থাকলে দাদু সেগুলো বলেন। এই যে বিরাট ঝাঁকড়া কাঁঠালগাছ ওদের উঠোনের ওপর সারাদিন ছায়া ফেলে রাখে, যার গোড়া অবধি রসালো মিষ্টি কাঁঠাল থোকা থোকা হয়ে ঝুলে থাকে, সেটা বড় ঠাকুমা লাগিয়েছিলেন।

প্রায় চল্লিশ বছর বয়স হয়ে গেছে গাছটার। প্রথমদিকে নাকি মাটির নিচে কাঁঠাল হতো, পেকে গেলে ওপরের মাটি ফেটে যেত—গন্ধে চারদিক ম-ম করতো তখন। রাত্তিরবেলায় শেয়াল আসতো দল বেঁধে সেই কাঁঠাল খেতে। বড় ঠাকুরমা শুয়ে শুয়ে চিৎকার করতেন তখন। শেষ পর্যন্ত দাদু কাঁঠাল গাছের ওপরে একটা টিনের ছোট ড্রাম বেঁধে দিয়েছিলেন। সেই

ড্রামের মধ্যে একটা ঘন্টা দড়িতে বাঁধা থাকতো। দড়িটা টিনের ছাদের নিচ দিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে খাটের সঙ্গে বাঁধা ছিল। ভালো থাকলে দাদু হেসে বলেন, 'রাতদুপুরে ঘুম ভেঙ্গে গেলে দেখতাম তোমার ঠাকুমা শুয়ে সেই দড়ি টানছেন আর বাইরে প্রচন্ড শব্দ করে ড্রামটা বাজছে। শেয়ালের সাধ্য কি এর পরে আসে!'

খিড়কি দরজা দিয়ে বেরুতেই ও কালী গাই-এর হাম্বা ডাক শুনতে পেল। এমন মানুষের মত ডাকে গরুটা, বুকের মধ্যে কেমন করে ওঠে। কালী দাঁড়িয়ে আছে গোয়ালঘরের সামনে। ওর ছেলেমেয়েরা কোথায়? বেশী গরু বাড়তে দেন না মা। চারটের বেশী হয়ে গেলে লাইন থেকে পাতরাস আসে, হাটে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেয়। সে টাকা মায়ের কাছে জমা থাকে— গরুগুলো সব মায়ের। কালীকে বিক্রি করা হবে না কখনো। দুধ দিক বা না দিক, ও এখন বাড়ীর লোক হয়ে গিয়েছে।

অনি দেখল কালী বড় বড় চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ওর চোখ দুটো আজ এত গম্ভীর কেন? বুকের মধ্যে কেমন কবে উঠল অনির। ও কি কিছু বুঝতে পেরেছে? গরুরা কি টের পায়? হাত বাড়ালো অনি, সঙ্গে সঙ্গে মুখটা ওপরে তুলে ধরল কালী। গলার কম্বলে হাত বোলালো অনি অনেকক্ষণ। নাক দিয়ে শব্দ করছে কালী। রোজ যে রকম আদর খাবার মুখ করে ও, সে রকমটা ঠিক না। যেন ও সত্যিই বুঝতে পারছে অনি চলে যাবে এখান থেকে। আস্তে আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আবার হাঁটতে লাগল অনি। বড় বড় মাথাসমান আকন্দ গাছগুলো গোয়ালঘরের চারপাশে বেড়া দিয়ে লাগানো হয়েছে। অনি সেগুলো পেরিয়ে আসতে আসতে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, কালী ঘুরে দাঁড়িয়ে ওকে একদৃষ্টে দেখছে। অনি দৌড় লাগালো।

গোয়ালঘরের পেছন দিকে কোন বাড়িঘর নেই। বড় বড় জঙ্গলে গাছের সঙ্গে আম কুল ছড়িয়ে আছে। এখন আলো প্রায় নেই বললেই চলে। দৌড়ে আসতে আসতে অনি সেই ডাহুকটার গলা শুনতে পেল। রোজকার মত কেমন নিঃসঙ্গ গলায় ঝাঁকড়া কুলগাছটার তলায় বসে একটানা ডেকে যাচ্ছে। ডাহুকটার গলার কাছটা সাদা থালার মত। অনেকদিন দেখেছে অনি। ঝাড়িকাকু বলে ডাহুকের মাংস খেতে নাকি খুব ভাল। গুলতি দিয়ে মারার চেষ্টা করেও পারেনি ঝাড়িকাকু। ভীষণ চালাক ডাহুকটা। এখন প্রায় সন্ধ্যে হওয়া সময়টায় ডাহুকটার গলার শব্দে কেমন বিষণ্ণ লাগছিল

চারপাশ।

অনি আঙরাভাসা নদীর গায়ে রাখা কাপড়-কাচার পাথরটার ওপরে এসে দাঁড়াল। চকচকে ঢেউগুলো যেন ওদের স্কুলে নতুন আসা গম্ভীর-দিদিমণির মত দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে কোনদিকে না তাকিয়ে। ঝুঁকে পড়ে নিজের ছায়া দেখল ও আঙরাভাসার কালো জলে। মাকে লুকিয়ে ওরা প্রায়ই এই নদীতে স্নান করে। ছোট ছোট নুড়ি-বিছানো হাঁটুজলের নদী। এর কোথায় কি পাথর আছে বা না আছে অনি জানে। সেই হলদে রঙের বড় বড় পাথরগুলোর নিচে লাল লাল চিংড়িগুলো গুঁড়ি মেরে পড়ে থাকে, হাত বাড়ালেই হল. রোজকার মত অনি আর ধরতে পারবে না। যাবার বাকি দিনগুলো কেমন দ্রুত. মুখের ভিতব নরম চকোলেটেব মত দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে। অনির ভীষণ খারাপ লাগছে. ভীষণ।

এখন এখানে কেউ নেই। আঙরাভাসার দুপারে বড় বড় আমগাছগুলোতে ফিরে আসা পাখিরা জোরালো গলায় চেঁচামেচি করে নিচ্ছে শেষবার। অদ্ভুত একটা আঁসটে গন্ধ উঠছে নদীর গা থেকে। চওড়ায় পনেরো ফুট, তীব্র স্রোতের এই নদী চলে গেছে নিচে চা-ফ্যাক্টরীর ভিতর দিয়ে। ফ্যাক্টরীর বিরাট হুইলটা চলছে এব স্রোতে। বলতে গেলে স্বর্গছেঁড়ার হৃদ্‌স্পন্দনের মত এই নদীর ঢেউগুলো। অথচ ওরা পায়ের তলায় নড়বড়ে পাথর রেখে কতবার পার হয়ে যায়। ওপাশের লাইনেব মদেসিয়া মেয়ের দল যখন নদী পেরিয়ে এপারে আসে তখন ওদের হাঁটু অবধি নামা কালো

কাপড়ের ঘেরটা পদ্মপাতার মত স্রোতে ভাসে। কাপড়টাকে ওরা বলে আঙরা। নদীর নাম তাই আঙরাভাসা। এতো স্রোত আর জল কম, তাই বড় মাছেরা এদিকে আসে না। তবু একটা জলজ আঁষটে গন্ধ বেরোয় নদীর গা থেকে। চোখ বন্ধ করলে জলের শব্দ খঞ্জনীর মত বেজে যায়।

পুলওভার গুটিয়ে উবু হয়ে চট করে কাপড়কাচা পাথরটা তুলে ধরল অনি। হালকা চ্যাপ্টা পাথর। সামান্য ঘোলা জল সরে গেলে অনি দেখল একটা বিরাট দাড়াওয়ালা কালো কাঁকড়া, গোল গোল চোখ তুলে জলের তলায় বসে ওকে দেখল সেটা। তারপর নাচের মত পা ফেলে ফেলে সরে যেতে লাগল সেটা নদীর ভিতরে। একগাদা চুনো মাছের বাচ্চা খলবলিয়ে চলে গেল। ছোট সাদা পাথরের ফাঁক দিয়ে লম্বা শুঁড়ওয়ালা একটা লাল চিংড়িকে দেখতে পেল অনি। হঠাৎ মাথার ওপর থেকে পাথরের ছাদটা উঠে যেতে বেচারা বুঝতে পারছিল না কি করবে। বাঁ হাতে পাথরটাকে দাঁড় করিয়ে রেখে ডান হাতে খপ্‌ করে ধরে ফেলল ও মাছটাকে।

পাথরটাকে নামিয়ে দিয়ে আবার উঠে বসল তার ওপর। হাতের মুঠোয় চিংড়িটা ছট্‌ফট করছে। পেটের তলায় অজস্র পায়ের মত শুঁড়গুলো নাচাচ্ছে এখন। নাকের কাছে নিয়ে এল অনি, চমৎকার জলের গন্ধ। কি ভীষণ কষ্ট হচ্ছে বুকের মধ্যে, এই চিংড়িটাকে আর কোনদিন সে দেখতে পাবে না। হাতের মুঠোটাকে জলের মধ্যে রাখল অনি। আঙুলের ফাঁক গলে জল ঢুকছে। চিংড়িটা মোচড় দিচ্ছে খুব। হাত ওপরে তুলতেই জল বেরিয়ে যেতেই চিংড়িটা লাফ দিল হঠাৎ। আর সেই সময় গলার শব্দ পেল ও। চোখ তুলে তাকাতেই অনি দেখল ওপারে জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে টুকরি কাঁধে দুটো মদেসিয়া মেয়ে ঘাটে আসছে। ফ্যাক্টরী বোধ হয় ছুটি হল। মেয়ে দুটো মা-মেয়েও হতে পারে। তপুপিসীর মত ছোটটার বয়স। টুকরিটা পাড়ে রেখে ওরা চট করে ঠান্ডা জলে নেমে পড়ল। জল ছিটিয়ে মুখ ভেজাল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে অনিকে দেখল। ছোট মেয়েটা বড়কে আঙুল দিয়ে অনিকে দেখালো, 'বুড়ো বাবাকে লাতি।'

অনি ঘুরে দাঁড়াল আর তারপর কোনদিকে না তাকিয়ে অন্ধকার নেমে যাওয়া মাঠের মধ্যে দিয়ে প্রাণপণে ছুটতে লাগল বাড়ির দিকে। পেছনে হঠাৎ মেয়ে দুটো হেসে উঠল গলা খুলে, 'সরমাতিস রে—এ ছোউয়া—হি-হি-হি!' ওদের গলার শব্দেই কিনা বোঝা গেল না, দৌড়োতে

দৌড়োতে অনি শুনল সেই ডেকে যাওয়া নিঃসঙ্গ ডাহুকটা হঠাৎ চুপ মেরে গেল, একদম চুপ।

উঠোনে ঢুকে অনি দেখল হ্যারিকেন জ্বালানো হয়ে গেছে। স্বর্গছেঁড়া চা-বাগানে এখনও ইলেকট্রিক আসেনি। শুধু ফ্যাক্টরীতে ডায়নামো চালিয়ে বাতি জ্বালানো হয়। মহীতোষ বাড়ির পেছনে সম্প্রতি একটা ছোট টিনের চালাঘর করেছেন। বড় শৌখিন মানুষ মহীতোষ, কলকাতা থেকে ডায়নামো আনার ব্যবস্থা করেছেন। এখন যে কোন দিনই সেটা এসে যেতে পারে। অয়ারিং হয়নি, এমনি তার ঝুলিয়ে ঘরে ঘরে বাতি জ্বালাবার ব্যবস্থা পাকা। এই রাত্তিরবেলায় তালগাছের মাথায় জমে থাকা অন্ধকার, কাঁঠাল গাছের ডালে ডালে যে অদ্ভুত রহস্যের ভূতটা দলা পাকিয়ে বসে থাকে—অনির ভীষণ ইচ্ছে করে ইলেকট্রিক জ্বললে সেগুলোকে কেমন দেখবে।

মহীতোষ ডায়নামো বসালে এটাই হবে এই তল্লাটের প্রথম ইলেকট্রিক-জ্বলা বাড়ি। স্বর্গছেঁড়া কেন, আশেপাশের কোন চা-বাগানের বাড়িতেই এখনো ইলেকট্রিক আসেনি। কিন্তু মুশকিল হল, কবে আসবে ডায়নামোটা? ওরা চলে যাবার পর এলে অনির কি লাভ হবে! বাবা কেন কলকাতায় তাগাদা দিয়ে চিঠি লিখছে না, এই তো কিছুদিন আগে ওদের বাড়িতে প্রথম রেডিও এল। ওদের বাড়ি মানে স্বর্গছেঁড়ায় প্রথম রেডিও এল। মহীতোষ নিজে ছুটিতে গিয়েছিলেন কলকাতায় বেড়াতে। ফেরার সময় বড়সড় রেডিও সেটটা কিনে নিয়ে এলেন। শুধু রেডিও সেট নয়, সঙ্গে একটা আলাদা স্পিকার। বাইরের ঘরে রেডিও বাজতো সেই রেডিও শুনতে ভিড় করে আসতেন বাবুরা। মহীতোষ ওর সঙ্গে একটা তার জুড়ে স্পিকারটাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন পঞ্চাশ গজ দূরে—আসাম রোডের কাছে। বড় কৃষ্ণচূড়া গাছের ডালে বেঁধে স্পিকারটা ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন।আর রাস্তা জুড়ে বসে যত মদেসিয়া কুলিকামিন ভিড় করে শুনতো,'অল ইন্ডিয়া রেডিও, কলকাতা।'

রেডিও আসার পর বাড়িটার চেহারাই যেন বদলে গেল। সরিৎশেখর সকাল বিকেল রেডিওর পাশে বসে থাকেন একগাদা বুড়ো নিয়ে, খবর শুনবেন। ছোট কাকু আধুনিক গান শুনবে চুপিচুপি, কেউ না থাকলে। রাত্রিবেলা নাটক হলে স্পিকারটা ভিতরবাড়িতে চালান করে দিয়ে মহীতোষ উচ্চগ্রামে রেডিও বাজিয়ে দেন। সেদিন সন্ধ্যের মধ্যে রান্না শেষ করার তাড়া দেখা দেয় মা-পিসীদের মধ্যে। আটটা বাজলেই সব হাত পা গুটিয়ে বাবু হয়ে ভিতরের বারান্দায় শতরঞ্জি পেতে বসেন নাটক শুনতে। তখন কথা বলা নিষেধ—অনি নাটক শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে এক-একদিন। এখন অবশ্য শুধু এ বাড়ি নয়—নাটক শুনতে আশেপাশের সব কোয়ার্টারের মেয়েরা, সন্ধ্যের মধ্যে চলে আসে অনিদের বাড়ি। একটা শতরঞ্জিতে আর কুলোয় না এখন। সঙ্গের বাচ্চাদের একজোট করে মা বলেন, 'অনি, যাও, এদের সঙ্গে খেলা কর।' বিচ্ছিরি লাগে তখন। বরং বাইরের ঘুটঘুট্টি অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে নাটক শুনতে শুনতে, রেডিও ফাটিয়ে একটা গলা যখন চিৎকার করে কাঁদে—'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল' তখন বুকের মধ্যে কেমন করে ওঠে। মাকে আঁচলে চোখ মুছতে দেখে নিজেরই কান্না পেয়ে যায়।

এখন বাইরের ঘরে রেডিও বাজছে না। সরিৎশেখর বা মহীতোষ ফেরেননি এখনও। তুলসীগাছের নীচে প্রদীপ জ্বালা হয়ে গিয়েছে। ভিতরের বারান্দায় উঠতেই মা বললেন, 'হ্যাঁরে— কোথায় ছিলি এতক্ষণ?' অনি কোন কথা বলল না। দৌড়ে আসার জন্য ওর ফরসা মুখ লাল-লাল দেখাচ্ছিল। রান্নাঘরে যেতে যেতে মা আবার বললেন, 'খিদে পেয়েছে?' অনি ঘাড় নাড়লো, তারপর বাইরে চলে এল।

বাইরের ঘরে বিরাট হ্যারিকেন জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। সামনে পাতাবাহারের গাছের পাশে যে ক্লাবঘর, তার দরজা খুলে ঝাটফাট দিয়ে ঝাড়িকাকু হ্যাজাক জ্বালাচ্ছে উবু হয়ে বসে। ওপাশে অন্ধকারে ডুবে থাকা আসাম রোড দিয়ে হুস হুস করে একটার পর একটা গাড়ি পালিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। অনি দেখল আজ জোনাকি জ্বলেনি। হ্যাজাকটা জ্বেলে তারের আংটায় ঝুলিয়ে দিল ঝাড়িকাকু। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চত্বরটা দিনের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। হ্যাজাকের তলায় ঝাড়িকাকুকে কেমন বেঁটে লাগছে। হাঁটু অবধি ঢোলা হাফ প্যান্ট আর ফতুয়া গায়ে দিয়ে মুখ উঁচু করে

ঝাড়িকাকু হ্যাজাকটা দেখছে।

ঠিক এই সময় সাইকেলের ঘন্টিগুলো শুনতে পেল। চা-বাগানের ভিতর দিয়ে সাদা নুড়ি বিছানো যে রাস্তাটা ফ্যাক্টরীর মুখে গিয়ে পড়েছে, সাইকেলগুলো সেই রাস্তা দিয়ে আসছিল। অন্ধকার হয়ে যাওয়া চরাচরে এখন সবে জ্বলে ওঠা তারার আলো একটা আবছা ফিকে ভাব এনেছে, যার জন্য এতদূরে ওদের বারান্দায় দাঁড়িয়েও অনি চা-গাছগুলোর মধ্যে মধ্যে বসানো শেড্‌ট্রিগুলোকে বুঝতে পারল। দশ-বারোটা সাইকেল পর পর আসছে ঘন্টি বাজাতে বাজাতে। মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে রাস্তা দেখে নিচ্ছে ওরা। প্রায় দেড় মাইল লম্বা এই রাস্তার দুধারে ঘন চা-গাছ আর শেড্‌ট্রি। সন্ধ্যের পর একা বড় একটা কেউ যায় না।

ছ'টার ভোঁ বেজে গেলে বাবুরা দল বেঁধে সাইকেলে চেপে বাড়ি ফেরেন। এখন একটু একটু হাওয়া দিচ্ছে। সামনের মাঠে একা দাঁড়িয়ে থাকা লম্বাটে কাঁঠালিচাঁপা গাছে একদল ঝিঁ ঝিঁ করাত চালানোর মত শব্দ করে যাচ্ছে। সাইকেলের ঘন্টিগুলো আরো জোর হল। তারপর একসময় ওরা মোড় ঘুরে চা-বাগানের গেট পেরোতেই অনি ওদের দেখতে পেল। পর পর সাজানো কোয়ার্টারের সামনে পড়ে থাকা বিরাট মাঠের মধ্যে ঢুকে সাইকেলগুলো এবার আলাদা হয়ে যাচ্ছে। এক-একটা টর্চের আলো ধারালো তলোয়ারের মত লম্বা হয়ে এক-একটা কোয়ার্টারের দিকে চলে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত বাবাকে দেখতে পেলো অনি। আবছা আবছা বাবার জামা প্যান্ট দেখা যাচ্ছে। সাইকেলের গতি কমিয়ে টর্চের আলো নিবিয়ে দিলেন মহীতোষ। তারপর বাড়ির সামনে লম্বা বেঞ্চিতে সাইকেলটাকে খাড়া করে বারান্দায় উঠে এলেন। বছর বত্রিশের যুবক মহীতোষ প্যান্ট পরেন, ফুলপ্যান্ট। এই চা-বাগানের কেউ তা পরে না। হাঁটু অবধি মোজা গার্টারে বাঁধা, খাকি হাফপ্যান্ট আর হাফহাতা বুশশার্ট এই হল এখানকার বাবুদের পোশাক। পাতিবাবু মশাবাবু—যাঁদের কাজ রোদ্দুরে ঘুরে ঘুরে, তাঁরা অবশ্য মাথায় একটা সোলার হ্যাট ঝুলোন। কিন্তু মহীতোষ এই বয়সে হাফপ্যান্ট পরতে রাজী নন। ফুলপ্যান্টের পায়ের কাছটা ক্লিপ দিয়ে গুটিয়ে রাখেন সাইকেল চড়ার সময়। সারামুখে নিটোল করে দাড়িগোঁফ কামানো, মহীতোষের মাথায় চুল নিগ্রোদের মতন কোঁকড়া। হাসতে গেলে গজদাঁত দেখা যায়। বারান্দায় উঠে মহীতোষ ছেলেকে দেখে বললেন, 'আজ রাত্রে

নদী বন্ধ হবে, বুঝলি!' বলে অনির মাথায় হাত বুলিয়ে ভিতরে চলে গেলেন।

হাঁ করে তাকিয়ে থাকল অনি। নদী বন্ধ হবে মানে আঙরাভাসা আজ বন্ধ করে দেওয়া হবে। এর আগে গত বছর, তখন অনি অনেক ছোট ছিল, আঙরাভাসাকে বন্ধ করা হয়েছিল। সেটা হয়েছিল শেষরাতে। অনিরা সবাই ঘুমিয়ে ছিল। শুধু পরদিন সকালে ঝাড়িকাকু এক ড্রাম ভর্তি চিংড়ি আর কাঁকড়া এনে দেখিয়ে যখন বলল নদী বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে ওগুলো ধরা গেছে তখন এক দৌড়ে আঙরাভাসার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ভীষণ আফসোস হয়েছিল অনির।

খটখট করছে নদী কোথাও এক ফোঁটা জল নেই। ভিজে শ্যাওলা আর নুড়ি-পাথরের ওপর কয়েকটা কুকুর কি শুঁকছিল। পায়ে পায়ে নদীর ঠিক মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে ছিল অনি। চারদিকে শুকনো পাথর, ছবিতে দেখা কঙ্কালের মত লাগছিল নদীটাকে। এমন সময় পায়ের তলায় কি সুড়সুড় করতে অনি দেখল একটা ছোট্ট লাল কাঁকড়া গর্ত থেকে মুখ বের করছে। অনিকে দেখেই সেটা সুড়ুৎ করে ভিতরে ঢুকে গেল। এখানে ওখানে কিছু চুনো মাছ, গেঁড়ি শুকিয়ে পড়ে আছে। অনির খুব আফসোস হচ্ছিল তখন, যদি সে দেখতে পেত হঠাৎ জল শেষ হয়ে যাওয়াটা! মাছগুলো তখন কি করছিল? তারপর আবার রাত্তির হলে জল ছাড়া হয়েছিল নদীতে। সেটাও অনি দেখতে পায়নি। পরদিন সকালে গিয়ে দেখলে ঠিক আগের মতন যে-কে সেই। কুলকুল·করে স্রোত বইছে। শুধু কাপড়কাচার পাথরের নিচে কোন মাছ ছিল না এই যা। বছরে একবার এই রকম হয়।

শ্মশানের কালীবাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে আসা আঙবাভাসা নদীটাকে শুয়োরকাটা মাঠের পাশে দু ভাগ করে দেওয়া হযেছে। এক ভাগ গেছে নিচে ধানের জমির গা দিয়ে দু নম্বর কুলি লাইনের পাড় ঘেঁষে ড়ুড়ুয়া নদীতে। আর অন্য বাঁকটার মুখে সিমেন্টের বাঁধ মত করে তার তলা দিয়ে জল আনা হয়েছে ফ্যাক্টরীতে। স্রোতটা এদিকেই বেশী। ফ্যাক্টরীর সেই বিরাট হুইলটায় যখন আবর্জনা জমে জমে পাহাড় হয়ে যায় তখন বাঁধের মুখটা বন্ধ করে দেওয়া হয়। জল তখন ওপাশে চলে যায় —এদিকটা খটখটে। ফ্যাক্টরীতে তখন হুইল পরিষ্কার করবার কাজ চলে।

আজ আবার নদী বন্ধ হবে। কখন? উত্তেজনায় পায়েব তলা সিরসির

করে উঠল অনির। আজ দেখতেই হবে। অনি ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে আর একটা টর্চের আলো দেখতে পেল। মহীতোষ বাড়িতে এসে রেডিও চালিয়ে দিয়েছেন। কি একটা আসর হচ্ছে এখন। অনি দেখল একটা টর্চের আলো লাফাতে লাফাতে এগিয়ে আসছে। এই আলোটাকে অনি চেনে। অন্ধকারে নেমে পড়লো অনি। পায়ের তলায় ভিজে থাকা শিশির আর ঠান্ডা বাতাসে ওর শীত করছিল। এগিয়ে আসা টর্চের দিকে ও দৌড়াতে লাগল। ক্রমশ অনি অন্ধকার ফুঁড়ে এগিয়ে আসা একটা বিরাট লম্বাচওড়া শরীর দেখতে পেল। হাটুর নিচ অবধি ধুতি ঢোলা পাঞ্জাবী, হাতে লাঠি—সরিৎশেখর আসছেন। পেছনে ওঁর ব্যাগ হাতে বকু সর্দার। সরিৎশেখর হাঁটতে হাঁটতে দাঁড়িয়ে পড়লেন হঠাৎ। তারপর পাঁচ ব্যাটারীর টর্চ জ্বেলে সোজা করে ধরলেন সামনে। লম্বা আঁকশির মত আলোটা ছুটন্ত অনিকে টেনে নিয়ে আসছিল। যেন এক লাফে দূরত্বটা অতিক্রম করে অনি দাদুর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে টর্চ নিবিয়ে অনিকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে সরিৎশেখর বললেন, 'কি হয়েছে, দাদু?'

ফিসফিস গলায় বুকে মুখ রেখে অনি বলল, 'আজ আমি নদী বন্ধ হওয়া দেখব।'
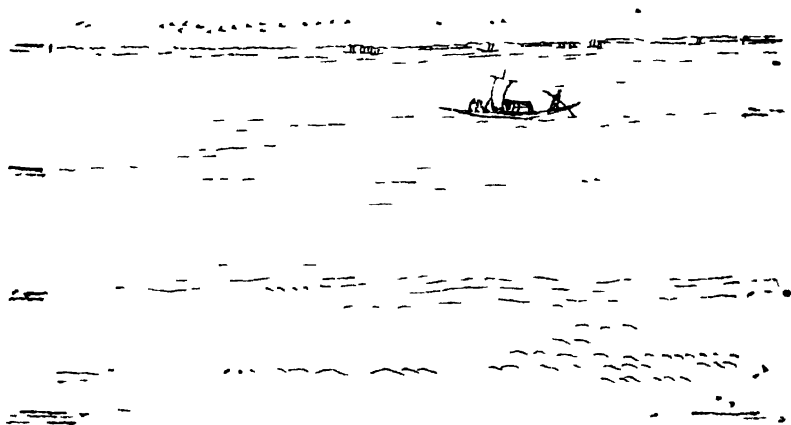
রান্নাঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে মা বললেন, 'অনি হাওয়া দিচ্ছে খুব, চটি পরে গলায় মাফলার জড়িয়ে যাও।'

তর সইছিল না অনির। একটু একটু ঠান্ডা বাতাস বইছে বটে তবে তার জন্যে মাফলার পরার দরকার হয় না। মায়ের সবতাতেই বাড়াবাড়ি। অবশ্য ওর টনসিলের ধাত আছে একটু, ডাক্তারবাবু ঠান্ডা কিছু খেতে নিষেধ করেছেন। তাই বলে এই হাওয়ায় আর কি হবে! এপাশের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ও মায়ের দিকে তাকাল। বারান্দার সিলিং থেকে ঝোলানো শিকে রাখা হ্যারিকেনের আলোয় মাকে কেমন দেখাচ্ছে। লাল শাড়ি পরেছে মা। কাপড়টা যেন সব আলো শুষে নিচ্ছে এখন। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে অনির বুকের ভিতর কেমন করে উঠল। আস্তে আস্তে ও ভিতরের ঘরে ঢুকে আলনা থেকে মাফলারটা টেনে গলায় জড়িয়ে নিল।

ঝাড়িকাকু একটা খালুই হাতে উঠোনে দাঁড়িয়েছিল। শীত-ফিত বেশী লাগে না ওর। পূজোর পর থেকে একটা আলোয়ান ফতুয়ার ওপর জড়িয়ে নেয়। এখন যে-কে সেই। 'তাড়াতাড়ি চল'। ঝাড়িকাকু ডাকল।

উঠোনে নেমে এল অনি। পিসীমার গলা পেল ও। নিজের ছোট ঘরে বসে এতক্ষণ পূজো করছিলেন, এইবার 'গুরুদেব দয়াকর দীনজনে' বলে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর অনিকে দেখতে পেয়ে বলে উঠলেন, 'তাড়াতাড়ি চলে আসিস বাবা, যা পচা শরীর তোর। ঝাড়িটারও খেয়েদেয়ে কাজ নেই, ছেলেটাকে নাচাল।'

ঝাড়িকাকু কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই অনি নেমে গেছে উঠোনে। ঝাড়িকাকু কি বিড়বিড় করে টর্চের আলো জ্বালালো। ছোট্ট টর্চ। প্রায় বিগড়োয়। ফ্যাকাশে আলো পড়েছে মাটিতে। আকাশ মেঘলা বলেই অন্ধকার বেশী লাগছে। এমন কি সামনের গোয়ালঘর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। ওঁরা হাঁটতে লাগল। একটু ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। অনি ঝাড়িকাকুর পিছনে যেতে যেতে হঠাৎ হাত বাড়িয়ে ওর ফতুয়ার কোণটা চেপে ধরল।

এরকম অন্ধকারে এর আগে কোনদিন হাঁটেনি ও।

গোয়ালঘরের পেছনে লম্বা গাছগুলোর তলা দিয়ে যেতে যেতে ওরা চিৎকারটা শুনতে পেল। দ্রুত পা চালাচ্ছিল ঝাড়িকাকু। প্রায় ছুটতে ছুটতে ওরা আঙরাভাসার পাড়ে এসে দাঁড়াল। আর দাঁড়াতেই একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল অনির। পুরো নদীটা জুড়ে যতদূর দেখা যায়, সেই ধোপার ঘাট পর্যন্ত, অজস্র হ্যারিকেন আর টর্চের আলো জোনাকির মত নাচছে। আচম্‌কা দেখলে মনে হয় যেন দেওয়ালির রাতটাকে কে উপুড় করে দিয়েছে নদীতে। সমস্ত কুলি লাইন ভেঙে পড়েছে এখানে। আঙরাভাসার দিকে তাকিয়ে কেমন বিশ্রী লাগল অনির। জল এখন পায়ের তলায়। কাপড়কাচা পাথরটা ভেজা নুড়ির ওপর পড়ে আছে। জল মাঝখানে। তাও কমে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

লাফ দিয়ে নেমে পড়ল ঝাড়িকাকু। একটি বিরাট লম্বা বানমাছ ঠিক সামনেটায় খলবল করছিল। একটা মদেসিয়া মেয়ে মাছটার দিকে এগোবার আগেই ঝাড়িকাকু বাঁ হাতে সেটাকে তুলে খালুইতে ঢুকিয়ে নিল। মেয়েটা চিৎকার করে গাল দিয়ে উঠল। হাত বাড়িয়ে ওকে ডাকল ঝাড়িকাকু। অনি ভেজা নুড়ির ওপর সাবধানে হেঁটে এল। পায়ের কাছে একটা পাথরঠোকা মাছ জল না পেয়ে লাফাচ্ছে। দুই-তিনবারের চেষ্টায় ওটাকে ধরে অনি ঝাড়িকাকুর খালুইতে ফেলে দিল।

'তোর তো রবারের চটি, জল লাগলে কিছু হবে না, তুই টর্চটা ধর। যেখানে ফেলতে বলবো সোজা করে আলো ফেলবি।' হাত বাড়িয়ে টর্চটা দিল ঝাড়িকাকু। জল এখন নেমে গেছে পুরোপুরি। শ্যাওলা আর ভাঙা ডাল-পালা নদীর বুকে ছড়িয়ে আছে এখন। মাঝে মাঝে কাদা জমেছে। স্রোতের সময় কাদা দেখা যায় না। অজস্র পোকামাকড় উড়ছে এখন। এরা সব কোথায় ছিল কে জানে। তিনটি মেয়ে দল বেঁধে হাতে কুপি জ্বেলে মাছ খুঁজছে। অনি দেখল ওরা খুব হিহি করে হাসছে। আলো পড়ে ওদের কালো শরীর চকচক করছে। ঝাড়িকাকুকে ক্ষেপাচ্ছে ওরা।

একটা গর্তের মুখে টর্চ ফেলতে বলল ঝাড়িকাকু। নদীর কিনারে চ্যাপ্টা পাথরের গা ঘেঁষে গর্তের মুখে। আলো ফেলে অনি দেখল তিন-চারটে মোটা মোটা পা গর্তের মুখে বেরিয়ে আছে। পকেট থেকে একটা শক্ত সুতো বের করে তার ডগায় একটু শ্যাওলা বাঁধলো ঝাড়িকাকু। তারপর

টানটান করে সুতো ধরে শ্যাওলাটাকে গর্তের মুখে নাচিয়ে নাচিয়ে ভিতরে ঢোকাবার চেষ্টা করতে লাগল। অনি দেখল চট করে পাগুলো ভিতরে ঢুকে গেল। গর্তের মধ্যে জমা জলে একটু বুদ্বুদ উঠল। আলোটা নিবিয়ে দিল অনি। যাঃ, চলে গেল!

কিন্তু ঝাড়িকাকু চাপা গলায় বলল, 'আঃ নেবালি কেন?' আবার আলো জ্বালালো অনি। চাপা নিঃশ্বাসের শব্দ কানে যেতে অনি দেখল মেয়ে তিনটে পেছনে এসে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী চোখে ব্যাপারটা দেখছে। ঝাড়িকাকুও ওদের দেখেছে, কিন্তু এখন তার মনোযোগ গর্তের দিকে। গর্তের মুখটাতে শ্যাওলাটাকে নাচাচ্ছে একমনে। হাত টনটন করতে লাগল অনির। মুখ ঘুরিয়ে ও নদীর চারপাশে তাকাল। আজ রাতে আর নদীতে কোন মাছ পড়ে থাকবে না। লণ্ঠন কুপি আর টর্চের আলোয় নদীটা পরিষ্কার। হঠাৎ তিনটে মেয়ে একসঙ্গে হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠতেই অনি চট করে মুখ ফেরাল। ঝাড়িকাকু একগাল হেসে হাতটা মাথার ওপরে তুলে ধরেছে। আর সুতোর শেষে মাটি থেকে ওপরে একটা বিরাট কাঁকড়া খলবল করে ঝুলছে। শেষ পর্যন্ত সেটা সুতো ছেড়ে পাথরের নুড়ির ওপর পড়তেই ঝাড়িকাকু খালুইটা ওর ওপর চেপে ধরল। তারপর অতি সন্তর্পণে খালুই-এর তলা দিয়ে বেরিয়ে আসা মোটা দাড়া দুটো ধরে কাঁকড়াটাকে বের করে আনল। টর্চের আলোয় কুচকুচে কালো কাঁকড়াটাকে মুগ্ধদৃষ্টিতে দেখল অনি। এত বড় কাঁকড়া এর আগে কখনো দেখেনি সে। দুটো গোল গোল চোখ ঘুরিয়ে অনিকে দেখছে ওটা। খালুই-এর ভিতরে টপ করে ফেলে দিল ঝাড়িকাকু।

আধ ঘন্টার মধ্যেই খালুই ভরতি হয়ে গেল। বান, কাঁকড়া, পাথরঠোকা, চিংড়ি আর পেটমোটা পুঁটি এরকম কত মাছ।

ঝাড়িকাকু বলল, 'তুই এখানে দাঁড়া, আমি মাছগুলো বাড়িতে রেখে আসি।'

হঠাৎ অনির কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল। এই অন্ধকারে যদিও নদীতে প্রচুর মদেসিয়া আলো জ্বেলে ঘুরছে, তবু ওর শরীর সিরসির করতে লাগল। আবছা আলো-অন্ধকারে মানুষগুলোর মুখ স্পষ্ট করে চেনা যাচ্ছে না, কেমন রহস্যময় দেখাচ্ছে চারপাশ। ওরা ওদের ঘাটে কাপড়কাচা পাথরটার ওপর ফিরে এল। অনির পায়ের গোড়ালি অবধি কাদা মাখা,

রবারের চটি চপচপ করছে। ঝাড়িকাকুর ফতুয়া ধরে ও পাড়ের দিকে তাকাল। ফুলগাছ ডুমুরগাছ আর বুনো ফুলের গাছগুলোর মধ্যে চুপচাপ যে অন্ধকার জমে আছে সেদিকে চেয়ে ওর বুকের মধ্যে তিরতির করে উঠল। হঠাৎ একটা লম্বা মূর্তি সেই অন্ধকারে চলে গেল, পেছন পেছন আর একজন শাড়ি-পরা। মুখ দেখতে পেল না ও। মূর্তি দুটো অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। কারা ওরা? এটা তো ওদের দিকের পাড়। মদেসিয়ারা এখন নিশ্চয়ই এদিকে আসবে না।

ফিসফিস করে ও বলল— 'ঝাড়িকাকু'!

মুখ ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকাল ঝাড়িকাকু। কাঁচাপাকা সাত দিন না কামানো দাড়ি, হাফ প্যান্ট আর ফতুয়া পরা বেঁটে-খাটো এই মানুষটাকে অনির এখন খুব আপন মনে হচ্ছিল। এক হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে ঝাড়িকাকু বলল, 'কি হয়েছে?'

'ওরা কারা?' ফিসফিস করে বলল অনি। ভাল করে অন্ধকারে চোখ বুলিয়েও কিছু ঠাওর করতে পারল না ঝাড়িকাকু। অনির হাত থেকে টর্চ নিয়ে অন্ধকারে আলো ফেলল ও। ফ্যাকাশে আলো বেশী দূরে গেল না।

'কি দেখেছিস?' ঝাড়িকাকু জিজ্ঞাসা করল।

'একজন তারপর আর একজন। কারোর মাথা নেই।' অনি প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি।

'ও কিছু না,' ঝাড়িকাকু মাথা নাড়ল, 'রামনাম বল। ওঁরা হলে চলে যাবেন। মাছ বড় ভালবাসেন তো।' বলতে বলতে খালুইসুদ্ধ হাত জোড় করে নমস্কার করল। অনি মনে মনে রাম রাম বলতে শুরু ক'রে দিল এবার। এখানে এই নদীতে এত লোক, তবু সাহস হচ্ছে না কেন?

ঠান্ডা বাতাস যা এতক্ষণ বইছিলো এলোমেলো, হঠাৎ গাছের পাতা নাচিয়ে দিল এবার। না ঘুমুতে পারা পাখিগুলো নির্জন নদীতীরে হঠাৎ আসা একদল মানুষের চিৎকারে কিচিরমিচির করছিল এতক্ষণ, ডালপালা নড়ে উঠতেই ডানা ঝাপটাতে লাগল। হিমবাতাস নদীর মধ্যে নেমে একটা সোঁ সোঁ শব্দ তুলে চিরুনির মত গাছপালার ফাঁক গলে কোথায় উধাও হয়ে যাচ্ছিল। পুলওভার থাকা সত্ত্বেও অনির শীতবোধ হল।

ঝাড়িকাকু বলল, 'ডাক্তারবাবুর ছেলে হরিশ বড় মাছ খেতে ভালবাসত।' ঝাড়িকাকুর মুখের দিকে তাকাল অনি। অন্ধকার কালির মত

লেপ্টে আছে। ভাল করে বোঝা যাচ্ছে না। ডাক্তারবাবুকে অনি ভাল করেই চেনে। ডাক্তারবাবু আর দিদিমা, ওদের বাড়িতে কোন ছেলেমেয়ে নেই। তাহলে কার কথা বলছে ঝাড়িকাকু! কে হরিশ! এই নামের কাউকে চেনে না তো ও।

'হরিশ কে ? আমি দেখিনি তো!' অনি বলল।

'তুই দেখবি কি করে?' হাসলো ঝাড়িকাকু, 'তুই তো এই সেদিন হলি। তোর বাবার চেয়ে বছর তিনের ছোট ছিল হরিশ। সেই যেবার ডুডুয়া নদীতে যখন খুব জল বেড়ে গেল, রাস্তার ওপর জল উঠে বাস বন্ধ হল, সেবার এই কুলগাছের মাথা থেকে ধুপ করে পড়ে গেল ছোঁড়াটা। খুব ডানপিটে ছিল তো। আমি তখন এই ঘাটে বসে বাসন মাজছি। কাজ শেষ করে বাসন মাজতে তিনটে চারটে বেজে যেত। ভরদুপুরবেলা বাসন মাজছি বসে, হঠাৎ হরিশ এল। গাছটায় খুব কুল হতো তখন, পাতা দেখা যেত না। তা হরিশ তলার ডালের কুলগুলো শেষ করে দিয়েছিল পাকাব আগেই। হরিশ লাফ দিয়ে তরতর করে মগডালে চলে গিয়ে হাত বাড়িয়ে কুল ছিঁড়ে অর্ধেক খেয়ে আমাকে ঢিল মারছিল। ডাক্তারবাবুর ছেলে, আমি কি বলব বল্! ঐ মগডালে বসে বসে ও আমাকে বলল, ডুডুয়াতে জল কমে গেলে বানমাছ মারতে গেলে কেমন হয়? বানমাছ ধরার বঁড়শি আমার কাছে ছিল হরিশ জানতো। কর্তাবাবু কত-রকমের সুতো আর বঁড়শি শহর থেকে পোস্ট অফিস দিয়ে আনাতেন। আমি দুটো বঁড়শি চেয়ে নিয়েছিলাম। মুশকিল হতো বানমাছ বড়দি রান্না করতে চাইতো না কিছুতেই। ধরলে খাব কি করে? হরিশেব মা রান্না করে ভাল। বড়দি বলতো, ঢাকার মেয়ে তো, তাই পারে। আমি একদিন খেয়েছিলাম, বড় ঝাল! তা আমি বললাম, বড়দি যদি যেতে দেয় যাবো।' কথাটা বলে ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে অন্ধকারে দাঁড়ানো কুলগাছটার দিকে তাকাল ঝাড়িকাকু।

পিসীমাকে বড়দি বলে ঝাড়িকাকু। বাবা ছোট কাকারাও বড়দি বলে। এই সেদিন আগে পর্যন্ত শুনে শুনে অনিও বলত বড়দিপিসী। তখন কি ছোট ঠাকুমা ছিল না! মা সেই কুমড়ো নিয়ে দেশের বাড়িতে গিয়েছিল বলে মরে গিয়েছিল? মা তখন ছিল না এটা বুঝতে পারছে অনি। পিসীমা বলেন, চব্বিশ বছর বয়সে বাবার বিয়ে হয়েছিল। বাবা যখন কুল খেতো তখন

নিশ্চয়ই ছোট ছিল। অনি বলল,'তারপর?'

কথা বলার সময় ঝাড়িকাকুর একটা বাঁধানো দাঁত দেখতে পাওয়া যায়। রোজ ছাই দিয়ে দাঁত মাজে বলে চকচক করে। ঝাড়িকাকু বলল, 'বাসন মাজতে মাজতে হঠাৎ শুনতে পেলাম বুকফাটা চিৎকার। চমকে উঠে দাঁড়িয়ে দেখি হরিশ পড়ে যাচ্ছে। অত উচুঁ ডাল ভেঙে পড়ে যাচ্ছে হরিশ, আমি চেয়ে চেয়ে দেখলাম। পড়ে গিয়ে কেমন দলা পাকিয়ে গেল ও। আমি চিৎকার করে সবাইকে ডেকে আনলাম। ডাক্তারবাবু দুপুরে খেতে এসেছিলেন। চিৎকার শুনে ছুটে এলেন। সাহেবের গাড়ি করে জলপাইগুড়ি নিয়ে গেল যদি বাঁচানো যায়, পাগলের মত সবাই ছুটলো ওকে নিয়ে। ডুডুয়ার জল বেড়েছে সকাল থেকে, রাস্তার ওপরে জল, এত জল আগে কখনো হয়নি। সন্ধ্যেবেলা মড়া নিয়ে ফিরে এল ওরা, যেতে পারেনি। তা হরিশ চলে যাবার তিন দিন পরই ঘটে গেল ব্যাপারটা। তখন কর্তাবাবু লোক দিয়ে এই ঘাটে খড়ের ছাউনি করে দিয়েছিলেন। বৃষ্টিবাদলায় ভিজতে হবে না বলে। সেদিন রাত্তিরে খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলে বাসনগুলো নিয়ে এসেছিলাম মেজে ফেলতে। চাঁদের রাত হলে রাত্রেই বাসন মাজতাম। রাত হয়ে গেলে নদীতে কেউ আসে না। কিন্তু আমার ভয়টয় করতো না। বাসন মাজা হয়ে গেলে উঠে দাঁড়িয়েছি, হঠাৎ শুনি মাথার উপর খড়ের চালে মচমচ শব্দ হচ্ছে। এ ঘাটের ওপর তো কোন গাছপালা নেই, ব্যাপারটা কি দেখবার জন্য মুখ বাড়িয়েছি তো আমার শরীর ঠান্ডা। হরিশ বাঁশের চালায় পা ঝুলিয়ে বসে হাসছে। আমায় দেখে বলল, "কি মাছের কাঁটা ফেললি রে নদীতে, কালবোস? আমায় দিবি?" কেমন খোনা খোনা শব্দ। কিন্তু একদম হরিশ। আমি একছুটে বাড়ি এসে বড়দিকে বললাম। বাসনটাসন সব রইল নদীর পাড়ে। বড়দি তক্ষুনি এক প্লেট ভাজা মাছ আমাকে দিয়ে বলল ঘাটে রেখে আসতে। আমি রাম রাম বলতে বলতে মাছ নিয়ে আবার এসে এখানে রেখে দৌড়ে ফিরে গেলাম। বাসন নেবার কথা মনে নেই। আর চালার দিকেও তাকাইনি। পরদিন সকালে দেখি বাসনগুলো তেমনই আছে, প্লেটটাও, শুধু মাছগুলো নেই। তারপর থেকে যদ্দিন ডাক্তারবাবু পিন্ডি দেননি ততদিন ওর মা ওর জন্যে একপ্লেট মাছ নদীর ধারে রেখে যেত। আমি অবশ্য আর সন্ধ্যের পর এখানে আসিনি।'

অনিকে জড়িয়ে ধরে টর্চ জ্বেলে হাঁটতে লাগল ঝাড়িকাকু, 'নে চল।'

এতক্ষণ হাওয়া দিচ্ছিল, এখন টুপ টুপ করে কয়েক ফোঁটা জল পড়ল। 'তাড়াতাড়ি পা চালা।' ঝাড়িকাকু বেশ দ্রুত হাঁটছিল। দু পাশে অন্ধকার রেখে ফ্যাকাশে আলোর বৃত্তে পা ফেলে ওরা এগিয়ে আসছিল। এখন চারপাশে শুধু বাতাসের শব্দ ছাড়া কিছু নেই। অবশ্য ঝাড়িকাকুর হাতের খালুইতে বড় কাঁকড়াটা ভীষণ শব্দ করছে। ওরা গোয়ালঘরের পাশ দিয়ে আসতে হঠাৎ কালীগাই-এর গম্ভীর গলার ডাক শুনতে পেল। যেন পরিচিত কেউ যাচ্ছে বুঝতে পেরেছে ও। জিভ দিয়ে একটা শব্দ করে সাড়া দিল ঝাড়িকাকু। অনির মনে হচ্ছিল, এখন যে কোন মুহূর্তেই হরিশ ওদের সামনে এসে হাত বাড়িয়ে মাছ চাইতে পারে।

উঠোনে ওদের দেখেই মা আর পিসীমা একসঙ্গে বকাঝকা শুরু করলেন। পিসীমা বকছিলেন ঝাড়িকাকুকে, কেন এতক্ষণ ও অনিকে নিয়ে নদীতে ছিল, আর মা অনিকে। অনি যখন টিউবওয়েলের জলে পা ধুচ্ছে ঠিক তখন নদীর মধ্যে প্রচণ্ড শোরগোল হচ্ছে শুনতে পেল। কারা ভয় পেয়ে উত্তেজনায় চিৎকার করছে। একবার ফিরে তাকিয়ে ঝাড়িকাকু আবার ছুটে গেল অন্ধকারে টর্চ জ্বেলে। কি হয়েছে জানতে ওরা উঠোনে এসে দাঁড়াল। উঠোনের এখানটায় অন্ধকার তেমন নেই। শিকে টাঙানো হ্যারিকেনের আলো অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। ঝাড়িকাকু চলে যেতে ওরা দেখল তিন-চারটে লণ্ঠন গোয়ালঘরের পিছন দিকে ছুটে ডাক্তারবাবুর কোয়ার্টারের দিকে চলে গেল।

পিসীমা জিজ্ঞাসা করলেন,'কি হয়েছে রে?'

একটু বাদেই ঝাড়িকাকু ফিবে এল হাঁপাতে হাঁপাতে। ওর কাছে শোনা গেল ব্যাপারটা। মাছ ধরার নেশায় সবাই নেমে পড়েছে নদীতে। তা ঐ লাইনের বংশী, বয়স হয়েছে বলে চোখে ভাল করে দেখে না, পা দিয়ে দিয়ে কাদা সরিয়ে পাঁকাল মাছ খুঁজছিল। কয়েকটা মাছ ধরে নেশাটা বেশ জমে গিয়েছিল ওর। হাঁড়িয়া খেয়েছে আজ সন্ধ্যে থেকে। হঠাৎ একটা লম্বা মোটা জিনিসকে চলতে দেখে মাছ ভেবে কোমরে হাত দিতেই ঘুরে দাঁড়িয়ে সেটা ছোবল মেরেছে হাতে। নেশার ঘোরে ওর কোমর ছাড়েনি বংশী। সাপটা দু'তিনটে ছোবল মারার পর খেয়াল হতেই চিৎকার করে কেঁদে উঠেছে। ততক্ষণে সাপটা অন্ধকারে লুকিয়ে পড়েছে ছাড়া পেয়ে। এখন কেউ বলছে সাপটা নিশ্চয়ই জলঢোঁড়া, বিষফিষ নেই। কেউ বলছে,

ছোবল মেরেছে যখন তখন নিশ্চয়ই গোখরো। বংশী বলছে, সাপটার রঙ ছিল কুচকুচে কালো। তা নেশার চোখ বলে কথাটা কেউ ধরছে না। হাতে দু'তিনটে দড়ি বাঁধা হয়ে গেছে। হাঁটতে পারছে না বংশী। ডাক্তারবাবুকে আনতে লোক গেছে কোয়ার্টারে।

ব্যাপারটা শুনে পিসীমা বললেন,'জয়গুরু।' বলে অনির চিবুকে হাত দিয়ে চুমু খেয়ে নিলেন, 'তখন বলেছিলাম নদীতে নিয়ে যাস না ঝাড়ি, যদি এই ছেলের কিছু হতো—তুমি কালই সোয়া পাঁচ আনার পূজো দিয়ে দিও মাধুরী।'

এমন সময় জুতোর আওয়াজ উঠল ভিতরের ঘরে। ঝাড়িকাকু সুড়ুৎ করে রান্নাঘরে চলে গেল। মা হাত বাড়িয়ে মাথার ঘোমটা টেনে দিলেন। সরিৎশেখর এসে বারান্দায় দাঁড়ালেন। বাড়িতে বিদ্যাসাগরী চটি পরেন, আওয়াজ হয়। অনিকে বললেন, 'হ্যাঁ রে, ভবানী মাস্টার এসেছিল একটু আগে, কাল তোর স্কুলে পরীক্ষা?'

পিসীমা বললেন, 'ও তো আর ওই স্কুলে পড়ছে না, পরীক্ষা দিয়ে কি হবে।'

সরিৎশেখর বললেন,'তা হোক, কাল পরীক্ষা দিতে যাবে ও।' বলে আর দাঁড়ালেন না।

এই সময় কান্নার রোল উঠল নদীর ধারে। অনিকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে পিসীমা বললেন, 'কালই পাঁচসিকের পূজো দিও মাধুরী।'

শেষ পর্যন্ত রাত্রিবেলায় বৃষ্টি নামল।

খানিক আগেই ওদের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গিয়েছে' দাদুর সঙ্গে বসে খাওয়া অনির অভ্যেস। খেতে খেতে দাদু বলছিলেন, 'আজ ঢালবে, তোমরা তাড়াতাড়ি কাজকর্ম চুকিয়ে নাও।' দাদুর খাওয়ার সময় হাতপাখা নিয়ে পিসীমা সামনে বসে থাকেন। গরমকালে তো বটেই, শীতকালেও এ রকমটা দেখেছে অনি। হাতপাখা ছাড়া দাদুর খাওয়ার সময় পিসীমার বসা মানায় না। কাজ-করা উঁচু চওড়া পিঁড়িতে বসে সরিৎশেখর খান, পাশেই ছোট মাপের পিঁড়িতে অনি। আজ বাইরের হাওয়ার জন্য জানলা-দরজা বন্ধ। কাঁচের জানলা দিয়ে হঠাৎ চমকানো বিদ্যুতের আলো ঘরে এল। মা মাথায় ঘোমটা দিয়ে খাবার দিচ্ছিলেন।

পিসীমা বললেন, 'বংশীটা মরে গেল!'

আমসত্ত্ব দুধে মাখতে মাখতে সরিৎশেখর বললেন, 'দুধটা আজ ঠান্ডা হয়ে গেছে— কতবার বলেছি ঠান্ডা দুধ দেবে না।'

মা তাড়াতাড়ি একবাটি গরম দুধ নিয়ে এসে বললেন, 'একটু ঢেলে দেব বড়দি?'

পিসীমা বললেন, 'দাও।'

সরিৎশেখর বিরাট জামবাটিটা এগিয়ে দিয়ে খানিকটা দুধ নিলেন, নিয়ে বললেন, 'কে বংশী?'

'লাইনের বংশী। আগে জল এনে দিত আমাদের।'

'কি হয়েছিল?

'মাছ ধরতে গিয়ে লতায় কেটেছে।'

কথাটা শুনে সরিৎশেখর চট করে অনির দিকে তাকালেন, তারপর জানলা দিয়ে বাইরের দিকে। বাইরে তখন ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আলোয় আলোয় ঝলসে যাচ্ছে গাছপালা। সেই দিকে চোখ রেখে সরিৎশেখর বললেন, 'বড় ভাল মাংস কাটতো লোকটা, এক কোপে মাথা নামিয়ে দিত।'

কথাটা শুনে চট করে একটা কথা মনে পড়ে গেল অনির। সরিৎশেখর আজকাল আর মাংস খান না। বাড়িতে মাংস এলে আলাদা রান্না হয়। একদিন পিসীমা দাদুর মাংস খাওয়ার গল্প করছিলেন। যৌবনে তিন সের মাংস একাই খেতেন উনি। মা বলেছিলেন, 'তিন সের?'

পিসীমা হাত নেড়ে বলেছেন, 'হবে না কেন? নদীর ধারে গাছে ঝুলিয়ে বংশী পাঁঠা কাটতো। তারপর সেই মাংসের অর্ধেক বাড়িতে রেখে বাকিটা অন্য বাবুদের বাড়ি বাবা দিয়ে দিতেন। আমাদের বাড়িতে তো খাওয়ার লোক তেমন ছিল না। মহী ছুটিতে বাড়ি এলে ওকে ধরলে চার-পাঁচজন। বাবাই অর্ধেক খেতেন।'

মা হেসে বললেন,'একটা অর্ধেক পাঁঠার মাংস কি করে তিন সের হয় বড়দি?'

অনিও হেসে ফেললো। পিসীমা নাকি হিসেব রাখতে পারে না—দাদু বলেন।

'সেই বাবা মাংস ছেড়ে দিল একদিন,' পিসীমা বললেন, 'ভীষণ পাষাণ লোক ছিলেন বাবা। এখন কি দেখছিস, একদিন এমন জোরে বকেছিলেন

যে ঝাড়ি প্যান্টে হিসি করে ফেলেছিল। গমগম করতো গলা। তখন শাক-সবজির ক্ষেতে অন্য লোকের গরু-ছাগল ঢুকলে বাবা রেগে কাঁই হয়ে যেতেন। পাঁঠা ঢুকলে বাবা ঝাড়িকে বলতেন সেটাকে ধরতে। ধরা হয়ে গেলে আমার কাছ থেকে সরষে চেয়ে নিয়ে বাবা সেটার কানের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতেন। যন্ত্রণায় মরে যেতো জীবটা। তখন যার পাঁঠা তাকে বলা হতো দোষ করেছে তাই শাস্তি দিয়েছি। বাবাকে ভয় পেত সবাই, কিছু বলতো না। বংশী এসে সেই পাঁঠার মাংস কেটে বাড়ি বাড়ি দিয়ে আসতো। যার পাঁঠা তার বাড়িও বাদ যেতো না। শেষ পর্যন্ত আমি আর সরষে দিতাম না, পাপের ভাগী হবে কে? এর মধ্যে হয়েছে কি, বাগানে কে এক সন্ন্যাসী এসেছে, বাবা দেখতে গিয়ে নমস্কার করলেন। সন্ন্যাসী মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, তোর তো বহুদিন প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে দেখছি।

বাবা বললেন,কেন, কি জন্যে?

সন্ন্যাসী হাত নেড়ে বলেছিলেন, তোর গায়ে খুনীর গন্ধ।

চুপ করে ফিরে এসেছিলেন বাবা। আর ছাগল ধরতেন না, মাংস খাওয়া ছেড়ে দিলেন শেষ পর্যন্ত। তাও ছাড়া কি—একদিন খেতে বসেছেন, মাংস দেওয়া হয়েছে। একটু মুখে দিয়েই টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। চিৎকার করে বললেন, মাংস রেঁধেছে না বোষ্টমী করেছে! না হয়েছে নুন না ঝাল। আর আমাকে মাংস দেবার কষ্ট তোদের করতে হবে না।

আমি তো ভয়ে ভয়ে মহীকে বললাম, খেয়ে দ্যাখ তো। মহী বলল, কই, খারাপ হয়নি তো।— আসলে একটা বাহানা দরকাব তো, সন্ন্যাসীর কথায় ছেড়ে দিলে লোকে বলবে কি!'

এখন দাদুর শরীরের দিকে তাকালে অনির মনেই হয় না এসব হতে পারে। একমাথা পাকা চুল, ঠোঁটের দুপাশে ঝুলে থাকা সাদা গোঁফ, বিরাট বুকে মেদ কিছুটা ঝুলে পড়েছে, বাঁ হাতে সোনার তাগা আর হাঁটু অবধি ধুতি পরা এই লম্বা-চওড়া মানুষটাকে অনির বড় ভাল লাগে। দাদুর সঙ্গে রোজ শোয় ও। ছেলেবেলা থেকেই। আর শুয়ে শুয়ে যত গল্প। পিসীমা বলেন,'শুয়ে শুয়ে ও পুটুস পুটুস করে বাবাকে সব লাগায়।' আসলে দাদু যখন রোজ জিজ্ঞাসা করেন,'আজ কি হলো বল!' তখন কোন্ কথাটা বাদ দেবে বুঝতে না পেরে সব বলে ফেলে অনি।

আজ রাত্রে দাদুর ঘর থেকে নিজের বালিশ নিয়ে এল ও, তারপর

সোজা মায়ের বিছানায় শুয়ে পড়ল। মহীতোষ খানিক আগে ক্লাব বন্ধ করে ফিরেছেন। রোজ দশটা অবধি ক্লাব চলে, আজ বৃষ্টির জন্য একটু আগেই ভেঙে গেছে। শুয়ে শুয়ে অনি দাদুর গলা শুনতে পেল, ওকেই ডাকছেন। উঠে এল ও, দরজায় দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে বলল,'আমি মায়ের কাছে শোব।' বিছানায় বাবু হয়ে বসে সরিৎশেখর ওকে দেখলেন, তারপর হেসে ঘাড় নাড়লেন। আর এই সময় ঝমঝম করে বৃষ্টি নেমে গেল। বাড়ির টিনের ছাদে যেন অজস্র পাথর পড়ছে, কানে তালা লেগে যাবার যোগাড়।অনি একছুটে মায়ের ঘরে ফিরে এল। বিছানায় শুয়ে বালিশে মুখ চেপে ও বৃষ্টির শব্দ শুনতে লাগল। মাঝে মাঝে শব্দ করে বাজ পড়ছে। মাথার পাশে কাঁচের জানলা দিয়ে বিদ্যুতের হঠাৎ-জাগা আলোয় পাশের সবজি ক্ষেত সাদা হয়ে যাচ্ছে, সেই এক পলকের আলোয় বৃষ্টির ধারাগুলো কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। সবজি ক্ষেতের মধ্যে বড় পেঁপে গাছটা হিড়িম্বা রাক্ষসীর মত হাত পা নাড়ছে হাওয়ার ঝাপটে। ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল অনি। তারপর কখন কেমন করে জলের শব্দ শুনতে শুনতে ও ঘুমিয়ে পড়েছিল বুঝতে পারেনি।

মহীতোষের গলা শুনতে পেয়ে ও থতমত খেয়ে গিয়েছিল। মাধুরী ওকে ভাল করে শুইয়ে দিচ্ছিলেন বলে ঘুমটা ভেঙে গেল। ওর মনে পড়ল ও আজ মায়ের ঘরে শুয়ে আছে। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে সমান তালে। চোখ একটু খুলে অনি দেখল ঘরের কোণায় রাখা হ্যারিকেনের আলো কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশে শোয়া মায়ের শরীর থেকে কি মিষ্টি গন্ধ আসছে অনির খুব ইচ্ছে হচ্ছিল মাকে জড়িয়ে ধরে। ঠিক এমন সময় মহীতোষ হঠাৎ বললেন,'ও আজ এখানে শুয়েছে যে!'

মাধুরী হাসলেন, কিছু বললেন না।

'কি ব্যাপার?' মহীতোষ আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

'বোধ হয় মন-কেমন করছে।' মাধুরী বললেন।

অনির বুক দুরুদুরু করতে লাগল। এখন যদি মহীতোষ ওকে তুলে দাদুর ঘরে পাঠিয়ে দেন, তাহলে—? বাবাকে বিচ্ছিরি লোক বলে মনে হতে লাগল অনির। ওর ইচ্ছে হল মাকে আঁকড়ে ধরে।

'ঘুমিয়েছে?' মহীতোষের চাপা গলা শুনতে পেল অনি। সঙ্গে সঙ্গে ও চোখ বন্ধ করে ফেলল। মড়ার মত পড়ে থাকল অনি। ও অনুভব করল
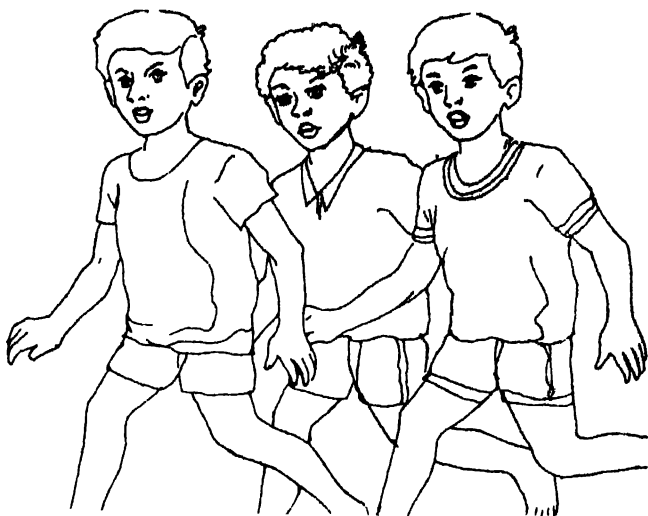
বুকের ওপর মায়ের একটা হাত এসে পড়ল। তারপর হাতটা ক্রমশ ওর চিবুক, গাল চোখের ওপর দিয়ে আলতো করে বুলিয়ে গেল। মা বললেন,'হুঁ।'

'বড়দি চলে গেলে তোমার অসুবিধে হবে?' মহীতোষ বললেন।

'হুঁ, এতদিনের অভ্যেস। বাড়িটা ফাঁকা হয়ে যাবে। অনি না গেলে কি আর হতো। পরে গেলেও পারত।' একটু বিষণ্ণ গলা মাধুরীর।

'না, এখনই যাক। জলপাইগুড়িতে ভাল স্কুল আছে, নিচু ক্লাস থেকে ভরতি হলে ভিতটা ভাল হবে। আমি ভাবছি, অনি হওয়ার সময় বড়দিই তো সব করেছিল এবার কি হবে!' একটু চিন্তিত গলা মহীতোষের,'তুমি কি বড়দিকে বলেছ?'

'হুঁ।' বলে মাধুরী অনির দিকে ফিরে শুলেন। শুয়ে এক হাতে অনির গলা জড়িয়ে ধরলেন। একটু বাদেই মহীতোষের নাক ডাকতে শুরু করল। অনির গলার কাছে মায়ের হাতের বালার মুখটা একটু চেপে বসেছিল। ধার আছে মুখটার। ওর চিনচিন করছিল গলার কাছটা। কিন্তু তবু সিঁটিয়ে শুয়ে থাকল অনি। চোখ বন্ধ করে ও মাথার ওপর টিনের ছাদে পড়া বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে মায়ের শরীর থেকে আসা মা-মা গন্ধটার মধ্যে সাঁতার কাটতে লাগল চোরের মত। গলার ব্যথাটা কখন হারিয়ে গেল একসময় টের পেল না অনি।

পাতাবাহার গাছগুলো সার দিয়ে রাস্তার দুপাশে লাগানো, রাস্তাটা ওদের বাড়ি থেকে সোজা উঠে এসে আসাম রোড়ে পড়েছে। অনি দেখল বাপী আর বিশু বইপত্তর হাতে ওর জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। ওদের স্কুলে কোন য়ুনিফর্ম নেই। তবু মহীতোষ ওর জন্য সাদা শার্ট আর কালো প্যান্ট করে দিয়েছেন, অনি তাই পরে স্কুলে যায়। ওর স্কুলের অন্য ছেলেমেয়েরা যে যেমন খুশী পরে আসে। জুতো পরার চল ওদের মধ্যে নেই, অন্তত স্কুলে জুতো পরে কেউ আসে না। অনি চটি পরে যায়। মা আর পিসীমা বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন। সরিৎশেখর আব মহীতোষ অফিসে চলে গেছেন সকালে। একটু বাদেই জলখাবার খেতে আসার সময়। সবিৎশেখর আসেন না, বকু সর্দার এসে ওঁর খাবার নিয়ে যায়। বাড়ি থেকে বেরুবাব আগে পিসীমা ঠাকুরঘরে ওকে নিয়ে গিয়ে প্রণাম করিয়েছেন। তারপর পূজোর বেলপাতা ওর বুকপকেটে ভাল করে রেখে দিয়েছেন। অনি আজ জীবনের প্রথম পরীক্ষা দেবে। সকালে কাকু পরীক্ষার কথা শুনে বলেছে, 'যত বুজরুকি ভবানী মাস্টারের।'

আজ সকাল থেকেই কেমন পরিষ্কার সোনালি রোদ উঠেছে। গাছের পাতা এমন কি ঘাসগুলো অবধি নতুন নতুন দেখাচ্ছে । ওরা আসাম রোড দিয়ে হাঁটতে লাগল । পি. ডব্লু.ডি-এর পিচের রাস্তার দুধারে লম্বা লম্বা গাছ, যার ডালগুলো এখনও ভেজা, মাথার ওপর বেঁকে আছে। দুপুরবেলা ছায়ায় ভরে থাকে এই রাস্তা। বাঁদরলাঠি ফল এখানে ওখানেঁ ছড়িযে আছে।

চা-বাগানের সীমানা ছাড়ালেই হাট। দু পাশে ফাঁকা মাঠের মধ্যে মাঝে মাঝে চালাঘর করা। বাঁদিকে মাছমাংসের হাট, চালও বসে, ডানদিকে শুয়োর কাটার মাঠ। আজ অবশ্য সব ফাঁকা। রবিবার সকাল থেকে গিজগিজ করতে থাকে লোক। বাজারহাট ধূপগুড়ি থেকে হাট-বাস বোঝাই ব্যাপারীরা এসে হাজির হয় বড় বড় ঝুড়ি নিয়ে। একটু বেলায় আসে খদ্দেররা। তখন চোঙায় করে কলের গান বাজায় অনেকে। কি জমজমাট লাগে চারধার। ফাঁকা হাট দু পাশে রেখে ওরা ছোট্ট পুলের ওপব এল। দু পাশে রেলিং দেওয়া, নিচে প্রচণ্ড শব্দ করে আঙরাভাসা নদী বয়ে যাচ্ছে ফ্যাক্টরীর দিকে। পুলের ওপর দাঁড়িয়েই লকগেটটা দেখতে পাওয়া যায়। ওপাশে পুকুরের মত থৈ-থৈ জল দাঁড়িয়ে। গেটের তলা দিয়ে অজস্র ফেনা তুলে ছিটকে বেরিয়ে আসছে এধারের ধারা। বিশু বলল, 'একদিন স্নান

করার সময় এখানে এসে নামবো আর আমাদের ঘাটে গিয়ে উঠবো।'

বাপী বলল, 'যাঃ, মরে যাবি একদম —কি স্রোত!'

বিশু কিছু বলল না, কিন্তু অনি ওর মুখ দেখে বুঝল বিশু নিশ্চয়ই এই রকম একদিন করবে। যা ডানপিটে ছেলে ও। তালগাছে উঠে বাবুইপাখির বাচ্চা ধরতে চেয়েছিল একদিন। মা ভীষণ রাগ করবে বলে অনি কোনরকমে ওকে বারণ করেছে। আজ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অনির চট করে হরিশের কথা মনে পড়ে গেল। গায়ের মধ্যে সিরসির করে উঠল অনির।

পুল ছাড়ালেই ভরত হাজামের দোকান। ত্রিপলের ছাউনি দেওয়া, নিচে একটা টুল পাতা। ভরত খদ্দেরকে টুলে বসিয়ে চুল ছাঁটে। ওদের বাড়িতে মাসে দুবার যায় ভরত। দাদু দুবারই চুল ছাঁটান। কাঁঠালতলায় পিঁড়ি পেতে এক এক করে বসতে হয় ওদের। একটা কাপড় আছে যার রঙ কোন কালে হয়তো সাদা ছিল, দাদু বলেন ওটাতে ছারপোকা আর উকুন গিজগিজ করছে। খালি গায়ে বসে ওরা। মহীতোষ বলেন, ব্যাটা বাটিছাঁট ছাড়া আর কিছু জানে না।

বুড়ো ভরত অনিকে চুল ছাঁটার সময় মজার মজার গল্প বলে। সব সময় মাথা নিচু করে বসে থাকতে পারে না ও। নড়লেই চাঁটি মারে ভরত। সঙ্গে সঙ্গে ছড়াও কাটে, নাচ বুড়িয়া নাচ, কান্ধে পর নাচ।' হেসে ফেলে অনি। ছেলেবেলায় ছোট কাকাকেও চুল কেটে দিত ভরত। এখন তেমাথার মোড়ে যে নতুন 'মর্ডান সেলুন' হয়েছে, ছোট কাকা সেখানে গিয়ে চুল ছাঁটিয়ে আসেন। কিন্তু চোখে কম দেখলেও সরিৎশেখরের ভরতকে ছাড়া চলে না। ছোটঠাকুমার বিয়ের সময় নাকি ভরত হাজাম ছিল।

এখন সেলুনটা ফাঁকা। ভরতের তিনপায়া কুকুরটা টুলের ওপর উঠে বসে আছে। দোকানে ভরত নেই। আর একটু এগোলেই ছোট ছোট কয়েকটা স্টেশনারী দোকান, বিলাসের মিষ্টির দোকানে বিরাট কড়াই-এ দুধ ফুটছে। এর পরেই রাস্তাটা গুলতির বাঁটের মত দুভাগ হয়ে গিয়েছে। ঠিক মধ্যিখানে একটা বিরাট পাথরে সম্প্রতি লেখা হয়েছে গৌহাটি, নীচে বাঁদিকে একটা তীর, ডানদিকে লেখা নাথুয়া। বাঁদিকের রাস্তাটায় আর একটু গেলে জমজমাট তিনমাথার মোড়। কত রকমের দোকানপাট, রেস্টুরেন্ট, পেট্রল পাম্প, সব সময় লোক গিজগিজ করছে। ডানদিকের রাস্তাটা ধরে

এগোলেই বড় বড় কাঠের গোলা চোখে পড়ে। কাছেই একটা স-মিলে কাজ হচ্ছে। করাতটানার শব্দ হচ্ছে একটানা। ফরেস্ট অফিস এদিকটাতেই। রেঞ্জার সাহেবের অফিসের সামনে একটা জিপ দাঁড়িয়ে আছে। ডানদিকে মিশনারীদের একটা বাগানওয়ালা বাড়ি। ওখানে মদেসিয়া ছেলেমেয়েদের অক্ষরপরিচয় হয়। রাস্তাটা বাঁক নিতেই ছোট্ট মাঠ আর মাঠের গায়ে ওদের স্কুল।

ভবানী মাস্টার স্কুলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। এক ঘরের স্কুল। বারান্দায় মাঝে মাঝে ক্লাস নেন উনি। ওদের নতুন আসা দিদিমণি ভেতরের ঘরে ক্লাস ওয়ানদের পড়ান, ঘবের আর এক পাশে বাঁ বারান্দায় ক্লাস টু-কে পড়ান ভবানী মাস্টার। নতুন দিদিমণি পি. ডব্লু. ডি অফিসের বড়বাবুর বোন। কদিন আগে ভবানী মাস্টারেব অসুখের সময় হতে উনি এসে স্কুলে দেখাশুনা করছেন। ভীষণ গম্ভীর।

স্বর্গছেঁড়ার তালেবর মানুষজন সম্প্রতি নতুন একটা স্কুলবাড়ি তৈরী করছেন হিন্দুপাড়ার মাঠে। বেশ বড়সড় স্কুল। এই কদিন ওদের এই একচালাতেই ক্লাস হচ্ছে। মাইনেপত্তর কোন ছাত্রকে দিতে হয় না। ক্লাব থেকে চাঁদা তুলে ভবানী মাস্টারের মাইনে দেওয়া হয। নতুন দিদিমণি এখনো মাইনে নেন না।

আসলে এই ঘরটা বারোয়ারী পুজোর জন্য বানানো হয়েছিল। দরজাটা তাই বেশ বড়। দুর্গাপুজোর খ্যাতি আছে স্বর্গছেঁড়ার। পুজোর একপক্ষ আগে থেকে স্কুল বন্ধ হয়ে যায়। বুড়ো হারাণ ঘোষ তাঁর দুই ছেলেকে নিয়ে এসে যান ঠাকুর গড়তে। সেই থেকে উৎসব লেগে যায স্বর্গছেঁড়ায। ভবানী মাস্টার তখন চলে যান দেশে। বাংলাদেশে । মাঝে মাঝে ওঁর কথা বুঝতে পারে না অনি। কথা না শুনলে চুল ধরে মাথা নামিয়ে পিঠের ওপব শব্দ করে যখন কিল মারেন ভবানী মাস্টার, তখন বিড়বিড় করে নিজের ভাষায় কি বলেন কিছুতেই বুঝতে পারে না অনি। তবে অনি কোনদিন মারটার খায়নি। দাদু বলেন উনি ময়মনসিংহ না কি জেলার লোক। ভীষণ রাগী লোক।

ভবানী মাস্টার বারান্দার দাঁড়িয়ে ওদের দেখলেন। তারপর ওরা কাছে যেতে বিশুর দিকে তাকিয়ে বললেন,'বেড়াতে যাও বুঝি, বেশ বেশ, তা

এবার ভিতরে গিয়ে আমাকে উদ্ধার করো বাবা সব।'

ঘরে ঢুকে অনির মনে হল আজ সবাই কেমন যেন আলাদা, অনেকের কপালে দই-এর টিপ। ভবানী মাস্টার আজ ক্লাস ওয়ান আর টু-দের পাশাপাশি বসতে বললেন। লম্বা লম্বা ডেস্কের সঙ্গে বেঞ্চি। সামনে একটা ব্ল্যাকবোর্ড। এক দুই করে প্রশ্ন লেখা। বাঁদিকে ক্লাস ওয়ানের জন্য, ডানদিকে ক্লাস টু। আজকে ভবানী মাস্টারের গলা ভীষণ ভারী এবং রাগী লাগছিল। সবাইকে বলে দিলেন যে একটা কথা বলবে তাকে ইঁট মাথায় করে তেমাথা অবধি দৌড়ে ঘুরে আসতে হবে।

এমন সময় নতুন দিদিমণি স্কুলে এলেন। সাদা শাড়ি জামা, নাকের ডগায় তিল থাকায় সব সময় মনে হয় কিছু উড়ে এসে ওখানে বসেছে। দিদিমণি এসে প্রথমে রোলকল করলেন। তারপর ভবানী মাস্টারের কাছে গিয়ে ফিসফিস করে কি বললেন। ভবানী মাস্টারের মুখটা কেমন মজার-মজার হয়ে গেল। ঘাড় নেড়ে কি যেন বলে ওদের দিকে তাকালেন, 'এখন তোমরা দিদিমণির কাছে গান করবে। একটার পর পরীক্ষা।' বলে বাইরের বারান্দায় চলে গেলেন।

গানের কথা শুনে সবাই গুনগুন করে উঠল। গোপামাসী বসেছিল অনির পাশে। অনেক বড় গোপামাসী। স্কুলে শাড়ি পরে আসতে পারে না বলে ফ্রক পরে। অনিকে গোপামাসী বলল, 'গান গাইতে আমার খুব ভাল লাগে। দেখিস গানের পরীক্ষা নেবে। তুই পারবি?'

ঘাড় নাড়ল অনি, 'না।'

'এমন কি আর, শুধু জোরে জোরে সুর করে বলবি, সে হয়ে যাবে'খন। আমি তো হাটের দিনে গান শুনে শুনে শিখে গিয়েছি।' কথা বলতে বলতে চুপ করে গেল গোপামাসী। দিদিমণি ওর দিকে তাকিয়ে আছেন একদৃষ্টে। তারপর একটু গলাখাঁকরি দিয়ে বললেন উনি, 'আর কদিন বাদেই, তোমরা হয়তো জানো, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবস, জানো তো?'

'হ্যাঁ দিদিমণি।' পুরো ঘরটা একসঙ্গে চীৎকার করে উঠল।

'স্বাধীনতা মানে আমরা আর পরাধীন থাকবো না। ইংরেজদের হুকুম আমাদের মানতে হবে না। আমরাই আমাদের রাজা।' দিদিমণি হাত নেড়ে বললেন, 'এখন সেই দিনটি হল পনেরই আগস্ট। এই পনেরই আগস্ট হবে উৎসবের দিন। আমরা স্কুলের সামনে আমাদের জাতীয় পতাকা তুলবো।

শহর থেকে একজন গণ্যমান্য লোক আসবেন তোমাদের কিছু বলতে। তখন তোমরা সবাই মিলে একটা গান গাইবে। আমাদের হাতে সময় আছে মাত্র পাঁচ দিন। এর মধ্যে তোমরা গানটা মুখস্থ করে নেবে। প্রথমে আমি গাইছি তোমরা শোন।' দিদিমণি এবার সবার দিকে তাকিয়ে নিলেন। একসঙ্গে অনেক কথা বলায় ওঁর নাকের ডগায় তিলের ওপর একটু ঘাম জমতে দেখল অনি। আঁচল দিয়ে সেটা মুছে নিলেন উনি। তারপর একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে হাতের বইটা সামনে খুলে ধরে খুব নরম গলায় গাইতে লাগলেন, 'ধনধান্য পুষ্পভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা.....।'

সমস্ত ঘব চুপচাপ, গান গাইছেন গম্ভীর-দিদিমণি। এত সুন্দর যে উনি গাইতে পারেন অনি তা জানতো না। সকলে কেমন মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে, এমন কি গোপামাসীও। এক-একটা লাইন ঘুরেফিরে গাইছেন উনি, কি সুন্দর লাগছে। একসময় অনি গানের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তারপর যেই দিদিমণি কেমন করুণ করে গাইলেন—'ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি', তখন হঠাৎ অনির শরীরটা থরথর করে কেঁপে উঠল, ওর হাতের লোমকূপগুলো কাঁটা হয়ে উঠল, এই মুহূর্তে মা কাছে থাকলে অনি তাকে জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ রাখতো।

দিদিমণি তখনও গেয়ে যাচ্ছেন, অনির শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছিল। ও জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। স্কুলের পেছনের রাস্তাটা চলে গেছে খুঁটিমারীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে নাথুয়ার দিকে। বেশ চনমনে রোদ উঠেছে। রাস্তাটা তাই ফাঁকা। সামনের বকুলগাছটায় একটা লেজঝোলা পাখি ঘাড় ঘুরিয়ে ডাকছে। তার লেজের হলদে নীল লম্বা পালকে রোদ পড়ে চকচক করছে। পাশেই একটা লম্বা ইউক্যালিপটাস গাছ। ওরা বলে সাহেবগাছ। সাহেবগাছের একদম ওপরডালে মৌচাক বেঁধেছে মৌমাছিবা। গাছের তলায় গেলেই শব্দ শোনা যায়। ওরা কি ফুলের ওপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে? বিশু বলে, মৌচাকের মধ্যে মধু জমা আছে। গুলতি দিয়ে একদিন ভাঙবে ও মৌচাকটাকে। দিনের বেলা বলে ও পাবছে না, চাক ভেঙে দিলে মৌমাছিরা নাকি ছেড়ে দেবে না। ভীষণ হুল। অনির কোন ভাই নেই,' গানটায় ভাই-এ ভাই-এ এত স্নেহ বলেছেন দিদিমণি। আচ্ছা ওর ভাই নেই কেন? পিসীমা গল্প করার সময় বলেন, তুই যখন মায়ের পেটে এসেছিলি—তেমনি একটা ভাই তো মায়ের পেটে আসতে

পারে! অনি দেখল রেতিয়া সামনের রাস্তাটা দিয়ে যাচ্ছে। ওদের চেয়ে বয়সে বড়, এক নম্বর লাইনের মদেসিয়া ছেলে। ও চোখে দেখতে পায় না। অথচ পা দিয়ে দিয়ে রাস্তা বুঝে রোজ বাজারে চলে আসে। বাজারে গিয়ে মতি সিংয়ের চায়ের দোকানের সামনে পাতা বেঞ্চিতে চুপ করে বসে থাকে। মতি সিং ওকে রোজ চা খাওয়ায়। সারা মুখে বসন্তের দাগ, ছেলেটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে যাচ্ছে। হঠাৎ অনির খুব দুঃখ হল ওর জন্য। দিদিমণি যে এমন মন-কেমন-করা গান গাইছে বেচারা শুনতে পেল না। অথচ ওর খুব বুদ্ধি। এখন যদি অনি ছুটে ওর কাছে যায়, গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, এই বল তো আমি কে, সঙ্গে সঙ্গে রেতিয়া মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাবে, ওর বসন্তের দাগওয়ালা কপালে ভাঁজ পড়বে, দুটো সাদা চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইবে, তারপর হঠাৎ সব সহজ হয়ে গিয়ে ওর হলদে ছাতা লাগা দাঁতগুলোয় শিউলি ফুলের বোঁটার মত হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠবে, ও মুখ নিচু করে বলবে, 'অনি।'

একসময় গান শেষ হয়ে গেল। এত সুন্দর গান এমন কথা অনি শোনেনি আগে। ও দেখল ভবানী মাস্টার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন। বোঝাই যাচ্ছে উনি গান শুনছিলেন, তাই ওঁর মুখটা অন্য রকম দেখাচ্ছিল। এর পর দিদিমণি ওদের গানটা শেখাতে আরম্ভ করলেন। গোপামাসীর গলা সবার ওপরে। এমনিতে অনি কোনদিন সবার সামনে গান গায়নি। কিন্তু আস্তে আস্তে ওর গলা খুলতে লাগল। গানের লাইনগুলোর সব মানে বুঝতে পারছিল না, এই যা।

কেমন ঘোরের মধ্যে সময়টা কেটে গেল। এক সময় দিদিমণি থামলেন। এখন টিফিন। অনি টিফিনের সময় কিছু খায় না। কেউই খায় না। দুটোয় ছুটি। বাড়ি ফিরে পিসীমার আলোচালের ভাত সুন্দর নিরামিষ তরকারি দিয়ে একসঙ্গে বসে খায়। এতক্ষণে ওর নজর পড়ল সামনের বোর্ডের দিকে। ভবানী মাস্টার প্রশ্নগুলো লিখে রেখেছেন। ও প্রশ্নগুলো পড়বার চেষ্টা করল। এখন ঘর ফাঁকা। সবাই বাইরের মাঠে রোদ্দুরে হইহই করছে। স-মিলের করাতের শব্দ এখানে আসছে। একটা কাঠঠোকরা পাখি সামনের সাহেবগাছে বসে একটানা শব্দ করে যাচ্ছে।

অনি দেখল গোপামাসী বাইরে থেকে ফিরে এল। এসে ওর পাশে বসল, 'কেমন গাইলাম রে!'

অনি হাসল। সবাই মিলে একসঙ্গে গান করেছে অথচ গোপামাসী এমন ভাব করছে যেন একাই গেয়েছে।

'আমি বড় হলে খুব বড় গায়িকা হব, জানিস, কাননবালা।'

কথাটা বলে চোখ বন্ধ করল গোপামাসী। গোপামাসী তো বড়ই হয়ে গিয়েছে। শুধু শাড়ি পরে না—এই যা।

'তুই নাকি চলে যাবি এখান থেকে?' হঠাৎ গোপামাসী বলল।

'হুঁ।'

'আর আসবি না?'

'আসবো তো। ছুটি হলেই আসবো।'

'আমার সঙ্গে দেখা করবি তো?'

'বাঃ, কেন করবো না!'

ঘাড় নিচু করে গোপামাসী বলল,'তোরা ছেলেরা কেমন টুকটুক করে চলে যাস। আমি দ্যাখ এই এক ক্লাসে সারাজীবন পড়ে থাকলাম। পাস করলেও কি হবে, আমার তো পড়া হবে না আর।'

'নতুন স্কুল হচ্ছে, সেখানে পড়বে।' অনি বলল।

ঠোঁট ওল্টালে গোপামাসী, 'মা পড়তে দেবে না। অথচ দ্যাখ ক্লাস ওয়ানের পরীক্ষা একবারে আমি পাস করে গেছি।' হঠাৎ ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে গোপামাসী বলল,'দাঁড়া, তোর খাতাটা দে দেখি।'

কিছু বুঝতে না পেরে অনি নতুন খাতাটা এগিয়ে দিল। গোপামাসী বলল, 'আমি তোর পরীক্ষার উত্তর লিখে দিচ্ছি। তুই চুপ করে বসে থাক।'

অনির খুব মজা লাগল। বোর্ডের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নগুলো দেখে গোপামাসী ওর খাতায় উত্তর লিখছে। এইসব প্রশ্নের উত্তর ও জানে, কিন্তু সেগুলো লেখার হাত থেকে বেঁচে যাচ্ছে বলে ওর আনন্দ হচ্ছিল। গোপামাসী লিখছে—ও জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল আবার। ওভারসিয়ারবাবু সাইকেলে চেপে আসছেন ঠা-ঠা রোদ্দুরে খুঁটিমারীর দিক থেকে। মাথায় সোলার হ্যাট্, খাকি হাফপ্যান্টের নিচে ইয়া মোটা মোটা পা। পাছা দু'টো সিটের পাশে ঝুলে পড়েছে। দু হাতে সামনের হ্যান্ডেলে শরীরের ভর রেখে চোখ বন্ধ করেই বুঝি চালাচ্ছেন। চোখ এত ছোট আর

মুখটা এত ফোলা যে বোঝা যায় না তাকিয়ে আছেন না ঘুমোচ্ছেন। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড শব্দ হতেই চমকে উঠল অনি। একটা মোটা পা আকাশে তুলে অন্যটায় নিজেকে কোন রকমে সামলাচ্ছেন ওভারসিয়ারবাবু মাটিতে ভর দিয়ে। পেছনের চাকা চুপসে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে হইহই শব্দ উঠল। মাঠে যারা খেলছিল তারা ব্যাপারটা দেখেছে। ভবানী মাস্টারের গলা শোনা গেল, অবোধ্য ভাষায় গালাগাল দিচ্ছেন বোধ হয়, সবাই হুড়মুড় করে ঘরে ফিরে এল। বিশু ছড়া কাটছিলো,'ওভারবাবুর চাকা, চলতে গেলেই বেঁকা।'

চোরের মতন খাতাটা দিয়ে দিল গোপামাসী, 'নে, শুধু একটা পারলাম না। যা শক্ত। এতেই পাস করে যাবি।'

খাতাটা খুলে দেখল অনি। খুব সুন্দর হাতের লেখা গোপামাসীর। খাতার ওপরে ওর নাম লিখে দিয়েছে।

পরীক্ষা আরম্ভ হয়ে গেল। গোপামাসী কি সব লিখছে নিজের খাতায়। লেখার ভঙ্গীতে অনি বুঝল, মন নেই। ভবানী মাস্টার একটা লম্বা বেত হাতে নিয়ে মাঝখানে বসে। সবাই মুখ নিচু করে লিখছে। ভবানী মাস্টার অনিকে দেখলেন,'কি অনিমেষ, লিখ লিখ।'

পাশ থেকে গোপামাসী চাপা গলা শুনতে পেল অনি,'আরে বোকা, ছবি আঁক না পেছন পাতায়। চুপ করে বসে থাকলে ধরা পড়ে যাবি না?'

এতক্ষণে অনির ভয়-ভয় করতে লাগল। ও বুঝতে পারল ব্যাপারটা অন্যায় হয়ে গিয়েছে। আস্তে আস্তে খাতা খুলে ও পেছনের পাতায় চলে এলো। তার পর মাথা ঝুঁকিয়ে পেন্সিলে একটা গোল দাগ আঁকল। তার মধ্যে আরো দুটো গোল, গোলের মধ্যে গোল। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়াতে গোপামাসী যে উত্তরটা শক্ত বলেছিল সেটা চট করে লিখে ফেলল।

একসময় সময়টা শেষ হয়ে গেল। পরীক্ষা শেষ। সকলে এক এক করে খাতা জমা দিয়ে গেল। অনি কাছে দাঁড়াতেই ওর হাত থেকে খাতা নিলেন ভবানী মাস্টার, 'সব উত্তর দিয়েছ?'

ঘাড় নাড়তে গিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো অনি। ওর কেমন সিরসির করতে লাগল। ভবানী মাস্টারের ভাঙাচোরা মুখের দিকে তাকিয়ে ওর মনে দাদুর মুখটা ভেসে উঠল। ঘাড় নাড়ল ও, 'না।'

'কোনটা পার নাই?'

হঠাৎ অনির ঠোঁট কাঁপতে লাগল। ভবানী মাস্টার একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন। ঘর প্রায় ফাঁকা। সবাই চলে যাচ্ছে। দরজায় বিশু আর বাপী দাঁড়িয়ে, ওরা অনির জন্যে অপেক্ষা করছে। গোপামাসী নেই। মাটির দিকে মুখ নামাল অনি। ওর চিবুক থরথর করছিল। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল শেষ পর্যন্ত।

'কি হল— আরে কাঁদো কেন?' ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ভরানী মাস্টার।

'আমি লিখিনি—', কান্না-জড়ানো গলায় বলল অনি।

এক হাতে ওকে জড়িয়ে কাছে আনলেন ভবানী মাস্টার, 'কি লিখ নাই?'

'গোপামাসী নিজে থেকে লিখে দিয়েছে। আমি লিখতে বলিনি।' জোরে কেঁদে উঠল ও।

ডান হাতে খাতাটা খুললেন ভবানী মাস্টার। উত্তরগুলো দেখলেন। মুহূর্তে ওঁর কপালের রগ দুটো নাচতে লাগল। তারপর অনির দিকে তাকালেন,'তুমি এগুলান দেখছ?'

ঘাড় নাড়ল অনি,'না।'

'বাঃ, ভাল। এখন চোখ থিকা জল মোছ। গোপাটার মাথায় গোবর থাকলে সার হোত, তাও নাই। ও যা ভুল করছে তুমি তা শুদ্ধ করো। বসো।' কথাটা বলে অনির হাত ধরে সামনে বসিয়ে দিলেন উনি। তারপর দরজার দিকে তাকিয়ে বিশুদের দেখতে পেয়ে ধমক দিল,'এই তোরা বাগানে থাকিস না। আয় বস, ঐ কোণায় বস। একসঙ্গে যাবি।'

অনি দেখল বিশু আর বাপী সুড়সুড় করে ভিতরে এসে বসল। ওদের দিকে না তাকিয়ে খাতাটা খুলল অনি। একটু পড়তেই ও দেখল একটা যোগ একদম ভুল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ও সেটা ঠিক করল।

শেষ পর্যন্ত ভুল ঠিক করা হয়ে গেলে ও খাতাটা মাস্টারের হাতে দিল। চটপট দেখে নিলেন উনি। দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন,'বাঃ, ফার্স্ট ক্লাস।'

তারপর অনির দিকে ফিরে ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন উনি। অনি বুঝতে পারছিল না ও কি করবে। ওঁর শরীর থেকে আসা ঘামের গন্ধে, নস্যির গন্ধে অনির কষ্ট হচ্ছিল। ভবানী মাস্টার ওর মাথায় হাত বুলিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'একটা কথা মনে রাখবা বাবা, নিজের কাছে সৎ

থাকলে জীবনে কোন দুঃখই দুঃখ হয় না। তুমি অনেক বড় হবা একদিন, কিন্তু সৎ থাকবা, আমাকে কথা দাও।'

কথাগুলো শুনতে শুনতে অনি আবার কেঁদে ফেলল। তারপর ঐ নস্যির গন্ধ, ঘামের গন্ধমাখা বুকে মাথা রেখে ও কান্না জড়ানো গলায় কি বলে থরথর করে কাঁপতে লাগল।

স্কুলের মাঠে বিকেলে ফুটবল খেলা হয় কিন্তু অনিদের সেখানে যাওয়া হয় না। ওদের কোয়ার্টার থেকে স্কুলের ফুটবল মাঠ অনেক দূর। তাছাড়া গেলেই যে খেলতে পাবে এমন নয়। একদিন অনিরা গিয়ে দেখেছিল তাদের বয়সী কেউ খেলছে না। হাফ প্যান্ট বা ধুতি গুটিয়ে পরে বড় বড় মানুষ হইহই করে ফুটবল খেলছে ওখানে। তাদের বিশাল বিশাল লোমশ পা দেখে ওরা ভয়ে ফিরে এসেছিল। বাগানের কোয়ার্টারের সামনে অঢেল খোলা জমি। মাঝে মাঝে উঁচু নিচু অবশ্য, তা ছাড়া দুটো কাঁঠালচাঁপার গাছ শক্ত হয়ে বসে আছে মধ্যিখানে —তাও খেলাটেলা যেত কিন্তু মুশকিল হল ওদের বয়সী ছেলে এই কোয়ার্টারগুলোতে বেশী নেই। অনিদের বাতাবিলেবু গাছ থেকে গোলগাল একটা লেবু নিয়ে ওরা মাঝে মাঝে খেলে কিন্তু সেটা ঠিক জমে না।

অনিরা বাড়ির সামনের মাঠে গোল হয়ে বসে ধনধান্য পুষ্পভরা গাইছিল। মোটামুটি কথাগুলো এখন মুখস্থ হয়ে গেছে। হঠাৎ ওরা শুনলো গোঁ গোঁ করে শব্দ উঠছে সামনের রাস্তায়। সাধারণত যেসব লরি বা বাস এই রাস্তায় রোজ চলাচল করে এ শব্দ তার থেকে আলাদা। কি গম্ভীর, যে সমস্ত পৃথিবী কাঁপিয়ে শব্দটা গড়াতে গড়াতে আসছে।

খানিক বাদেই ওরা দেখতে পেল ত্রিপলে মোড়া ভারী ভারী মিলিটারি ট্রাক একের পর এক ছুটে আসছে। মুখ-থ্যাবড়া গাড়িগুলো দেখতে বীভৎস, অনেকটা ক্ষেপে যাওয়া বুলডগের মত। প্রত্যেকটি গাড়ির নাকের ডগায় সরু লোহার সিক লিকলিক করছে। ট্রাকগুলো থেকে বেখাপ্পা মত কিছু বাইরে বেরিয়ে আছে, তবে সেগুলোর ওপর ভাল করে ত্রিপল ঢাকা।

তারপরই ওরা দেখতে পেল লরি ভর্তি কালো কালো বিকট চেহারার মিলিটারির দল। ট্রাকে বসে হই-হই করে চিৎকার করছে। এই ধরনের।

চেহারার মানুষ ওরা কখনও দেখেনি। এত দূর থেকেও ওদের সাদা দাঁত স্পষ্ট দেখা দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ বিশু 'ওরে বাবা গো' বলে চোঁ চাঁ দৌড় দিল নিজের বাড়ির দিকে। ওর দেখাদেখি বাপীও ছুটল। মিলিটারি ট্রাক দেখলে কেউ বাড়ির বাইরে যাবে না—এরকম একটা আদেশ ছোটদের জন্যে দেওয়া আছে। কিন্তু কি করে অনিরা বুঝবে কখন ওরা আসবে! দৌড়তে গিয়ে অনি টের পেল ওর দুটো পা যেন জমে গেছে। পা ঝিন ঝিন শুরু হয়ে গেল হঠাৎ। গলার কাছটায়, টনসিলের ব্যথাটাই বোধ হয়, কেমন করে উঠল। ছুটন্ত গাড়িগুলো দেখতে দেখতে ও নিজের অজান্তে ধনধান্যে পুষ্পভরা ফিসফিস করে গাইতে লাগল। আর গাইতে গাইতে ওর শরীরের সিরসিরানিটার কমে যাওয়া টের পেল। অনি অবাক হয়ে দেখল একটা গাড়ি ঠিক ওদের বাড়ির সামনে ব্রেক কষে থেমে গেছে। গাড়িটা থামতেই একটা লোক লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে এল। এত লম্বা লোক অনি কোনদিন দেখেনি, দু নম্বর লাইনের ভেটুয়া সর্দারের চেয়েও লম্বা। আর তেমনি মোটা। এদিক ওদিক মুখ ঘুরিয়ে জায়গাটা দেখে নিল লোকটা, তারপর অনিকে লক্ষ্য করে হন হন করে এগিয়ে আসতে লাগল। অনি দেখল লোকটার পিঠের পেছন থেকে ফাৎনার ডগার মত একটা কালো নল উঁকি মারছে আর একটা কিছু স্ট্র্যাপে লোকটার হাতে দোল খাচ্ছে হাঁটার তালে। ভয়ে সিঁটকে গিয়ে অনি প্রায় কান্নার সুরে ধনধান্য পুষ্পভরা বিড়বিড় করে যেতে লাগল বারংবার।

'ওয়াতার, ওয়াতার, পানি!'

অনি চোখ খুলে দেখল সামনে একটা ওয়াটারবট্‌ল ঝুলছে আর তার পেছনে পাহাড়ের মত উঁচু একটা লোক যার গায়ের রঙ মিশমিশে কালো। লোকটা হাসছে, কি সাদা দাঁতগুলো! লোকটা ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আবার বলল, 'ওয়াতার, প্লিজ।' জল চাইছে লোকটা, অনির পা দুটোয় ক্রমশ সাড় ফিরে পেল। ও তাকিয়ে দেখল পেছনের সব কোয়ার্টারগুলোর জানলা দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু ওদের বাড়ির জানলায় অনেকগুলো মুখ কি ভীষণ ভয় নিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে।

এগিয়ে দেওয়া ওয়াটার বট্‌লটা হাতে নিয়ে অনি নিজের বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে ও টের পেল এখন আর একদম ভয় করছে না, বুকের মধ্যে একটুও সিরসিরানি নেই। বরং নিজেকে খুব কাজের বলে

মনে হচ্ছে, বেশ বড় বড় লাগছে নিজেকে।

বারান্দায় উঠতেই দরজা খুলে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো হাত অনিকে জড়িয়ে ধরে ভেতরে টেনে নিল। সবাই মিলে বলতে লাগল, 'কি ছেলে রে বাবা, একটুও ভয় নেই, যদি ধরে নিয়ে যেত, আসুক আজ বাবা, হবে তোমার,' ইত্যাদি। বেঁকেচুরে নিজেকে ছাড়িয়ে অনি ঝাড়িকাকুর দিকে ওয়াটার বট্‌লটা এগিয়ে দিয়ে গম্ভীর মুখে বলল, 'জল নিয়ে এস শিগ্‌গীর, লোকটা দাঁড়িয়ে আছে।'

অনির গলার স্বরে এমন একটা কিছু ছিল যে, মাধুরী অবাক হয়ে ছেলের দিকে তাকালেন। অনি যে এই রকম গলায় কথা বলতে পারে মাধুরীর জানা ছিল না। ওয়াটার বট্‌লটা নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন উনি।

পিসীমা বললেন, 'হ্যাঁরে, তোকে কি বলল রে?'

অনি বলল, 'কি আর বলবে, জল চাইল।'

পিসীমা আবার বললেন, 'তোকে কি ভয় দেখাল?'

বিরক্ত হয়ে অনি বলল, 'ভয় দেখাবে কেন! জল চাইতে হলে কি তুমি ভয় দেখাও?'

এমন সময় মাধুরী ওয়াটার বট্‌লটা নিয়ে ফিরে এলেন। কম্বলে মোড়া বট্‌লটা এখন বেশ ভারী। মাধুরী জলের সঙ্গে একটা প্লেটে বেশ কিছু বাতাসা দিলেন। বাতাসাটা নিয়ে অনি মায়ের দিকে তাকাতে মাধুরী হাসলেন, 'শুধু জল দিতে নেই রে, যা।' এক হাতে জল অন্য হাতে বাতাসা নিয়ে অনি গটগট করে বাইরে বেরিয়ে এল। এই জন্যে মাকে ওর এত ভাল লাগে।

মাঠের মধ্যে গাছের মত লোকটা একা দাঁড়িয়ে ছিল। অনিকে আসতে দেখে একগাল হাসল। হাসি দেখে অনির সাহস আরো বেড়ে গেল। কাছাকাছি হতে লোকটা হাত বাড়িয়ে ওয়াটার বট্‌লটা নিয়ে বলল, 'থ্যাঙ্কু।' কথাটা অনি ঠিক বুঝলো না, কিন্তু ভঙ্গীতে বেশ মজা লাগল। ও বাতাসার প্লেটটা এগিয়ে ধরতে লোকটা চোখ কুঁচকে সেটাকে দেখে বলল, 'হোয়াতিজ দ্যাট?' মানেটা ধরতে না পারলেও অনি বুঝতে পারল লোকটা কি বলতে চাইছে। এখনও ওদের স্কুলে ইংরেজী শুরু হয় নি। সরিৎশেখর অবশ্য ওকে মাঝে মাঝে ইংরেজী শব্দ শেখান কিন্তু বাতাসার ইংরেজী কোনদিন শুনেছে বলে মনে করতে পারল না। বরং বাতাসা খেতে মিষ্টি,

আর মিষ্টির ইংরেজী সুইট—এটা বলে দিলেই তো হয়! শব্দটা শুনে লোকটা ঠোঁট দুটো গোল করে অবাক হবার ভান করে বলল, 'হোয়াই?' অনির মুখ দেখে হাসল সে, 'নো গুড ইংলিশ? আই টু! ওকে, ওকে।' বলে এক থাবায় বাতাসাগুলো নিয়ে মুখে পুরে চিবোতে লাগল। স্বাদ জিভে যেতে লোকটার মাথা দুলতে লাগলো চিবোনোর তালে তালে। তারপর ঢকঢক করে কয়েকটা ঢোক জল খেয়ে নিতেই পেছন থেকে ট্রাকের লোকগুলো ওকে হইহই করে ডাকতে শুরু করল।

অনি দেখল পেছনের লোকগুলোকে ইংরেজী নয়, অন্য কোন ভাষায় জবাব দিয়ে একহাতে অনিকে শূন্যে তুলে নিয়ে ট্রাকের দিকে হাঁটতে লাগ্‌ল। লোকটার গায়ের ঘেমো বোঁটকা গন্ধ আর ট্রাকের একদল নিগ্রোর হইহই, পেছনের বারান্দায় বেরিয়ে আসা পিসীমার আর্ত চিৎকারে অনির শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল, ওর হাত থেকে প্লেটটা টুপ করে পড়ে গেল। ওর মনে হল ও ছেলে ধরার কবলে পড়েছে, এখন ঐ ট্রাকে চাপিয়ে পৃথিবীর কোন দূরান্তে ওকে নিয়ে যাবে ওরা। বাবা মা দাদু কাউকে কোনদিন দেখতে পাবে না ও। প্রচণ্ড আক্রোশে লোকটার চোখদুটো দুই আঙুলে টিপে অন্ধ করে দিতে গিয়ে অনি শুনল ওকে মাথায় তুলে হাঁটতে হাঁটতে লোকটা অদ্ভুত ভাষায় ভীষণ চেনা সুরে গান গাইছে। গাইবার ধরন দেখে বোঝা যায়, খুব মগ্ন হয়ে গাইছে ও। ওর ভাষা বোঝা অসম্ভব কিন্তু সুর শুনে অনির মনে হল পুজো করার সময় পিসীমা এই রকম সুরে গুনগুন করেন। অনির হাত লোকটার স্প্রিং-এর মত চুলের ওপর এসে থেমে গেল।

ট্রাকের কাছে এসে লোকটা কিছু বলতে ট্রাকের ওপর দাঁড়ানো লোকগুলো হইহই করে উঠে হাত বাড়িয়ে অনির দিকে চার-পাঁচটা প্যাকেট এগিয়ে দিল। লোকটার কাঁধের ওপর থাকায় অনি ট্রাকের সবটাই দেখতে পাচ্ছে। একগাদা কম্বল পাতা, বন্দুক, কাচের বোতল ছড়ানো। প্যাকেটগুলো ওর হাতে গছিয়ে দেওয়া হয়ে গেলে লোকটা ওকে মাটিতে নামিয়ে দিল। তারপর বিরাট থাবার মধ্যে ওর মুখটা ধরে কেমন গলায় বলল, 'থাঙ্ক ইউ মাই সান।' বলে লাফ দিয়ে ট্রাকে উঠে গেল। ওয়াটার বট্‌লটা তখন ট্রাকের ভেতর হাতে হাতে ঘুরছে।

ট্রাকটা চলে যেতে রাস্তাটা ফাঁকা হয়ে গেল। বিরাট আসাম রোড

চুপচাপ—শব্দ নেই কোথাও। অনি ওর বুকের কাছে ধর' প্যাকেটগুলোর দিকে তাকাল। গন্ধ এবং ছবিতে বোঝা যাচ্ছে, এগুলো বিস্কুট এবং টফির প্যাকেট। ওরা ওকে এগুলো ভালবেসে দিয়ে গেল। অথচ ও কি ভয় পেয়ে গিয়েছিল! লোকগুলোকে ছেলেধরা বলে ভেবেছিল। অথচ লোকগুলো কত ভালো! নিজের বাড়ির দিকে তাকিয়ে ও দেখল পিসীমা মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে, পাশে ঝাড়িকাকু, অনেক পিছনে মা। হঠাৎ ওর পিসীমার ওপর রাগ হল, পিসীমাই শুধু শুধু মিলিটারিদের ছেলেধরা বলে ভয় দেখায়। অনি আর দাঁড়াল না। একছুটে মাঠটা পেরিয়ে পিসীমার বাড়ানো হাতের ফাঁক গলে মায়ের শরীর জড়িয়ে ধরল।

মাধুরী বললেন, 'কি হয়েছে?'

মাকে জড়িয়ে ধরতে মুঠো আলগা হওয়ায় অনির হাত থেকে প্যাকেটগুলো টুপটুপ করে মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল। সেই অবস্থায় মায়ের বুকে মুখ গুঁজে অনি বলল, 'লোকটা খুব ভালো, কিন্তু মা, আমি বোকার মত বড্ড ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

ভরত হাজাম সরিৎশেখরের চুল কাটছিল। কাঁঠালতলার রোদ্দুরে কাঠের পিঁড়ি পেতে উনি বসেছিলেন। চুল কাটার সব সরঞ্জাম বাড়িতে রেখেছেন উনি। বারো ভূতের চুল-কাটা কাঁচি খুরে ওঁর বড় ঘেন্না, কার কি রোগ আছে বলা যায় না। ভরত তাই খালি হাতে এ বাড়িতে আসে। এমন কি কাটা চুল থেকে গা বাঁচানোর জন্যে ত্রিশ বছরের পুরোনো লং ক্লথ যেটা এই মুহূর্তে সরিৎশেখর জড়িয়ে বসে আছেন সেটাও আনতে হয় না।

কিচকিচ শব্দ উঠছিল ভরতের দুই আঙুলের চাপে। বেশীক্ষণ মাথা নিচু করতে পারেন না বাবু, তাই মাঝে মাঝে হাত সরিয়ে নিচ্ছিল ভরত। আজ ত্রিশ বছর এই বাড়ির চুল কাটছে ও, অনেককেই জন্মাতে দেখেছে, মরতেও। বিয়ে দিয়ে এনেছে কয়েকজনকে। কিন্তু এখন আর তেমন জোর নেই ওর। কেমন করে যে ও পুরনো হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারে না। এই বাড়ির সেজবাবু ওর কাছে চুল কাটে না। একদিন বলতেই হেসে উঠেছিল, 'কেন বাবা, আমাকে আর দয়া নাই বা করলে, তোমার বাটিছাঁট নেবার পার্টি এ বাড়িতে অনেক আছে। বাবা টু আনি। অল ফাউন্ড দু টাকা।' মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল ভরতের, হ্যাঁ, দু-টাকায় ও সবাইয়ের এমন কি

ঝাড়ির চুলটাও কেটে দেয়। প্রথমে ছিল আট আনা, বছর পাঁচেক আগে বেড়ে গিয়ে দু'টাকা হল।

সরিৎশেখর মাথা তুলতেই হাত সরিয়ে নিল ভরত হাজম, 'তোর কাছে এই শেষ চুল কাটা, না?' ভরত কোন উত্তর দিল না। বাবুর চাকরি শেষ, এই বাগান থেকে শহরে বাড়ি করে বাবু চলে যাচ্ছেন। এই মাথার কালো চুলগুলো চোখের সামনে ফুলের মত সাদা হয়ে গেল—আজ ত্রিশ বছর ধরে এই মাথার চুল কেটেছে ও, আর কোনোদিন কাটতে পারবে না। লোকমুখে শুনেছে ও, বাবু নাকি এই বাগানে আর কোনদিন পা দেবেন না। কথাটা ভাবতেই বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল। পানসে চোখে জল আসতে লাগল।

হঠাৎ সরিৎশেখর বললেন, 'ভরত, যাবার সময়ে এই খুরকাঁচিগুলো নিয়ে যাস। খুব চাইতিস তো এককালে।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড চিৎকার করে কেঁদে উঠল ভরত। দু-হাতে মুখ গুঁজে ফোঁপাতে লাগল বাচ্চা ছেলের মত।

কান্নার শব্দ শুনে সবাই ঘব থেকে বেরিয়ে এল। রান্নাঘরে অনিকে খেতে দিচ্ছিলেন মাধুরী, শব্দ শুনে এঁটো হাতে একছুটে বেরিয়ে এল অনি, পিছনে পিছনে মাধুরী। ঝাড়িকাকু ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে হাসছে। মহীতোষকে দেখে মাথায় ঘোমটা তুলে দিলেন মাধুরী। শ্বশুবমশাই পিছন ফিরে বসে, সামনে ভরত হাজাম মাটিতে বসে কাঁদছে। একটু আগে স্নান হয়ে গেছে মহীতোষের। এই বাড়িতে লুঙ্গী পরা নিষেধ ছিল এককালে। মহীতোষ নিয়ম ভেঙেছেন। শীতকাল নয় তবু ঠান্ডা আছে, তাই লুঙ্গির ওপর পুরো হাতের গেঞ্জি চাপানো। অনি দেখল পিসীমা দাদুর কাছে এগিয়ে গেলেন। মহীতোষ বারান্দায় দাঁড়িযে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে?'

সরিৎশেখর মুখ ঘুরিয়ে সবাইকে দেখলেন। অনি দেখল দাদুর মুখ কেমন অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। কী গম্ভীর! ভরত হাজামকে কি দাদু বকেছে খুব? অমন করে কাঁদছে কেন? চুল কাটার সময় ভরত এমন করে ওর ঘাড় ধরে থাকে যেন অনিরই কান্না পেয়ে যায়। একটু নড়াচড়া করলে মাথায় গাঁট্টা মারে। আবার মন ভালো থাকলে গানও শোনায় কাঁচি চালাতে চালাতে। একটা গান তো অনিরই মুখস্থ হয়ে গেছে—'বুড্ডা কাঁদে বুড্ডি

নাচে, বুড্ডা বোলে ভাগো'। মা অবশ্য খুব বারণ করে দিয়েছে গানটা গাইতে। কিন্তু বাবা দাদু বাড়িতে না থাকলে ছোটকাকু গলা ছেড়ে ঠাট্টা করে গানটা মাঝে মাঝে গায়।

সরিৎশেখর গম্ভীর গলায় বললেন, 'মহী, আমি যখন এখানে থাকবো না তখন যেন ভরতের এ বাড়িতে আসা বন্ধ না হয়।'

মহীতোষ বললেন, 'কি আশ্চর্য, বন্ধ হবে কেন?'

সরিৎশেখর বললেন, 'আর ও তো বুড়ো হয়ে গেছে, যখন চুল কাটা ছেড়ে দেবে তখনও যেন প্রতি মাসে টাকাটা দেওয়া হয়।'

মহীতোষ হাসলেন, 'আচ্ছা।'

পিসীমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'ও বাবা, এই জন্যে ভরত কাঁদছে?'

সরিৎশেখর মাথা নাড়লেন, না। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে হেঁকে উঠলেন, 'আয় বাবা ভরত, বাকি চুলটা কেটে দে, আমি সারাদিন বসে থাকতে পারব না।'

বাঁধাছাঁদা শেষ। টুকিটাকি যাবতীয় জিনিসপত্র পিসীমা জড়ো করেছেন। চিরকালের জন্য যেন স্বর্গছেঁড়া ছেড়ে চলে যাওয়া—এই যে মাধুরী মহীতোষরা এখানে থাকছেন এ কথাটা আর মনে নেই। শহরে গিয়ে অসুবিধে হতে পারে বলে পুরো সংসারটা তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন পিসীমা। অনির জামাকাপড় বাক্সে তোলা হয়ে গিয়েছে। সময়টা যত গড়িয়ে যাচ্ছে অনির বুকের ভেতর তত কি খারাপ লাগছে! অথচ দাদুর মুখ দেখে মোটেই মনে হচ্ছে না, এখান থেকে যেতে একটুও খারাপ লাগছে। এই চা-বাগান নাকি দাদু নিজের হাতে তৈরি করেছেন. দাদুর তো বেশী মন-কেমন করা উচিত। বরং দাদু চলে যাচ্ছে শুনে এত যে লোকজন দেখা করতে আসছে, তাদের সঙ্গে বেশ হেসে হেসে দাদু কথা বলছেন। মাঝে [illegible]'টা দিন। পনেরই আগস্ট। তার পরদিনই চলে যেতে হবে এখান থেকে। বাগান থেকে দুটো লরি দেবে মালপত্র নিয়ে যেতে—আজ অবধি অনি শহরে যায়নি কখনো।

অন্ধকারে অনি চারপাশে চোখ বোলাল। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এখন রাত ক'টা! ভোর পাঁচটার সময় বিশু আর বাপী ওদের বাড়ির সামনে

আসবে। রাত্রে শোওয়ার সময় মাধুরী অনির জন্য সাদা শার্ট কালো প্যান্ট ইস্ত্রি করিয়ে রেখে দিয়েছেন। পাঁচটা বাজতে আর কত দেরি! অনির মোটেই ঘুম আসছিল না। ওর বুকের ওপর মাধুরীর একটা হাত নেতিয়ে পড়ে আছে। ওপাশে মহীতোষের নাক ডাকছে। কান খাড়া করে অনি কিছুক্ষণ শুনতে চেষ্টা করল বৃষ্টির শব্দ হচ্ছে কিনা। যাক্ বাবা, বৃষ্টি হচ্ছে না। কাল সারাটা দিন যদিও রোদের দিন গেছে, তবু সন্ধ্যেনাগাদ মেঘ-মেঘ করছিল। হঠাৎ মাধুরীর হাতটা একটু নড়ে উঠতে অনি চমকে উঠল। মাধুরীর শরীর থেকে অদ্ভুত মিষ্টি গন্ধটা বেরুচ্ছে। আর এক দিন একটা রাত—মায়ের বুকে মুখ গুঁজে দিতে মাধুরীর ঘুম ভেঙে গেল। জড়ানো গলায় বললেন, ' আঃ, ঠেসছিস কেন?' আর সঙ্গে সঙ্গে অনি শুনতে পেল কে যেন তার নাম ধরে বাইরে ডাকছে। তড়াক করে উঠে পড়ল ও।

মাধুরী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হল?'

অনি বলল' ওরা এসে গেছে।' অনি দেখল, ওর গলা শুনে মহীতোষের নাক ডাকা থেমে গেল। বাবার ঘুমটা অদ্ভুত, অনি ঠিক বুঝতে পারে না।

পাটভাঙা জামাপ্যান্ট, বুকে কাগজের গান্ধীর ছবি পিন দিয়ে এঁটে, হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে বীরের মত পা ফেলে অনি বাইরের ঘরে এসে থমকে দাঁড়াল। বাইরের ঘরের জানলা খুলে দেওয়া হয়েছে। দরজাও খোলা। বাইরে এখনও আলো ফোটেনি। অন্ধকারটা ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে। সেই ফ্যাকাশে অন্ধকারটা ঘরময় জুড়ে রয়েছে। ঘরের একপাশে ইজিচেয়ারে সরিৎশেখর চুপচাপ বসে আছেন। অনির পায়ের শব্দে উনি মুখ ফিরিয়ে ওকে দেখলেন। দাদু এভাবে বসে আছেন কেন? দাদু কি কাল রাত্রে ঘুমোননি! দাদুর মুখটা অমন দেখাচ্ছে কেন? হাত বাড়িয়ে সরিৎশেখর অনিকে ডাকলেন, 'কোথায় চললে?'

'স্কুলে। আজ আমাদের স্বাধীনতা দিবস।' অনি বলল।

'স্বাধীনতা মানে জানো?' সরিৎশেখর বললেন।

'হ্যাঁ, আমরা নিজেরাই নিজেদের রাজা এখন।' অনি শোনা কথাটা বলল।

'গুড। গো অ্যাহেড। এগিয়ে যাও।' পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন সরিৎশেখর।

ওকে দেখে বিশু বলল, 'তাড়াতাড়ি চল, আরম্ভ হয়ে গেল বলে।'

বাপী বলল, 'কাল বারোটার সময় সবাই রেডিও শুনতে গিয়ে দেখে খারাপ হয়ে গিয়েছে। বাবা বাড়ি ফিরে বলল!' অনি ব্যাপারটা জানে না, ও শুনেছিল রাতে রেডিওতে নাকি কি সব বলবে, কিন্তু ওদের রেডিওটাই খারাপ হয়ে গেল, যাঃ।

দেরি হয়ে গেছে বলে ওরা দৌড় শুরু করল। আসাম রোডের দু পাশে সার দিয়ে দাঁড়ানো পাইন-দেওদার গাছের শরীরে অন্ধকার ঝুপসি হয়ে বসে আছে। রাস্তাটা এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পুব দিকটায় একটা লালচে আভা এসেছে। ওরা তিনজন পাশাপাশি তিনটে পতাকা সামনে ধরে দৌড়চ্ছিল। হাওয়ায় পতাকা তিনটে পতপত করে উড়ছে; একটু শীতের ভাব থাকলেও বেশ আরাম লাগছে ছুটতে। অনির ভারী ভালো লাগছিল। আজ আমরা নিজের রাজা নিজে। দৌড়তে দৌড়তে বাপী চিৎকার করল, 'পনেরই আগস্ট', ওরা চিৎকার করে জবাব দিল, 'স্বাধীনতা দিবস।' এখন এই রাস্তার চারপাশে কেউ জেগে নেই। নির্জন আসাম রোডের ওপর ছুটে চলা তিনটে বালকের চিৎকার শুনে একরাশ পাখি দুদিকের গাছের মাথায় বসে কলরব করে জানান দিল। ভারতবর্ষের কোন এক কোণে এই নিঝুম প্রান্তরে সাতচল্লিশ সালের পনেরই আগস্টের এই ভোর-হতে-যাওয়া সময়টায় তিনটে বালক কি বিরাট দায়িত্ব নিয়ে পতাকা উঁচু রেখে দৌড়তে দৌড়তে গান ধরল, ওদের একটিমাত্র শেখা গান, 'ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা।' দৌড়বার তালে অনভ্যস্ত গলার সুর ভেঙেচুরে যাচ্ছে, তবু দু'পাশের প্রকৃতি যেন তা অঞ্জলির মত গ্রহণ করছিল।

স্কুলবাড়ির কাছাকাছি এসে ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল। এখনও আলো ফোটেনি, কিন্তু কষ্ট করে অন্ধকার খুঁজতে হয়। ওরা দেখল একটি মূর্তি খুব সতর্ক পায়ে রাস্তার এক পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। বিশু বলল, 'রেতিয়া না রে?'

ওরা তিনজন তিন পাশে গিয়ে দাঁড়াতে রেতিয়া চমকে সোজা হয়ে দাঁড়াল, মুখটা ছুঁচলো করে অন্ধ চোখ দুটো বন্ধ করে কিছু টের পেতে চেষ্টা করল। গলা ভারি করে অনি জিজ্ঞাসা করল, 'কাঁহা যাহাতিস রে!'

চট করে উত্তর এল, 'স্কুল।' ওরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল, তারপর আবার দৌড় শুরু করল। অনি ঠিক বুঝতে পারছিল না রেতিয়ার কাছে কি করে খবর গেল যে আজ স্বাধীনতা দিবস। স্বাধীনতা মানে আমি নিজেই

নিজের রাজা। রাজার ইংরেজি কিং। বাবারা তাস খেলার সময় কিংকে সাহেব বলে। আমরা আজ থেকে সব সাহেব হয়ে গেলাম। রেতিয়া পর্যন্ত।

স্কুলের মাঠটা এই সাতসকালে প্রায় ভরে গেছে। ওদের বাগান থেকে মাত্র ওরা তিনজন কিন্তু ওপাশের বাজার, হিন্দুপাড়া কলিন পার্ক থেকে ছেলেমেয়ের দল এসে মাঠটা ভরিয়ে দিয়েছে। স্কুলের সামনে একটা লম্বা বাঁশ পোঁতা হয়েছে যার ডগা থেকে একটা দড়ি নিচে নামানো। পাশে টেবিলের ওপর মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর ছবি। এই নামটা অনি সবে শিখেছে। এত বড় নাম মনে না থাকলে গান্ধীজী বলা যেতে পারে, নতুন দিদিমণি বলেছেন। ভবানী মাস্টারকে দেখে অবাক হয়ে গেল ও। ধোপভাঙা ধুতি পাঞ্জাবি পরলেও অনেককে ভাল দেখায় না, ভবানী মাস্টারকেও কেমন দেখাচ্ছে। তার ওপর মাথায় সাদা নৌকো টুপি। সুভাষচন্দ্র বসুর ছবিতে দেখেছে ও। নতুন দিদিমণি গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন পাশে। টেবিলের ওপাশে দুটো চেয়ার, একটাতে ব্যানার্জি স-মিলের বড় কর্তা, অন্যটাতে মোটা মতন একটা লোক নৌকো টুপি পরে বসে ঘড়ি দেখছেন মাঝে মাঝে।

অনিরা ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে গেল। স্বর্গছেঁড়ার বেশ বড় বড় কয়েকজন ছেলে যারা স্কুলে পড়ে না তারা ভিড় ম্যানেজ করছিল। পূর্বদিকটা ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। ব্যানার্জি স-মিলের বড় কর্তা ভবানী মাস্টারকে ডেকে ফিসফিস করে কি বলতে ভবানী মাস্টার হাত তুলে সবাইকে শান্ত হতে বললেন। গোলমাল থেমে যেতেই নতুন দিদিমণি চিৎকার করে উঠলেন, 'বন্দে-এ মাতরম্।' সঙ্গে সঙ্গে কয়েকশ' শিশুর গলায় উল্লাস উঠল, 'বন্দে-এ মাতরম্।' তিনবার এই ধ্বনিটা উচ্চারণ করে অনির মনে হল ওদের চারপাশে অদ্ভুত একটা ফুলের দেওয়াল তৈরি হয়ে গেছে।

ভবানী মাস্টার চিৎকার করে উঠলেন, 'তোমরা জান, আজ ইংরেজের দাসত্ব মোচন করে আমরা স্বাধীন হয়েছি। দু'শ বছর পরাধীনতার পরে আমাদের ক্ষুদিরাম, বাঘা যতীন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, গান্ধীজীর জন্যে আজ এই দেশে স্বাধীনতা এসেছে।' নতুন দিদিমণি ফিসফিস করে কিছু বলতেই ভবানী মাস্টার বললেন, 'হ্যাঁ, এই সঙ্গে সুভাষ বোসের নাম ভুলে গেলে

চলবে না। স্বাধীনতার এই পুণ্যদিনে আমরা সমবেত হয়েছি। তোমরা যারা এখনও নাবালক তারা শোন, এই দেশটাকে ছিঁড়ে শুষে নষ্ট করে দিতে চেয়েছে ইংরেজরা। এই দেশটাকে নিজের মায়ের মত ভেবে নিয়ে তোমাদের নতুন করে গড়তে হবে। বল সবাই বন্দে মাতরম্।'

'অনিরা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল, 'বন্দে মাতরম্।'

অনি দেখল ভবানী মাস্টারের চোখ থেকে জল নেমে এসেছে, তিনি মোছার চেষ্টা করছেন না। সেই অবস্থায় ভবানী মাস্টার বললেন, 'তাকিয়ে দ্যাখো, পূর্ব দিগন্তে সূর্যদেব উঠেছেন। এই মহালগ্নে আমাদের স্বর্গছেঁড়ার আকাশে প্রথম জাতীয় পতাকা উড়বে। শহর থেকে বিশিষ্ট জননেতা শ্রীযুক্ত হরবিলাস রায় মহাশয় আজ আমাদের এখানে এসেছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর অবদানের কথা আমরা সবাই জানি। আমি তাঁকে অনুরোধ করেছি এই পবিত্র দায়িত্ব গ্রহণ করতে।

সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে। কোথাও কোন শব্দ নেই। স্বর্গছেঁড়ার মানুষের জীবনে এমন একটা ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে যার গুরুত্ব সম্পর্কে কেউ হয়তো কোনদিন সচেতন ছিল না। এখন এই মুহূর্তে সবাই উন্মুখ হয়ে দাঁড়িয়ে।

হরবিলাসবাবু দাঁড়ালেন, সামনের জনতার ওপর ওঁর বৃদ্ধ চোখ দুটো রাখলেন খানিক, তারপর খুব পরিচ্ছন্ন গলায় বললেন, 'আজ সেই মুহূর্ত এসেছে যার জন্য আমরা সারাজীবন সংগ্রাম করেছি। গান্ধীজীর অনুগামী আমি, আমাদের সংগ্রাম শান্তির জন্য, ভালবাসার জন্য। কিন্তু আমার তো বয়স হয়েছে। এই পতাকা আমার যৌবনের স্বপ্ন ছিল, একে আমি আমার রক্তের চেয়ে বেশী ভালবাসি। আজ এই পতাকা মাথা উঁচু করে আকাশে উড়বে—এই দৃশ্য দেখার জন্যই আমি বেঁচে আছি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, এই পতাকা আকাশে তোলার যোগ্যতা আমার নেই। এই পতাকা তুলবে আগামীকালের ভারতবর্ষের দায়িত্ব যাদের ওপর তারাই। সাতচল্লিশ সালের পনেরই আগস্টের এই সকাল তাদের সারাজীবন দেশ গড়ার কাজে শক্তি যোগাবে। তাই আমি আগামীকালের নাগরিকদের মধ্যে একজনকে এই পতাকা তোলার জন্য আহ্বান করছি।'

সবাই অবাক হয়ে কথাগুলো শুনলো। হরবিলাসবাবু কয়েক পা এগিয়ে এসে সামনের দিকে তাকালেন। তাঁর চোখ ছোট ছোট ছেলেদের মুখের ওপর, কাকে ডাকবেন তিনি ভাবছেন। হঠাৎ অনি দেখল হরবিলাসবাবু

তার দিকে তাকিয়ে আছেন। খানিকক্ষণ দেখে তিনি আঙুল তুলে অনিকে কাছে ডাকলেন। অনি প্রথমে বুঝতে পারেনি যে তাকেই ডাকা হচ্ছে। বোঝা মাত্রই ওর বুকের মধ্যে দুকদুক শুরু হয়ে গেল। হাঁটুর তলায় পা দুটোর অস্তিত্ব যেন হঠাৎই নেই। বাপী ফিসফিস করে বলল, 'তোকে ডাকছে, যা।'

হরবিলাসবাবু ডাকলেন, 'তুমি এস ভাই।'

কি করবে ভেবে না পেয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল অনি। স্বর্গছেঁড়ার ছেলেমেয়ের দল অনির দিকে তাকিয়ে আছে। হরবিলাসবাবু এক হাতে অনিকে জড়িয়ে ধরে পতাকার কাছে নিয়ে গেলেন। ভবানী মাস্টার বাঁশের গায়ে জড়ানো দড়িটা খুলে অনিকে ফিসফিস করে বললেন, 'এইদিকের রশিটা টানবা, পুঁটলিটা একদম ডগায় গেলে রশিটা জোরে নাচাবা।'

অনি সম্মোহিতের মত মাথা নাড়ল। হরবিলাসবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম কি ভাই?'

'অনি, অনিমেষ।'

হরবিলাসবাবু সোজা হয়ে সামনের দিকে তাকালেন, 'আপনারা সবাই প্রস্তুত হোন। এখন সেই ব্রাহ্মমুহূর্ত, আমাদের জাতীয় পতাকা স্বাধীন ভারতের আকাশে মাথা উঁচু করে উড়বে। তাকে তুলে ধরছে আগামীকালের ভারতবর্ষের অন্যতম নাগরিক শ্রীমান অনিমেষ।'

কথাটা শেষ হতেই ভবানী মাস্টার ইঙ্গিত করে অনিমেষকে দড়িটা টানতে বললেন।

দু হাতে হঠাৎ যেন শক্তি ফিরে পেল অনি, সমস্ত শরীরে কাঁটা দিচ্ছে, মা কোথায়— মা যদি দেখত, অনি দড়িটা ধরে টানতে লাগল। এ পাশের দড়ি বেয়ে একটা রঙিন পুঁটলি উঠে যাচ্ছে, ওদিকে দড়ি নেমে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে হরবিলাস বাবু চিৎকার করে উঠলেন, 'বন্দেমাতরম্।' সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গছেঁড়া কাঁপিয়ে চিৎকার উঠল, 'বন্দেমাতরম্'। চিৎকারটা থামছে না, একের পর এক ডাকের নেশায় সবাই পাগল, সেই সঙ্গে শঙ্খ বাজতে লাগল। নতুন দিদিমণি ব্যাগ থেকে শঙ্খ বের করে গাল ফুলিয়ে সেই ডাকের সঙ্গে মিলিয়ে সেই শঙ্খধ্বনি করতে লাগলেন।

অনি তাকিয়ে দেখল পুঁটলিটা ওপরে উঠে গেছে। দড়িটা ধরে ঝাঁকুনি দিতেই চট করে সেটা খুলে গিয়ে ঝুরঝুর করে কি সব আকাশ থেকে অনির

মাথার ওপর ঝরে পড়তে লাগল। অনি দেখল একরাশ ফুলের পাপড়ি ওর সমস্ত শরীর ছুঁয়ে নিচে পড়ছে আর সকালের বাতাস মেখে প্রথম সূর্যের আলো বুকে নিয়ে তিনরঙা পতাকা কী দারুণ গর্বে দোল খাচ্ছে। চারধারে হইহই চিৎকার, এ ওকে জড়িয়ে ধরছে আনন্দে, কারো কোন কথা শোনা যাচ্ছে না। ওপরের ঐ গর্বিত পতাকার দিকে তাকিয়ে অনির মনে হল — ও এখনও ছোট, পতাকাটা ওর নাগালের অনেক বাইরে।

সরিৎশেখর ফেয়ারওয়েল নিতে রাজী হলেন না। পনেরই আগস্টের দুপুরে হে সাহেব নিজে গাড়ি চালিয়ে সরিৎশেখরের কাছে এলেন। সরিৎশেখর তখন বারান্দায় বেতের চেয়ারে অনিকে নিয়ে বসে ছিলেন। আজ স্বর্গছেঁড়ায় অনি একটা খবর হয়ে গিয়েছে। হরবিলাসবাবু অনিকে দিয়ে প্রথম জাতীয় পতাকা তুলিয়েছেন, এই কথাটা সবার মুখে মুখে ঘুরছে। পতাকা তোলার পর ছবি তোলা হয়েছে অনিকে সামনে রেখে। ভবানী মাস্টার বলেছেন ছবিটা বাঁধিয়ে স্কুলের বারান্দায় টাঙিয়ে রাখবেন। খবরটা শুনে সরিৎশেখর সেই যে অনিকে সঙ্গে রেখেছেন আর ছাড়তেই চাইছেন না।

হে সাহেবের বাড়ি স্কটল্যান্ডে। চা-বাগানের ম্যানেজারি করে গায়ের রঙটা সামান্য নষ্ট হলেও আচার-আচরণে পুরো সাহেব। গাড়ি থেকে নামতেই সরিৎশেখর উঠে দাঁড়ালেন। এই দীর্ঘ বছরগুলো চা-বাগানে কাজ করে তিনি অনেক বিদেশী ম্যানেজারের সংস্পর্শে এসেছেন এবং তাঁদের মধ্যে কেউ তাঁর বিরুদ্ধে অসৌজন্যের অভিযোগ করতে পারেননি। ম্যাকফার্সন সাহেব একসময় অভিযোগ করতেন সরিৎশেখর কংগ্রেসীদের সঙ্গে বেশি মেশামেশি করছেন, হিন্দু-মুসলমান গণনার সময় তিনি কংগ্রেসকে সাহায্য করেছেন, কিন্তু সেটা ছিল তাঁদের অন্তরঙ্গ ব্যাপার। এ নিয়ে ম্যাকফার্সন সাহেব ওপরতলায় কোনদিন রিপোর্ট করেননি।

'হ্যালো বড়বাবু।' হে সাহেব হাসলেন, হেসে হাত বাড়িয়ে দিলেন। সরিৎশেখর করমর্দন করে সাহেবকে চেয়ারে বসালেন। হঠাৎ অনির ভবানী মাস্টারের কথা মনে পড়ে গেল। ইংরেজ সাহেবরা আমাদের দেশটাকে ছিড়ে শুষে নিয়ে চলে গেছে। সবাই তো যায়নি, এই হে সাহেব তো এখনও দাদুর সামনের চেয়ারে বসে হাসছেন। দাদু ওঁর সঙ্গে অমন ভালভাবে কথা

বলছে কেন? আজ তো আমরা নিজেরাই নিজেদের রাজা। ব খারাপ লাগছিল অনির।

হে সাহেব বললেন, 'আমি খবর পেলাম, তুমি নাকি ফেয়ারওয়েল নিতে রাজী হচ্ছো না!' বাংলা বলেন সাহেব ভাঙা ভাঙা, তবে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। কথাটা বলার সময় সাহেবের মুখ-চোখ খুব গম্ভীর দেখালো।

সরিৎশেখর হাসলেন, 'আমাকে তোমরা তাড়িয়ে দিতে চাইছ?'

সাহেব বললেন, 'সে কি, একথা কেন বলছ? এই টি-এস্টেট তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। ফেয়ারওয়েল মানে কি তাড়িয়ে দেওয়া?'

সরিৎশেখর হাসলেন, 'দ্যাখো সাহেব, আমি জানি এই বাগানের সবাই আমাকে ভালোবাসে। আজ সবাই আমাকে ভাল কথা বলে উপহার দেবে এবং আমি সেগুলো নিয়ে চুপচাপ চলে যাব, ব্যাপারটা ভাবতে খুব অস্বস্তি লাগছে।'

সাহেব বললেন, 'কিন্তু এটাই তো প্র্যাকটিস।'

খুব ধীরে ধীরে সরিৎশেখর বললেন, 'আজ আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে। দু'শ বছর পর তোমাদের হাত থেকে ক্ষমতা ফিরে পেয়েছি। এমন দিনে আমাকে ফেয়ারওয়েল দিও না, নিজেকে বড় অক্ষম মনে হবে। আমাকে তো বেঁচে থাকতে হবে!'

হে সাহেব সরিৎশেখরের দিকে কিছুক্ষণ স্থির চোখে তাকালেন, তারপর মাথা নিচু করলেন, 'আই আন্ডারস্টান্ড। তবে আমরা তো কমন পিপল, ওয়েল, তোমার ফেয়ারওয়েলে যদি আমি না থাকি তাহলে তোমার আপত্তি আছে?'

চট করে উঠে দাঁড়ালেন সরিৎশেখর, উঠে এসে হে সাহেবের ..৩ জড়িয়ে ধরলেন, 'কি বলছ সাহেব! আমি তোমাকে হেয় করতে চাইনি। তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কের মধ্যে আমি বিশ্বাস করি কে তিক্ততা নেই। তোমার পূর্বপুরুষ আমার পূর্বপুরুষের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল, তার জন্যে তুমি দায়ী হবে কেন? তুমি তো জান আমি অ্যাকটিভ পলিটিক্স্ কোনকালে করিনি। আর আমি জানি এখন ভারতবর্ষের যাঁরা নেতা হবেন তাঁদের সঙ্গে আমাদের মত সাধারণ মানুষের কোন যোগাযোগ থাকবে না। তবু আজ আমাদের স্বাধীনতা দিবস— এটা একটা আলাদা ফিলিংস— আমার মনে হচ্ছে আমি যৌবনে ফিরে গিয়েছি— তুমি

ফেয়ারওয়েল দিয়ে আমাকে বুড়ো করে দিও না।'

হে সাহেব উঠে দাদুর একটা হাত ধরে গাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলেন, পেছনে অনি। হে সাহেব বললেন, 'বাবু, এবার বোধ হয় আমাকে দেশে ফিরে যেতে হবে। কোম্পানী ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়ায় হয়তো বিজনেস করতে চাইবে না। সো, আমাদের হয়তো আর কোনদিন দেখা হবে না। বাট, আমি চিরকাল এই দিনগুলো মনে রাখবো, আমি জানি তুমিও ভুলবে না।'

দাদু কিছু বললেন না। সাহেব গাড়িতে উঠে অনির দিকে তাকালেন, তার পর হাত নেড়ে বললেন, 'কনগ্রাচুলেশন, আওয়ার ইয়ং হিরো।'

গাড়িটা চলে যেতে অনি দাদুর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। দাদুর পাশে দাঁড়ালে ওর নিজেকে ভীষণ ছোট লাগে। সরিৎশেখর নাতির কাঁধে হাত রেখে হাঁটতে লাগলেন হঠাৎ। পায়চারি করে বেড়াবার মত হাঁটতে হাঁটতে ওঁরা আসাম রোডে এসে পড়লেন। অনি দেখছিল, দাদু কোন কথা বলছেন না, মুখটা গম্ভীর। বাড়ির সবাই ওঁকে খুব ভয় করে কিন্তু অনির সঙ্গে উনি এরকম মুখ করে থাকেন না। অনেকক্ষণ থেকে সাহেব সম্পর্কে একগাদা জিজ্ঞাসা অনির মনে ছটফট করছিল। হাঁটতে হাঁটতে সে বলল, 'দাদু, সাহেবকে তুমি কিছু বললে না কেন?'

সরিৎশেখর আনমনে বললেন, 'কেন, কি বলব?'

অনি অবাক হল, 'কেন? ওরা আমাদের দেশটাকে ছিড়ে শুষে নষ্ট করে দেয়নি?'

সরিৎশেখর চমকে নাতির দিকে তাকালেন,'ও বাবা, তুমি এসব কথা কোত্থেকে শিখলে! নিশ্চয়ই ভবানী মাস্টার বলেছে?'

ঘাড় নাড়ল অনি, 'হ্যাঁ, বল না মিথ্যে কথা না সত্যি কথা?'

দুদিকে মাথা দোলালেন সরিৎশেখর, 'মিথ্যে নয় আবার সবটা সত্যি নয়। শোন ভাই, কেউ কাউকে নষ্ট করতে পারে না। সাহেবরা যখন এসেছিল আমরা ওদের হাতে দেশটাকে তুলে দিয়েছিলাম; ওরা নিজেদের স্বার্থে দেশটাকে ব্যবহার করবেই। কিন্তু হাতের পাঁচ আঙ্গুল কি সমান? কেউ কেউ তো অত্যাচারী নাও হতে পারে। যেমন ধর এই হে সাহেব, ওরা যে আমাদের প্রভু, আমরা যে পরাধীন তা কোনদিন ওঁর ব্যবহারে টের পাইনি। যেই আমরা স্বাধীন হলাম অমনি সব সাহেব খারাপ হয়ে গেল তা

বলি কি করে?'

দু পাশে বড় বড় দেওদার, শাল তাদের ডালপালা দিয়ে আকাশ ঢেকে রেখেছে, ছায়া-ছায়া পথটায় ওঁরা হাঁটছিলেন। হাঁটতে হাঁটতে সরিৎশেখর বললেন, 'আজ যদি তুমি কলকাতায় থাকতে তা হলে কত কি দেখতে পেতে। কত উৎসব হচ্ছে সেখানে, আমরা তো এখানে কিছুই বুঝতে পারি না, আজ অবধি এই স্বর্গছেঁড়ায় একদিনও আন্দোলন হয় নি। এখানকার বাগানের কুলিকামিনরা স্বাধীনতা মানেই জানে না। বরং আজ যদি সাহেব চলে যায় ওরা কাঁদবে। কিন্তু কলকাতা হল এই দেশের প্রাণকেন্দ্র, আমাদের ফুসফুসের মত। কত আন্দোলন হয়েছে সেখানে, কত মানুষ মরেছে পুলিসের গুলিতে।'

'কেন, মরেছে কেন? পুলিস কেন গুলি করবে?' অনি বলল।

হাসলেন, সরিৎশেখর, 'তুমি যে জামাটা পরে আছ, কেউ যদি সেটা চায় তুমি দিয়ে দেবে?

'কেন দেব? আমার জামা আমি পরব।'

'কিন্তু ধর জামাটা একদিন তার ছিল, তুমি পেয়ে গেছ বলে পরছ, তা হলে? তুমি ভাবছ এখন এটা তোমার সম্পত্তি কিন্তু সে ওটা ফিরিয়ে নেবে বলে ঝামেলা করছে, ব্যাস, লেগে যাবে লড়াই।'

অনি বলল, 'জামাটা যদি আমার না হয় তাহলে আমি ফিরিয়ে দেব।'

মাথা নাড়লেন সরিৎশেখর, 'সেটাই উচিত, কিন্তু বড়রা এই কথাটা বোঝে না।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ হেঁটে যাওয়ার পর অনি বলল, 'আমাকে কলকাতায় নিয়ে যাবে দাদু?'

নাতির দিকে তাকালেন সরিৎশেখর,'কলকাতায় তুমি একদিন যাবেই দাদু। তবে যেদিন যাবে নিজে নিজে যাবে, কারোর সঙ্গে যেও না।'

অনি বলল, 'কেন?'

সরিৎশেখর বললেন, 'এখন তো তুমি ছোট, আরো বড় হও তখন বুঝবে। শুধু মনে রেখো, কলকাতায় যখন তুমি যাবে তখন যোগ্যতা নিয়ে যাবে। তোমাকে তার জন্য সাধনা করতে হবে, মন দিয়ে পড়াশুনা করতে হবে। অনেক বড় নেতা হবে তুমি—স্বাধীন দেশের মাথা উঁচু-করা নেতা।'

দাদুর কথাগুলো ঠিকঠিক বুঝতে পারছিল না অনি। তবে ভেতরে

ভেতরে অদ্ভুত একটা শিহরণ বোধ করছিল ও। আজ ভোরবেলায় ছুটে যেতে যেতে বন্দেমাতরম্ বলে চিৎকার করার সময় যে ধরনের গায়ে-কাঁটা-ওঠা কাঁপুনি এসেছিল ওর হঠাৎ সেই রকম হল। এই নির্জন রাস্তায় দাদুর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে অনি মনে মনে চিৎকার করে যেতে লাগল, 'বন্দেমাতরম্'।

কখন যেন ভোর হয়ে গেল, ঝকমকে রোদ উঠল কিন্তু স্বর্গছেড়া চাবাগানের ফ্যাক্টরীতে আজ ভোঁ বাজল না। কিন্তু একটি দুটি করে মদেসিয়া ওঁরাও মানুষের দল ঘর ছেড়ে বেরুতে লাগল। সরিৎশেখরের কোয়ার্টারের সামনে যে বিরাট মাঠটা চাঁপা গাছ বুকে নিয়ে রয়েছে তার এক কোণে এসে চুপচাপ বসে থাকল।

কখন যেন ভোর হয়ে গেল, সরিৎশেখর নিজেই টের পাননি। কদিন থেকেই রাতের বেলা এলে তাঁর ঘুম চলে যায়। একা একা এই ঘরে জানলা দিয়ে বাইরের অন্ধকারে চোখ রেখে তিনি অদ্ভুত সব ছবি দেখতে পান। খোলা চোখ কখন দৃষ্টিহীন হয়ে মনের মত করে কিছু চেহারা তৈরী করে দেখতে শুরু করে দেয়। যাবার সময় যত এগিয়ে আসছে তত এটা বাড়ছে, চোখ তত সাদা হয়ে থাকছে। চূড়ান্ত হয়ে গেল আজ রাতটায়। কাল সে খাওয়া-দাওয়া চুকে গেলে শুয়েছেন বিছানায়, এই রোদ-ওঠা সময় অবধি ঘুমই এল না।

কান্নাকাটির ধাত সরিৎশেখরের কোনকালেই ছিল না। বরং খুব কঠোর বা নিষ্ঠুর বলে একটা কুখ্যাতি ছিল ওঁর সম্বন্ধে। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে স্বর্গছেঁড়া ছেড়ে চলে যাবার সময় এরকম কেন হচ্ছে! সারাটা জীবন এখানে কাটিয়ে নতুন জায়গায় যাবার অস্বস্তিতে? নতুন জায়গায় যেতে তিনি নিজেই চেয়েছিলেন, কর্মহীন হয়ে এই স্বর্গছেঁড়ায় থাকতে কিছুতেই চান না তিনি। তাহলে?

কখন যেন ভোর হয়ে গেল, বাতাবীলেবু গাছটায় বসে একটা দাঁড়কাক কেমন করুণ গলায় ডাক শুরু করে দিল, জানলার তার গলে বিছানায় সকালে রোদ আলোছায়ার নকশা কাটা শুরু করে দিল, অনি টের পায়নি। কাল রাত্রে মায়ের কাছে শুয়ে অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখেছিল ও। আজ এই সকালে স্বপ্নটা যেন তাকে ছেড়ে যেতে চাইছে না। স্বপ্নটার কথা মনে

হতেই ও আর একবার বালিশে মুখ গুঁজে কেঁদে নিল। কাল রাতে মায়ের পাশে শুয়ে সেই মিষ্টি গন্ধটা পেতেই বুকটা কেমন করে উঠেছিল। আজ শেষ রাত, কাল থেকে আর মাকে এমন করে পাব না, এই বোধটা যত বাড়তে লাগল তত চোখ ভারী হয়ে উঠছিল।

শেষে ছেলের কান্না শুনে মাধুরী ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কি হল?'

অনি অনেকক্ষণ কোন জবাব দেয়নি। মাধুরী অনেক বুঝিয়েছিলেন। অনিকে অনেক বড় হতে হবে, লেখাপড়া শিখতে হবে। এখানে স্বর্গছেঁড়ায় তো ভাল স্কুল নেই। প্রত্যেক ছুটিতে অনি যখন এখানে আসবে তখন নতুন নতুন গল্প শুনবে মাধুরী ওর কাছে। অনি যখন বলল, 'তোমাকে ছেড়ে আমি কি করে থাকব মা', তখন মাধুরীর গলাটা একদম পালটে গেল, 'আমি তো সব সময় তোর সঙ্গে আছি রে বোকা।'

অনি হঠাৎ টের পেল ওর বুকের কান্নাটা মায়ের বুকের ভেতর চলে গেছে। আর একটু হলেই মা অনির মত কেঁদে ফেলবে। খুব শক্ত হয়ে গেল অনির শরীর। টানটান করে সিঁটিয়ে শুয়ে রইল। মাকে কষ্ট দিলে মহাপাপ হয়, পিসীমা বলেছে। তারপর সেইভাবে শুয়ে থেকে কখন যে ঘুম এসে গেল ও জানে না।

কে যেন তার হাত ধরে হাঁটতে লাগল, তার মুখ সে দেখতে পাচ্ছে না। ক্রমশ তার শরীর বড় হয়ে যেতে লাগল। সে দেখল অনেকেই তার মত হাঁটছে, অজস্র লোক। যে লোকটার সঙ্গে ও যাচ্ছিল সে বলল, আগে যেতে হবে, সবার আগে যেতে হবে। অনির মনে হল সবাই এক কথাই ভাবছে। অনি দৌড়তে লাগল। অনেকে পড়ে যাচ্ছে, আবার উঠছে। হঠাৎ অনি দেখল ওর সামনে কেউ নেই, পেছনে হাজার হাজার লোক। কে যেন ফিসফিসিয়ে বলল, 'গলা খুলে চেঁচাও।' ও দেখল ভবানী মাস্টার ওর পেছনে। অনি সমস্ত শরীর নেড়ে ডাক দিল, 'বন্দেমাতরম্'। কানের পর্দা ফেটে যাবার উপক্রম হল সেই ডাকের সাড়ায়। এইভাবে এগোতে এগোতে অনি থমকে দাঁড়াল। সামনেই একটা খাদ, তার তলা দেখা যাচ্ছে না। খাদের কাছে ঝুঁকে অনি বলল, ' বন্দেমাতরম্।' সঙ্গে সঙ্গে নিচ থেকে একটা গমগমে গলা বলে উঠল, 'মানে কি?' অনি মানেটা খুঁজতে গিয়ে শুনল নিচ থেকে কে যেন বলছে, 'বোকা ছেলে, আমাব কাছে আয়।' অনি

অবাক হয়ে দেখল অনেক নিচে মায়ের মুখ, ওর দিকে তাকিয়ে হাসছেন। অনির ঘুম ভেঙে গেল।

এখন এই সকালে ওর মনে পড়ে গেল ভবানী মাস্টার বলে দিয়েছিলেন বন্দেমাতরম্ শব্দের মানে কি। এখন এই মুহূর্তে দাদুর সঙ্গে শহরে যেতে ওর একদম ইচ্ছে করছে না। স্বর্গছেঁড়ার এই বাড়ি, মায়ের গায়ের গন্ধ, সামনের মাঠের চাঁপা গাছ আর পেছনের ঝিরঝিরে নদীটা ছেড়ে না গেলে যদি বড় না হওয়া যায় তাতে ওর বিন্দুমাত্র এসে যায় না।

তিন-তিনটে লরিতে মালপত্র বোঝাই হচ্ছে। পিসীমা সমস্ত বাড়ি ঘুরে এসে ঠাকুরঘরে ঢুকেছেন। মহীতোষ দাঁড়িয়ে থেকে দেখছেন, কুলিরা লরিতে মালপত্র ঠিকঠাক রাখছে কিনা। প্রিয়তোষ দাঁড়িয়ে ছিল বারান্দায়, তাকে লরির ওপর উঠে তদারকি করতে বলে মহীতোষ ঘরে এলেন। সরিৎশেখরের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গিয়েছিল আগেই, এখন যাবার জন্য জামাকাপড় পরে একদম প্রস্তুত। সকাল থেকে অনেকবার তাগাদা দিয়েছেন সবাইকে, বিকেল হয়ে গেলে তিস্তা পেরুতে জোড়া নৌকো পাওয়া যাবে না। সেই সাতসকালে খেয়েদেয়ে বসে আছেন। ঘরভর্তি এখন লোক। স্বর্গছেঁড়া চা-বাগানের বাবুরা তো আছেনই, আশেপাশের বয়স্ক টিম্বার-মার্চেন্টরাও এসেছেন। ঘরে ঢোকার আগে মহীতোষ দেখে এসেছেন সামনের মাঠটা মানুষের মাথায় ভরে গেছে। চা-বাগানের সমস্ত মদেসিয়া-মুন্ডা-ওঁরাও শ্রমিকরা একদৃষ্টে এই বাড়ির দিকে চেয়ে আছে। ফুটবল মাঠেও এত ভিড় হয় না।

সরিৎশেখর ছেলেকে দেখে বললেন, 'হয়ে গেছে সব?'

মহীতোষ বললেন, 'একটু বাকী আছে।'

সরিৎশেখর বললেন, 'কি যে কর তোমরা, বারোটা পঞ্চাশের পর যাওয়া যাবে না, বারবেলা পড়ে যাবে। তাড়াতাড়ি করতে বল সবাইকে।'

মহীতোষ ভেতরে এসে দেখলেন মাধুরী একটা ছোট স্যুটকেসে অনির জামাকাপড় ভরে সেটাকে দরজার পাশে রাখছেন। মহীতোষ বললেন, 'অনি কোথায়?'

মাধুরী বললেন, 'এই তো এখানেই ছিল। মোটেই যেতে চাইছে না।'

'যাবার জন্য লাফাচ্ছিল এতদিন, এখন যেতে চাইছে না বললে হবে!' মহীতোষ কেমন বিষণ্ন গলায় বললেন।

'দ্যাখো, যা ভাল বোঝ কর।' বলে মাধুরী ভেতরে চলে গেলেন।

মহীতোষ বাড়ির ভেতরে ছেলেকে পেলেন না। বাগানের দিকে উঁকি মেরে দেখলেন সেখানে কেউ নেই। যাবার সময় হয়ে গেল অথচ ছেলেটা গেল কোথায়। গোয়ালঘরের পেছনে এসে মহীতোষ থমকে দাঁড়ালেন। অনিকে দেখা যাচ্ছে। মাটিতে উবু হয়ে বসে আছে। ডাকতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত না ডেকে নিঃশব্দে পেছনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। এখান থেকে অনির মুখ দেখা যাচ্ছে না বটে কিন্তু ফোঁপানির শব্দটা শোনা যাচ্ছে। এইভাবে নির্জনে বসে ছেলেটাকে কাঁদতে দেখে মহীতোষ কেমন হয়ে গেলেন। সাধারণ ছেলেমেয়ের মত ও চটপটে নয়, কিন্তু ঐ বয়সের ছেলেদের চেয়ে ওর বুদ্ধিটা অনেক বড়, বেশী রকম বড়। কথা যখন বলে তখন ওর বয়সের ছেলের মত বলে না। সরিৎশেখর ওকে বেশী স্নেহ করেন, বোধ হয় পৃথিবীতে একমাত্র অনিই সরিৎশেখরের মন নরম করতে পারে। এখন ছেলেকে কাঁদতে দেখে মহীতোষের বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। এই একান্নবর্তী পরিবারে ছেলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আলাদা করে নয়। বলতে গেলে ঝাড়ির সঙ্গে যতটুকু কথা হয় অনির সঙ্গে সেইটুকুই হয়। অনি শহরে চলে যাবে বাবার সঙ্গে, লেখাপড়া শিখবে—এরকম কথা ছিল। কিন্তু এইমাত্র মহীতোষের মনে হল তাঁর ছেলে এখন থেকে তাঁর সঙ্গে থাকছে না।

দুহাত বাড়িয়ে অনিকে কোলে তুলে নিতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন মহীতোষ। উবু হয়ে বসে ফোঁপাতে ফোঁপাতে অনি মুঠোয় করে মাটি তুলছে। ওর সামনে একটা রুমাল পাতা। রুমালটার অনেকটা সেই মাটিতে ভর্তি। ব্যাপারটা কি, ও রুমালে মাটি রাখছে কেন! শেষ পর্যন্ত অনি যখন রুমাল বাঁধতে শুরু করল মহীতোষে নিঃশব্দে পিছু ফিরলেন। ছেলের এই গোপন সংগ্রহ দেখে ফেলেছেন—এটা ওকে বুঝতে দেওয়া কোনমতেই চলবে না। গোয়ালঘর পেরিয়ে এসে উঁকি মেরে দেখলেন অনি উঠে দাঁড়িয়েছে। এক হাতে চোখ মুচছে, অন্য হাতে রুমালের পুঁটুলিটা ধরা। আড়াল থেকে মহীতোষ হাঁক দিলেন, 'অনি, অনি!' ছেলের সাড়া না পেয়ে আবার ডাকলেন। এবার খুব আস্তে, ক্ষীণ গলায় অনি সাড়া দিতে মহীতোষ উঁচু গলায় বললেন, 'ওখানে কি করছ! দাদু যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন, তাড়াতাড়ি চলে এস।' কথাটা বলে আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন না মহীতোষ।

ঘর থেকে সবাই বারান্দায় নেমে দাঁড়িয়েছে। বাড়ির সামনে দাঁড়ানো লরিগুলোর গা ঘেঁষে মানুষের জটলা। মালপত্র বাঁধা শেষ, প্রিয়তোষ ঘরে ঢুকে সরিৎশেখরকে বলল, 'আর দেরি করবেন না, বেলা হল।'

কথাটা শোনার জন্যই বসেছিলেন সরিৎশেখর, তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে বললেন, 'চলি তাহলে।'

ডাক্তার ঘোষাল বললেন, 'একদম ভুলে যাবেন না আমাদের।'

সরিৎশেখর বললেন, 'সে কি! তোমাকে ভুলব কি করে হে, তুমি যে আমার—' কথাটা বলতে গিয়ে থমকে গেলেন উনি।

এখন এই পরিবেশে ওঁদের সেই চিরকেলে ঠাট্টাটা একদম মানায় না। সরিৎশেখর থেমে গেলেও ডাক্তার ঘোষাল বাকীটুকু মনে মনে জুড়ে নিলেন, 'বউটাকে মেরেছ!'

কথাটা তো নেহাৎ ইয়ার্কি করে বলা, সবাই জানে। ডাক্তার ঘোষালের হাত চট করে সরিৎশেখর জড়িয়ে ধরলেন, 'কিছু মনে করো না ডাক্তার।'

মাথা নাড়লেন।

এবার মহীতোষকে সরিৎশেখব বললেন, 'তোমার দিদি কোথায়?'

মহীতোষ বললেন, 'সবাই রেডি।'

সরিৎশেখর ডাকলেন, 'অনি!'

গম্ভীর গলার ডাকটা ভেতরে যেতেই অনিব বুকটা কেঁপে উঠল। ভিতরেব ঘরে খাটের ওপর মা এবং পিসীমার মধ্যে অনি বসে ছিল। বাগানের অন্য বাবুদের স্ত্রী ও মেয়েরা ভিড় করেছে সেখানে। পিসীমা চলে যাচ্ছে বলে সবাই দেখতে এসেছে। খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে বিশু, বাপী। ওদের দিকে তাকাচ্ছে না অনি। ওর চোখ জলে অন্ধ। দ্বিতীয়বার ডাকটা আসতে মাধুরী আঁচল দিয়ে ছেলেব চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললেন, 'যা।'

কাঁপতে কাঁপতে অনি বাইরের ঘবে এসে দাড়াতে সরিৎশেখব নাতিকে আপাদমস্তক দেখলেন, দেখে হাসলেন, 'কি হয়েছে তোমার?'

ডাক্তার ঘোষাল বললেন, 'বোধ হয় মন খারাপ।'

সরিৎশেখর কি ভাবলেন খানিক, 'তাহলে ও থাক।'

কথাটা শুনেই অনির সমস্ত শরীবে হইচই পড়ে গেল। দাদুব দিকে তাকাতে গিয়ে বাবার গলা শুনল ও, 'না, এখন যাওযাই ভাল। এখানে তো পড়াশুনা হবে না।'

মুহূর্তে বেলুনটা ফুটো হয়ে সব হাওয়া হুস করে বেরিয়ে গেল যেন। সরিৎশেখর ডাকলেন, 'হেম!'

অনি অবাক হয়ে দেখল পিসিমা ঠাকুরের মূর্তিটা পুঁটুলিতে নিয়ে দরজায় এসে দাঁড়ালেন। পিসিমাকে এখন অদ্ভুত দেখাচ্ছে। মাথায় ঘোমটা, গরদের কাপড়ের ওপর সাদা চাদর। মহীতোষও দিদিকে দেখছিলেন। দিদির ভাল নাম যে হেমলতা যেন খেয়ালই ছিল না। সরিৎশেখর অনেকদিন পর দিদির নাম ধরে ডাকলেন। এই স্বর্গছেঁড়ার সবার কাছে উনি দিদি বা বড়দি। হেম বলে ডাকার লোক খুব বেশী নেই।

সরিৎশেখর বললেন, 'হেম, এই ছেলেটিকে আমরা নিয়ে যাচ্ছি, আজ থেকে এর সব ভার তোমার ওপর, যদ্দিন ও কলেজে না ওঠে। মনে থাকবে তো!'

পিসীমাকে ঘোমটার মধ্যে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতে দেখল অনি, 'আপনি যা বলবেন।'

সরিৎশেখর এবার মাধুরীকে ডাকলেন। ঘরে আর কেউ কোন কথা বলছে না। মাধুরী এসে হেমলতার পাশে দাঁড়াতে সরিৎশেখর বললেন, 'বউমা, আমি চললাম। এখানে আর আমার পিছুটান নেই। তোমাকে আমি পছন্দ করে আমাদের সংসারে এনেছিলাম, এই সংসারের ভার তোমার ওপর দিয়ে যাচ্ছি। আর মা, তোমার পুত্রটিকে আমার হাতে দিতে তোমার আপত্তি নেই তো?' .

মাধুরী ঘাড় নাড়লেন। সরিৎশেখর বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি দেখো, এই কাঁচা সোনাকে কিভাবে পাকা সোনা করে ফিরিয়ে দিই।' কথাটা বলে অনিকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন সরিৎশেখর। অনি দেখল মা এক হাতে ঘোমটা ঠিক করতে গিয়ে শাড়ির পাড় চোখের তলায় চেপে রাখল।

হে সাহেব চেয়েছিলেন যে, সরিৎশেখর প্রাইভেট কার্‌এ শহরে যান। কিন্তু সরিৎশেখর রাজী হননি। লরির সামনে ড্রাইভারের পাশে তো অনেক জায়গা আছে, আলাদা করে গাড়ির দরকার নেই। মহীতোষ বারান্দায় এসে দেখলেন কুলি-সর্দাররা সব সামনে দাঁড়িয়ে, পেছনে অনেক অনেক মুখ।

মহীতোষের পেছনে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে সরিৎশেখর এসে দাঁড়াতেই একটা গুঞ্জন উঠল। সরিৎশেখর কিছুটা বিব্রত হয়ে সামনে তাকালেন। একজন সর্দার এগিয়ে এল, এসে সরিৎশেখরের মুখের দিকে তাকিয়ে

থেকে চিৎকার করে উঠল,'কাঁহা যাতিস রে মো সব ছোড়কে?'

সরিৎশেখর বললেন, 'কেন?'

লোকটা তেমনি চিৎকার করে বলল, 'কিনো? এখানে থাক, আমাদের বাবা হয়ে থাক, তোকে আমরা যেতে দেব না।' সঙ্গে সঙ্গে আর একজন সর্দার চিৎকার করে উঠলেন, 'বাবা যাবেক নাই।' আর সেই একটা গলার সঙ্গে সমস্ত মাঠ গলা মেলাল। সরিৎশেখর দেখলেন বকু সর্দার ওদের মধ্যে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আছে সেরাও। এদের প্রায় প্রত্যেককে কয়েকটা ছেলেছোকরা বাদে তিনি চেনেন। চিৎকার সমানে বাড়ছিল। মহীতোষ সরিৎশেখরকে বললেন, 'কি ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না, কি করবেন?'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'আমি দেখছি।' তারপর সামনে এগিয়ে তিনি হাত উঁচু করে সবাইকে থামতে বললে চিৎকারটা কমে এল। ডাক্তারবাবু বললেন, 'তোরা বাবাকে যেতে দিবি না বলছিস কিন্তু বাবার যে চাকরি নেই— তা জানিস না?'

একজন সর্দার বলল, 'এই চা-বাগান বাবা তৈরী করেছে, বাবা যতদিন জীবিত থাকবে তাকে চাকরি করতে দিতে হবে।' সঙ্গে সঙ্গে তার সমর্থনে আওয়াজ উঠল।

এবার সরিৎশেখর বারান্দা থেকে নেমে সর্দারদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে সবাই তাঁকে ঘিরে ধরল। সরিৎশেখর সামনের কালো কালো বিচলিত মুখগুলোর দিকে তাকালেন. 'আমাকে তোরা যেতে দে। সারাজীবন তো চাকরি করলাম, একটু বিশ্রাম চাই রে।'

একজন সর্দার বলল, 'আমাদের কে দেখবে? কার কাছে যাব?'

সরিৎশেখর বললেন, 'আরে বোকা, এখন তোরা স্বাধীন, এখন ভয় কি? তোদের চার-পাঁচজন মিলে একটা দল কর। সবাই সেই দলকে সুবিধে-অসুবিধে জানাবে। ঐ দলই সাহেবের সঙ্গে কথা বলে দাবি আদায় করবে, ব্যাস।'

সর্দাররা সবাই মুখ-চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। হঠাৎ বকু সর্দার এগিয়ে এসে সরিৎশেখরের পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কোন কথা নয়, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে সেটা সংক্রামক রোগের মত ছড়িয়ে পড়ল অন্য মুখগুলোতে। সরিৎশেখর এই সব সরল মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে শেষ

পর্যন্ত আবিষ্কার করলেন যে তাঁর নিজের চোখের আগল কখন খুলে গেছে, বয়স্ক শুকনো গালের চামড়ার ওপর ফোঁটা ফোঁটা জলবিন্দু পড়ায় অদ্ভুত শান্তি লাগছে। অথচ কোন শোক তাঁকে কাঁদাতে পারেনি এতদিন।

হয়তো কান্নার জন্যেই প্রতিরোধ নরম হয়ে সরে গেল। অনি দেখল পিসীমা মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন। ঝাড়িকাকু এবং প্রিয়তোষ লরির ওপর উঠল। মহীতোষ প্রথমে লরির সামনে ড্রাইভারের পাশে অনিকে তুলে দিলে হেমলতা তার পাশে উঠে বসলেন। সরিৎশেখর ঐ সব বোবা মুখের দিকে তাকিয়ে লরিতে উঠতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। ভিড় কাটিয়ে বিলাস ছুটে আসছে। সরিৎশেখরের হাতে একটা বিরাট মিষ্টির হাঁড়ি ধরিয়ে দিয়ে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল সে। সরিৎশেখর হাঁড়িটা অনির হাতে দিতেই একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়ে গেল। দুজন সর্দার ফিসফিস করে কি বলে মাথার পাগড়ী সরিৎশেখরের পায়ের সামনে টানটান করে ধরে থাকল। আর কয়েকশ' মানুষ এগিয়ে এসে এক আনা, দুই আনা, লাল পয়সা, ফুটো পয়সা ফেলতে লাগল তাতে। ডাক্তার ঘোষাল, মালবাবু মনোজ হালদাররা সব দাঁড়িয়ে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখছে। ক্রমশ কাপড়টার মাঝখানে পয়সা উঁচু হচ্ছিল।

সরিৎশেখর অদ্ভুত গলায় বললেন, 'ডাক্তার, তোমরা ফেয়ারওয়েলের কথা বলেছিলে না, পৃথিবীতে কেউ এর চেয়ে বড় ফেয়ারওয়েল পেয়েছে?'

মহীতোষ সঙ্গে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মাধুরী একা থাকবে বলে সরিৎশেখর নিষেধ করেছেন। সঙ্গে তো প্রিয়তোষ যাচ্ছেই, কোন অসুবিধে হবে না। তাছাড়া দুদিন আগে লোক পাঠিয়ে জলপাইগুড়ির বাড়ি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করিয়ে নিয়েছেন। ঘড়ি দেখলেন তিনি, আর একদম সময় নেই। ড্রাইভার উঠে বসল, তার পাশে অনি। অনির পাশে হেমলতা, তাঁর গায়ে দরজার ধারে সরিৎশেখর কোলে খুচরো পয়সার পুঁটলিটা নিয়ে বসে আছেন। ড্রাইভারকে স্টার্ট নেবার ইঙ্গিত করতে যেতেই সরিৎশেখর টের পেলেন গাড়িটা দুলছে। তারপর গাড়িটা একটু একটু করে চলতে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার উঠল, 'বাবা যায়— ধেউসি রে, আউড় থোড়া— ধেউসি রে।' ড্রাইভার অসহায়ের মত বসে রইল স্টিয়ারিং ধরে,

গাড়ি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে ওরা। দুজন সর্দার পাদানির ওপর লাফিয়ে উঠে অন্যান্যকে নির্দেশ দিতে লাগল ঠেলার জন্য। ক্রমশ মাঠ পেরিয়ে লরি আসাম রোডে পড়ল। পিছনের গাড়িটাকে কেউ ঠেলছে না, কিন্তু সেটাও স্পীড নিতে পারছে না এই লরির জন্য।

অনি দেখছিল সামনের কাঁচের ওপর একটা হনুমানের ছবি, এক হাতে পাহাড় বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, বুকে রাম সীতার ছবি। কাঁচের ওপাশে আকাশ। ভাল করে দেখার জন্য উঠে দাঁড়াতেই ওর নজ'রে পড়ল ওদের লরির সঙ্গে বাগানের কুলিরা হেঁটে যাচ্ছে রাস্তা জুড়ে। সামনের দিক থেকে আসা গাড়িগুলো রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে গেছে পর পর। সবাই হর্ন দিচ্ছে কিন্তু কেউ তাতে কান দিচ্ছে না।

হঠাৎ অনির নজরে পড়ল রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেই বিরাট বটগাছের তলায় মুখ উঁচু করে রেতিয়া দাঁড়িয়ে আছে। কাছাকাছি হতে অনি চিৎকার করে উঠল 'রেতিয়া!' সঙ্গে সঙ্গে সরিৎশেখর আর হেমলতা ওর দিকে অবাক হয়ে তাকালেন। কিন্তু অনির সেদিকে নজর নেই। ও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে রেতিয়ার অন্ধ চোখ দুটোর পাতা যেন কেঁপে উঠল। ঠোঁট দুটো গোল হয়ে যেন কিছু বলল। কি বলল সেটা সম্মিলিত চিৎকারে শোনা গেল না। ক্রমশ সামনের কাঁচের মধ্যে থেকে রেতিয়ার মুখ মুছে গেলে অনির বুকের মধ্যে অনেকক্ষণের জমা কান্নাটা ছিটকে বেরিয়ে এল। হেমলতা এক হাতে ঠাকুরের পুঁটুলি সামলে অন্য হাতে অনিকে বুকে টেনে নিলেন।

সরিৎশেখর ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠছিলেন। এভাবে লরি ঠেলে ওরা কদ্দূর যাবে? যেভাবে ওরা যাচ্ছে তাতে উৎসাহে ভাঁটা পড়ার কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। পাশের পাদানিতে দাঁড়ানো সর্দারকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কদ্দূর যাবি তোরা?'

খুব যেন উৎসাহ হচ্ছে এই রকম মেজাজে সে জবাব দিল, 'তোর ঘর তক্।'

বলে কি! জলপাইগুড়ি অবধি পায়ে হেঁটে ওরা হয়ত যেতে পারে কিন্তু তাতে তো মাঝরাত হয়ে যাবে। সরিৎশেখর ড্রাইভারকে স্টার্ট নিতে ইঙ্গিত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভট ভট করে ইঞ্জিনটা হুঙ্কার ছাড়ল। সরিৎশেখর দেখলেন শব্দ শুনে সামনের লোকজন লাফ দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল।

সেই সুযোগে ড্রাইভার স্পীড্ বাড়িয়ে দিল চটপট, মুহূর্তে জনতা চিৎকার করে উঠল, কিন্তু ততক্ষণে ওঁরা অনেক দূরে চলে এসেছেন। পিছনের গাড়িটাও বোধ হয় এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল, সরিৎশেখর দেখলেন সেটাও পিছন পিছন আসছে। ডুডুয়া নদীর পুলের কাছে এসে সরিৎশেখরের খেয়াল হল সর্দার দুজন এখনও পাদানিতে দাঁড়িয়ে আছে। আর আশ্চর্য, এই যে গাড়ি ছুটে যাচ্ছে ওদের নিয়ে— এতে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই যেন, হাসি হাসি মুখ করে ছুটন্ত গাড়ির হাওয়া মুখচোখে মাখছে দু'জন।

গাড়ি থামাতে বললেন সরিৎশেখর। তারপর নিচে নেমে সর্দার দুটোকে ডাকলেন। ওরা মাথা নিচু করে কাছে আসতে বললেন, 'এবার তোরা যা, আর এই টাকাগুলো রাখ। লাইনের লোকজনকে আজ রাত্রে আচ্ছাসে ভোজ দিবি।' পকেট থেকে কয়েকটা দশ টাকার নোট বের করে ওদের হাতে গুঁজে দিলেন তিনি। সর্দার দুটো চকচকে নতুন নোট হাতে নিয়ে কি করবে বুঝতে পারছিল না। সরিৎশেখর আর সুযোগ দিলেন না ওদের, গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

তাঁর সারাজীবনের স্মৃতি বুকে নিয়ে স্বর্গছেঁড়া ক্রমশ পেছনে চলে যেতে লাগল।

জলপাইগুড়ি শহর।

রহমৎ মিঞার হাতে বাড়ি তরতর করে উঠতে লাগল। ছাতি মাথায় সরিৎশেখর সারাদিন মিস্ত্রীদের পেছনে লেগে রইলেন। ট্রাকে করে ইঁট-বালি আসছে। ভারা বেঁধে মিস্ত্রীরা কাজ করছে। বাউণ্ডারির মধ্যে একচালা করে মজুররা সেখানে আস্তানা করে নিয়েছে। সন্ধ্যের সময় ইঁটের উনুন জ্বালিয়ে রুটি সেঁকতে সেঁকতে রামলীলা গায় ওরা তারস্বরে। অনি ঘুরে ঘুরে দেখে সারাদিন। সরিৎশেখর ঠিক করেছেন সামনের বছর ওকে জিলা স্কুলে ভর্তি করে দেবেন। যেহেতু এটা প্রায় বছরের শেষ, ভর্তি হওয়া চলবে না। ফলে অনির আর বই নিয়ে বসতে হয় না। ওদের বাড়ির কাছে বড় রাস্তা নেই। দাদুর সঙ্গে বাজারে যাবার সময় ও দেখতে পায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা লাইন করে জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে। জিলা স্কুলে ভর্তি হতে অনিকে যে আরো কয়েক মাস অপেক্ষা

করতে হবে! সরিৎশেখর ওকে খবরের কাগজ পড়া শেখাচ্ছেন। রোজ বিকেলে যখন কাগজওয়ালা কাগজ দিয়ে যায়, তখন প্রথম পাতা জুড়ে মহাত্মা গান্ধী আর জহরলাল নেহেরুর ছবি দেখতে পায় অনি।

পুরোন টিনের ছাদের বাড়ির একটা ঘরে সরিৎশেখরের বিরাট খাটটা পাতা আছে। দামী মেহগনি কাঠের খাট। খাটের গায়ে চীনে-লণ্ঠন রাখার একটা স্ট্যাণ্ড। অনি দাদুর সঙ্গে ঐ খাটে শোয়। সারাদিন মিস্ত্রীদের পিছনে খেটে সরিৎশেখর সন্ধ্যে পেরুলেই খাওয়া-দাওয়া সেরে অনিকে নিয়ে শুয়ে পড়েন। অন্ধকার ঘরে দাদুর নাক ডাকা শুনতে শুনতে অনির কিছুতেই ঘুম আসে না। রাত হয়ে গেলে মজুররা আর গান গায় না, শুধু একলা একটা ঢোলক তালে তালে বেজে যায়। সেই বাজনা শুনতে শুনতে অনির মায়ের কথা মনে পড়ে যায়। আর তখনি বুক কেমন করে ওর কান্না আসে। এখানে ওর একটাও বন্ধু নেই, সমবয়সী কোন ছেলের সঙ্গে ওর আলাপ নেই।

পাশের ঘরে শোন্ হেমলতা। ঘরের এক কোণে রান্নার জিনিসপত্র, অন্য কোণে ঠাকুরের আসন। এইভাবে থাকা ওঁর কোনদিন অভ্যেস নেই। প্রথম দিন ব্যবস্থা দেখে বলেছিলেন, 'ওমা, এইরকম ভাবে থাকব কি করে?'

সরিৎশেখর কোন জবাব দেননি। তবে বাড়ি তৈরী না হওয়া অবধি কষ্ট করতে হবেই— উপায় কি — এই রকম একটা ভঙ্গী তাঁর আচরণে ছিল। কিন্তু হেমলতা চমৎকার মানিয়ে নিলেন। এখানকার সংসার, তা যত কষ্টকর হোক তাঁর নিজের। চিরকাল ভাই ভাই-বউদের সঙ্গে থেকে এরকম একটা মজা তিনি পাননি কোনদিন। নিজের সংসার তো কোনকালে করা হল না, বাবা আর ভাইপোকে নিয়ে নতুন সংসারে অদ্ভুতভাবে মজে গেলেন হেমলতা।

খুব ভোরে সরিৎশেখর অনিকে ঘুম থেকে তোলেন। এই সময় প্রায়ই ভোরের দিকে বৃষ্টি হয়। সরিৎশেখর তা গ্রাহ্য করেন না। বৃষ্টি হলে গামবুট আর ছাতি নিয়ে দাদুর সঙ্গে অনিকে বেরুতে হয়। দাদুরও একই পোশাক। ঘুমে চোখের পাতা এঁটে থাকে, জল ছিটিয়ে চোখ ধুয়ে বেরুতে হয়।

বেরুবার সময় সরিৎশেখর হেমলতার ঘুম ভাঙিয়ে যান নইলে দরজা খোলা থাকবে যে। মাঠ পেরিয়ে নাতির হাত ধরে হনহন করে তিনি তিস্তার পারে চলে আসেন। বৃষ্টি না হলে অন্ধকার পাতলা সরের মত পৃথিবীময়

জুড়ে থাকে। টুপটাপ তারাগুলো নিভছে। কখনো সাদা হাড়ের মত চাঁদ আকাশের এক কোণে ঝুলে থাকে। সারারাত বিশ্রাম পেয়ে পৃথিবীর বুকের ভিতর থেকে উঠে আসা নিঃশ্বাসের মত একরাশ ঠাণ্ডা বাতাস নদীর জলে খেলা করতে করতে অনিদের ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যায় মণ্ডলঘাটের দিকে। নদীর বুকে অদ্ভুত এক অন্ধকার লুকোচুরি খেলা করে জলের সঙ্গে।

হাঁটতে শুরু করেন সরিৎশেখর কাঁচা রাস্তা ধরে। এক পাশে নদী, অন্য পাশে ঘুমন্ত শহর। দাদুর দ্রুত পদক্ষেপের সঙ্গে তাল রাখতে অনিকে হাঁপাতে হয়। চলার সময় কোন কথা বলেন না সরিৎশেখর। কিং সাহেবের ঘাট ছাড়াবার পর হঠাৎই পূর্বের আকাশটা রং বদলায়। অনি দেখেছে, যে মুহূর্তে ওরা কিং সাহেবের ঘাট পেরিয়ে পিলখানার রাস্তায় পা বাড়ায়, ঠিক তখনি অন্ধকার মাটি থেকে হুস করে উঠে গিয়ে গাছের মাথায় মাথায় জমে। আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চরাচর ঠাকুরঘরের মত পবিত্র হয়ে যায়। এমন কি মাটির ওপর ধুলোগুলো কেমন শান্ত হয়ে এলিয়ে থাকে শিশির মেখে।

অনি দ্যাখে নদীর গায়ে কোথাও অন্ধকার নেই। অদ্ভুত সারল্য নিয়ে জলেরা বয়ে যায়। দু-একটা তারা ডুবে যাবার আগে, যেন কেউ তাদের কথা দিয়ে নিয়ে যায়নি এইরকম আফসোস-মুখে চেয়ে থাকে তখনো। পূবের আকাশটায় হোলি খেলা শুরু হয়ে যায় হঠাৎ। তখনি দাদু দাঁড়িয়ে পড়েন সেদিকে হাত জোড় করে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় খোলা গলায় সূর্য প্রণাম— ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্। ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্। কবিতার সুরে সুরে অদ্ভুত এক মায়াময় জগৎ তৈরী হয়ে যায় তখন, প্রতিটি শব্দ যেন সামনের আকাশে অঞ্জলির মত রঙ হয়ে জড়িয়ে যায়। এক সময় দিগন্তরেখায় যেখানে তিস্তার বুকে অসম্ভব লালচে রঙের আকাশ মুখ ডুবিয়েছে সেখানটা কাঁপতে থাকে থর থর করে। সেই কাঁপুনি গায়ে মেখে টুক করে সূর্যটা উঠে পড়ে জল থেকে আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আকাশে একটা আলোড়ন শুরু হয়ে যায়।

এক সময় যখন সুন্দর সোনার টিপটা থেকে ঝলক ঝলক আগুন বেরোতে থাকে তখন সরিৎশেখর বাড়ির পথ ধরেন। অনির তখন মনটা কেমন করে ওঠে। যে কোন ভাল জিনিস দেখলেই মায়ের কথা মনে পড়ে যায়। এই মুহূর্তে ওর দাদুকে খুব ভাল লাগে— ঘুম ভাঙিয়ে তোলার জন্য

কোন আফসোস থাকে না।

বাড়ি ফিরে জল খেয়ে বাড়ির কাজে লেগে যান সরিৎশেখর। সারাদিনের প্রতিটি মুহূর্তে মিস্ত্রীদের চিৎকার আর বিভিন্ন রকমের শব্দে বাড়িটা ভরে থাকে। হেমলতা নিজের মনে সংসারের কাজ করে যান। এখানে এসে প্রথমে চাকরবাকর পাওয়া যায়নি। এখন চাকর রাখলেই যেন হেমলতার অসুবিধে হবে বেশী। কোন কাজ নিজের হাতে না করলে তাঁর স্বস্তি হয় না। বাবার খাওয়া-দাওয়ার দিকে তাঁর কড়া নজর। ঠিকসময়ে শরবৎ পাঠিয়ে দেন অনির হাত দিয়ে পাথরের গ্লাসে করে।

একদিন অন্তর সকালে বাজারে যান সরিৎশেখর। অনি তখন সঙ্গী হয়। দাদুর সঙ্গে যেতে যেতে রাস্তায় কত রকমের লোকের সঙ্গে দেখা হয়, তাদের বেশীর ভাগই দাদুকে নমস্কার করে কথা বলে, নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। অনি বুঝতে পারে ইংরেজরা চলে যাওয়ায় আমাদের অনেক দায়িত্ব বেড়ে গেছে। দাদুর বন্ধুদের কেউ বলেন, যারা ইংরেজদের চাকর ছিল সেই অফিসাররা কি করে দেশ শাসন করবে? আবার একজন বুড়ো বললেন, জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বাড়ছে, এর চেয়ে ইংরেজ-আমল বরং ভাল ছিল। লোকটা কথা বলার সময় চারপাশে চোরের মত তাকাচ্ছিল। অনির ওকে ভাল লাগছিল না। এ-সব কথাবার্তাব সবটা অনি বুঝতে পারছিল না। কিন্তু ওর মনে হতে লাগল ও বড় হচ্ছে, একটু একটু করে বড় হচ্ছে।

বাড়ির একদিকে চুড়ো করে বালি রাখা ছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর অনি একা একা সেখানটায় সুড়ঙ্গ তৈরির খেলা খেলত। অনেকটা দূর ওপরের বালি না ভেঙে গর্ত করে চুপচাপ ভেতরে ঢুকে বসে থাকা যায়। এদিকটায় নতুন তৈরী বাড়ির ছায়া পড়ে থাকায় বেশ ঠাণ্ডা। দরজা-জানালার ফ্রেম বসে গেছে। কয়েকদিন আগেই ঢালাই শেষ হয়ে গিয়েছে। ছাদ পেটানোর কাজ চলছে। রহমৎ মিঞা কম পয়সায় বেশী কাজ পাওয়া যায় বলে একগাদা কামিন নিয়ে এসেছে। তারা সকালে দল বেঁধে আসে, সন্ধ্যের সময় দল বেঁধে চলে যায়। সরিৎশেখর মজুরদের দিয়ে বাড়ির ভিতরের খোলা জায়গায় অজস্র গাছপালা লাগিয়ে নিয়েছেন। তারা শিকড়ে জোর পেয়ে গেছে। অনি ভালবাসে বলে তিনটে পেয়ারা এবং বাউণ্ডারীর ধার ঘেঁষে সার দিয়ে কলাগাছ লাগানো হয়েছে। বাড়ি শেষ হয়ে গেলে

হেমলতার চাপে সরিৎশেখর ঘটা করে গৃহপ্রবেশের ব্যবস্থা করলেন। ঝকঝকে তকতকে বাড়ির দিকে তাকালে তাঁর চোখ জুড়িয়ে যায়। নতুন রঙ আর সিমেন্টের গন্ধ নাক ভরে নেন তিনি।

শহরে সরিৎশেখরের দেশের গাঁয়ের একজন আছেন যাঁকে তিনি বন্ধুর মত বিশ্বাস করেন। সাধুচরণ হালদার। সেই সাধুচরণের সঙ্গে এখানকার কালীবাড়ির পুরোহিতের খুব ভাব আছে। তিনি সরিৎশেখরকে কোলকাতার কাছে হালিশহরে এক তান্ত্রিকের খবর দিলেন, যিনি নাকি সিদ্ধপুরুষ। অনেক চেষ্টাচরিত্র করে তাঁকে আনানোর ব্যবস্থা হল। স্বর্গছেঁড়া থেকে সবাই এসে হাজির। এখানে আসার পর অনি একদিনও স্বর্গছেঁড়ায় যায়নি। সরিৎশেখর পাঠাতে চেয়েছিলেন কিন্তু মহীতোষ জানিয়েছিলেন এত ঘন ঘন এলে শহরে মন বসবে না। মাধুরী আসার পর হেমলতা বললেন, 'দ্যাখ, তোর ছেলে কত রোগা হয়ে গেছে।'

মাধুরী ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, 'রোগা কোথায়, ও দেখছি বেশ লম্বা হয়েছে।'

হেমলতা বললেন, 'হবে না কেন? এ বংশের ধারাই তো লম্বাটে।'

এক সময় একটু একলা পেয়ে মাধুরী ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁ রে, আমার জন্যে তোর মন-কেমন করে না?' আর সঙ্গে সঙ্গে অনি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল।

সেই কান্না শুনে বাড়ির সবাই ছুটে এসে দেখল অনি মাধুরীকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। মাধুরী ছেলেকে যত থামাতে চান কান্না তত বেড়ে যেতে লাগল। শেষ পর্যন্ত হেমলতা বললেন, 'না ভাই, এতদিন পর দেখা হল আর তুমি ওকে বকাবকি করছ— এটা উচিত হয়নি।'

এমন কি সরিৎশেখর অবধি যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে বললেন, 'না, বৌমা, তুমি বড্ড ছেলেকে শাসন করো।' মাধুরী লজ্জায় মরে যান। ছেলে যে এভাবে কেঁদে উঠবে বুঝতে পারেননি তিনি।

তোড়জোর চলতে লাগল গৃহপ্রবেশের। কাল মঙ্গলবার, সব মিলিয়ে দিন ভাল। আত্মীয়স্বজন তো আছেনই, সরিৎশেখর শহরের সমস্ত বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেছেন। কিন্তু আজ সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা, টিপটিপিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। কে যেন এসে বলে গেল তিস্তার জল বেড়েছে। ভোরে বেড়াতে যাবার সময় সরিৎশেখর তেমন কিছু লক্ষ্য করেননি। উঠোনে

ভিয়েন বসেছে। কাল দুপুরে খাওয়া-দাওয়া হলেও আজ থেকে মেয়েদের রান্নাঘরে যেতে হচ্ছে না।

সন্ধ্যের ট্রেনে হালিশহরের সিদ্ধপুরুষ একজন শিষ্যসমেত এসে গেলেন। সরিৎশেখর মহীতোষকে নিয়ে স্টেশনে গিয়েছিলেন তাঁকে আনতে। কিন্তু তিনি সোজা গিয়ে কালীবাড়িতে উঠলেন। ঠিক হল পরদিন ভোরে পুরোহিতমশাই-এর সঙ্গে উনি চলে আসবেন। খাওয়া দাওয়া সারতে রাত হয়ে গেল। ঠিক হল টিনের চালায় মেয়েরা বাচ্চাদের নিয়ে শোবেন। যেহেতু গৃহপ্রবেশ এখনো হয়নি তাই ঘরে নয়, নতুন বাড়ির ঢাকা বারান্দায় শতরঞ্চি বিছিয়ে ছেলেদের শোওয়ার ব্যবস্থা হল। শোওয়ার আগে ক্যাম্প খাট পেতে সরিৎশেখর একবার অনির খোঁজ করতে হেমলতা বললেন, 'ও মায়ের সঙ্গে শোবে।'

বড় ঘর থেকে খাটটা সরানো গেল না। তাই মেয়েরা মাটিতে ঢালাও বিছানা পেতে শুলেন। খাটের ওপর মাধুরী আর অনি। মাধুরী নীচেই শুতে চেয়েছিলেন, হেমলতা বকাবকি করাতে রাজী হতে হল।

মায়ের কাছে এতদিন বাদে শুয়ে অনির কিছুতেই ঘুম আসছিল না। মায়ের গায়ের গন্ধ মায়ের নরম হাত ওকে কেমন আবিষ্ট করে রেখেছিল। মাধুরী এক সময় চাপা গলায় বললেন, 'তুই সকালে অমন বোকার মত কাঁদলি কেন? সবাই আমাকে বকলো।'

অন্ধকার ঘরে মায়ের বুকের কাছে মুখ রেখে অনি বলল, 'তুমি আমাকে বললে কেন? তুমি জান না বুঝি!' মাধুরী ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

সিদ্ধপুরুষ তান্ত্রিকের নাম শনিবাবা। বিশাল তাঁর চেহারা, যেমন ভুঁড়ি তেমনি লম্বা। লাল কাপড় পরে খড়ম পায়ে রিকশা থেকে যখন নামলেন তখন অনির ভয়ে চোখ বন্ধ হবার যোগাড়। পিসীমা আগে গল্প করেছিলেন, তান্ত্রিকেরা নাকি ইচ্ছে করলে যা খুশি করতে পারে। শনিবাবাকে দেখলেই বুক হিম হয়ে যায়, সামনে যাবে কি!

পূজোয় বসার আগে শনিবাবা একবার নতুন বাড়ির চারপাশে পাক দিয়ে এলেন। যে ঘরটা ঠাকুরঘর হবে বলে হেমলতা ঠিক করেছিলেন সেখানেই পুজোর আসন পাতা হয়েছে। আসনে বসে অনেকক্ষণ ধ্যানস্থ হয়ে

থাকলেন শনিবাবা। ওঁর সামনে কোন মূর্তি নেই। শুধু চারটে মোটা চন্দনকাঠের টুকরো ছড়ানো বালির ওপর সাজানো রয়েছে। শনিবাবার অনেকটা পিছনে ঘরের মধ্যে সরিৎশেখর হাঁটু গেড়ে বসে, তাঁর পেছনে পুরোহিতমশাই, মহীতোষ এবং সাধুচরণ বসে আছেন। প্রিয়তোষ রান্নাবান্নার দিকটা তদারক করছে। মেয়েরা ভিড় করে দরজায় দাঁড়িয়ে ভেতরে ঢুকতে সাহস পাচ্ছে না কেউ।

ওঁদের আড়ালে দাঁড়িয়ে সামান্য ফাঁক দিয়ে অনি শনিবাবার পিঠটা দেখতে পাচ্ছে। হেমলতা মাধুরীকে বলছেন অনিকে যেন শনিবাবার সামনে খুব একটা যেতে না দেওয়া হয়। কারণ তান্ত্রিক-মানুষকে বিশ্বাস নেই, ছোট ছেলেমেয়েদের প্রতি ওদের নাকি আগ্রহ থাকে। শোনার পর থেকে মাধুরী ছেলেকে আগলে আগলে রাখছেন।

হঠাৎ শনিবাবা টানটান হয়ে বসলেন। তারপর চোখ খুলে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। ঘরের সবাই অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকাতেই বাজখাঁই গলায় তিনি ডাকলেন, 'সরিৎশেখর!' সরিৎশেখর চমকে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

শনিবাবা বললেন, 'এত অমঙ্গলের ছায়া কেন? এত শত্রু কেন তোমার?'

উত্তরে সরিৎশেখর কোন রকমে বললেন, 'সে কি!'

শনিবাবা বললেন, 'এর মধ্যেই ওরা কাজ সুরু করে দিয়েছে। এভাবে চললে খুব শীঘ্র তোমার অঙ্গহানি হবে। আমি বাড়িতে ঢুকতেই অনুভব করেছিলাম কেউ একজন খুশী হল না।'

সরিৎশেখর হাত জোড় করে বললেন, 'আমি তো জেনেশুনে কোন অন্যায় করিনি, বাবা—আপনি দেখুন।'

শনিবাবা বললেন, 'এই বাড়ি বাঁধতে হবে। তোমরা একটা কুলোয় চারটে প্রদীপ, চার পাত্র দুধ, চারটে ফল আর চারটে জবাফুল তুলসীপাতার ব্যবস্থা কর এক্ষুনি!' কথা শেষ হওয়া মাত্র সরিৎশেখর দরজায় দাঁড়ানো মেয়েদের দিকে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে মেয়েরা ছুটলো জিনিসগুলোর ব্যবস্থা করতে। মোটামুটি সবই পুজোর ব্যাপারে আনা ছিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে সরিৎশেখর কুলোটাকে শনিবাবার সামনে ধরলেন। সেদিকে একবার চোখ বুলিয়ে শনিবাবা মাটিতে রাখা তাঁর লাল ঝুলিটা থেকে একটা কাঠের বাক্স বের করলেন। কাঠের বাক্সের ডালাটা সন্তর্পণে

খুলতে সরিৎশেখর দেখতে পেলেন তার মধ্যে দু'ইঞ্চিটাক লম্বা চারটে ফণাতোলা গোখরো সাপ রয়েছে। কুচকুচে কালো ইস্পাতের তৈরী সাপগুলোর ফণার ডগা খুব ছুঁচলো। চট করে জ্যান্ত বলে ভুল হয়। শনিবাবা সেগুলোকে বের করে কুলোর উপর রাখলেন। তারপর বললেন, 'এঁরা তোমার বাড়ি রক্ষা করবে। এই কুলোটাকে মাথার ওপর নিয়ে তুমি বাইরে চল। এদের প্রতিষ্ঠা করতে হবে।'

সম্মোহিতের মত সরিৎশেখর কুলো মাথায় তুলে নিলেন। মেয়েরা সঙ্গে সঙ্গে দরজা ছেড়ে দিল। মাধুরী ছেলেকে আড়াল করে সরে দাঁড়ালেন। প্রথমে শনিবাবা, তাঁর পেছনে কুলো মাথায় সরিৎশেখর, পুরোহিত মশাই, মহীতোষ, সাধুচরণ লাইন দিয়ে ঘর থেকে বেরুলেন। যেতে যেতে শনিবাবা বললেন, 'একটা কোদাল আনতে বল কাউকে।' কথাটা শুনে দূরে দাঁড়ানো প্রিয়তোষ একছুটে কোদাল নিয়ে এল।

শনিবাবা প্রথমে গেলেন বাড়িটার পূর্ব-দক্ষিণ কোণে। তারপর কি ভেবে বাগান পেরিয়ে একদম বাউণ্ডারীর কোণায় চলে এসে ইঙ্গিতে প্রিয়তোষকে মাটি খুঁড়তে বললেন। প্রিয়তোষ যখন অনেকটা গর্ত করে ফেলেছে তখন তিনি গম্ভীর গলায় 'মা' 'মা' বলে ডেকে উঠে সরিৎশেখরের কুলো থেকে প্রথমে একটা সাপকে সযত্নে গর্তের ভেতর বসিয়ে দিলেন। তারপর নৈবেদ্যের মত প্রদীপ, ফল, ফুল একটা করে তার সামনে সাজিয়ে নিজের হাতে মাটি চাপা দিতে লাগলেন। মাটি সমান হয়ে গেলে বললেন, 'সাত দিন যেন কেউ এখানে পা না দেয়। যে দেবে তার মৃত্যু অনিবার্য।'

একে একে বাড়ির আর তিনটে কোণে সাপ প্রতিষ্ঠা কয় হয়ে গেলে হঠাৎ হাওয়া উঠল বেশ। গাছের ডালপালাগুলো শব্দ করে দুলতে লাগল। শনিবাবা একবার আকাশের দিকে মুখ করে কিছু দেখলেন, তারপর সরিৎশেখরের দিকে তাকিয়ে বললেন,'বেঁচে গেলি।'

পুজো শুরু হতে নিমন্ত্রিতদের আসা শুরু হয়ে গেল। সরিৎশেখরের নির্দেশ পুজো শেষ না হলে খাওয়া-দাওয়া হবে না। বৃষ্টি আসতে পারে যে কোন মুহূর্তে তাই ঢাকা লম্বা বারান্দায় খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। পুজো করতে করতে শনিবাবা অদ্ভুত রহস্যময় হয়ে উঠেছেন। মাঝে মাঝে অদৃশ্য কাউকে ধমক দিচ্ছেন, হাসছেন, আবার ছেলেমানুষের মত অভিমান করছেন। শেষে চন্দনকাঠে আগুন জ্বালালেন তিনি। পুড়ছে কাঠ, অদ্ভুত

সুগন্ধযুক্ত ধোঁয়া বেরুচ্ছে তা থেকে। হঠাৎ ঝুলি থেকে কিছু একটা বের করে তাতে ছুঁড়লেন শনিবাবা। সঙ্গে সঙ্গে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল।

শনিবাবা সরিৎশেখরকে বললেন, 'এবার অগ্নি আমায় আকর্ষণ করবে। তোমরা আমাকে ধরে রাখবে।'

কথাটা বলে শনিবাবা উঠে দাঁড়িয়ে সেই বস্তুটি আরো ঐ আগুনে ছড়িয়ে দিয়ে 'মা' 'মা' বলে ডাকতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে আগুনের শিখা বাড়তে লাগল। ক্রমশ তা বিশাল আকার ধারণ করে শনিবাবার মাথা ছাড়িয়ে উঠে গেল। আর তখনি শনিবাবার সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপতে লাগল। খুব আলতো করে সরিৎশেখর শনিবাবাকে স্পর্শ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন, হঠাৎ মনে হল শনিবাবাকে কে যেন সামনের দিকে টানছে প্রচণ্ড জোরে। এক সময় তিনি নিজে যেন আর শনিবাবাকে ধরে রাখতে পারবেন না বলে মনে হল। ওঁর অবস্থা দেখে পুরোহিত মশাই উঠে এসে হাত লাগালেন।

শনিবাবা তখন অনর্গল সংস্কৃত শব্দ সহযোগে মাকে ডেকে যাচ্ছেন। ওঁর শরীরের উত্তাপে যেন সরিৎশেখরের হাত পুড়ে যেতে লাগল। শেষ পর্যন্ত কেউ যেন পলতে কমানোর মত আগুনটাকে কমিয়ে দিতে শনিবাবার কাঁপুনিটা থেমে গেল। শনিবাবার কাঁপুনিটা যে ইচ্ছাকৃত নয় এটুকু বুঝতে পারছিলেন সরিৎশেখর। কোন মানুষকে ধরে রাখলে সেটা বোঝা যায়।

শনিবাবা এখানে রাত্রিবাস করবেন না। সন্ধ্যের ট্রেনেই ফিরে যাবেন। বাইরে মহীতোষ পরিতোষ খাওয়া-দাওয়ার তদারকি করছে। সাধুচরণকে অন্যান্য বয়স্ক লোকের সঙ্গে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। শনিবাবা শুধু এক গ্লাস দুধ আর একটা মিষ্টি খেয়ে ঠাকুরঘরের মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর শিষ্যটি পায়ের কাছে বসে পদসেবা করছে। পুরোহিত মশাই একটা হাতপাখা নিয়ে বাতাস করছেন তাঁকে। পাশে বসে সরিৎশেখর খুব নম্র গলায় আবার প্রশ্নটি তুললেন, অঙ্গহানি বলতে কি বোঝাচ্ছেন শনিবাবা। শনিবাবা হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে তাঁর দিকে বিশাল লাল চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। সে দৃষ্টির সামনে সরিৎশেখরের খুব অস্বস্তি হতে লাগল। হঠাৎ শনিবাবা বললেন, 'এই পৃথিবীতে তোমার সবচেয়ে প্রিয়জন কে সরিৎশেখর?'

খুব ধীরে নিজের অজ্ঞাতেই সরিৎশেখর বললেন, 'প্রিয়জন!'

'হ্যাঁ! যাকে তুমি নিজের পরেই ভালবাস!'

'আমার—।' সরিৎশেখর কথাটা শেষ করতে পারলেন না।

'তাকে আমার সামনে নিয়ে এস।'

সরিৎশেখর বাইরে এলেন। হই হই করে খাওয়া-দাওয়া চলছে। প্রিয়তোষ খাবারের ঝুড়ি নিয়ে দৌড়ে গেল। মহীতোষ পরিবেশন তদারকি করছে। মেয়েদের দিকে হেমলতা আর মাধুরী ঘোরাঘুরি করছে। ছেলে-মেয়ে বউমার মুখের দিকে তাকালেন তিনি—এরা সবাই তাঁর প্রিয়জন। হঠাৎ দেখলেন পেয়ারা গাছটার তলায় অনি একা দাঁড়িয়ে, ডালের গাছের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। ধীরপায়ে নেমে এলেন তিনি। দাদুকে দেখে অনি হাসল। নাতির কাঁধে হাত রাখলেন সরিৎশেখর, 'কি করছ দাদু?'

'একটা নীলরঙের পাখি এই মাত্তর উড়ে গেল!' অনির মুখ উজ্জ্বল।

'খেয়েছ?'

'হ্যাঁ?'

'আমার সঙ্গে এস। বাবা তোমাকে ডাকছেন।' সরিৎশেখর নাতিকে নিয়ে ঘরমুখো হলেন। কথাটা শুনেই অনি আড়ষ্ট হয়ে গেল। হেমলতার কথা সে শুনেছে। শনিবাবার কাছে নিয়ে যাচ্ছে দাদু অথচ পিসীমা বারণ করেছেন। শনিবাবাকে দেখলেই তার ভয় লাগে। বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল তার। সরিৎশেখর নাতির অবস্থাটা বুঝতে পেরে বললেন, 'ভয় কি। উনিও তো মানুষ, তোমার কোন ক্ষতি করবেন না। আর আমি তো আছি।'

দাদুর শরীরের সঙ্গে লেপ্টে অনি হাঁটতে লাগল। দৃশ্যটা প্রথমে মাধুরীর নজরে পড়ল। তিনি কয়েক পা এগিয়ে হেমলতাকে বললেন। ওঁরা সবাই অবাক হয়ে দেখলেন অনিকে নিয়ে পুজোর ঘরে ঢুকে সরিৎশেখর দরজা ভেজিয়ে দিলেন ভেতর থেকে।

কাঁচের জানালা ভেতর থেকে বন্ধ, দরজা ভেজানো, ফলে ঘরটার আলো কম, কেমন অস্পষ্ট লাগল অনির। কিন্তু শনিবাবাকে ও স্পষ্ট দেখতে পেল। চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। বিশাল ভুঁড়ি নিঃশ্বাসের তালে তালে দুলছে। গলার রুদ্রাক্ষের মালা একপাশে নেতিয়ে পড়েছে। ওর সেই শিষ্য পা টিপে যাচ্ছে, পুরোহিত মশাই পাখা হাতে মাথার কাছে বসে ওদের

দিকে তাকালেন। অনি দেখল শনিবাবার চোখ বোঁজা। ওরা যে ঘরে ঢুকল যেন টেরই পেলেন না।

সরিৎশেখর নাতিকে পাশে নিয়ে মাটিতে বসলেন। অনি অবাক হয়ে দেখল দাদুর মুখটা কেমন পাল্টে যাচ্ছে। ঝাড়িকাকু যখন কোন অন্যায় করে দাদুর সামনে দাঁড়াতো তখন এ রকম মুখ করত। শনিবাবার শরীর থেকে মাত্র হাত তিনেক দূরে বসে ওর ভয়-ভয় ভাবটা হঠাৎ চলে গেল। বরং শনিবাবার শরীরের ওঠা-নামা দেখতে দেখতে ওর বেশ মজা লাগছিল এখন। সরিৎশেখর বললেন, 'ওকে, এনেছি!'

শনিবাবা চোখ খুললেন, 'এনেছ! তোমার প্রিয়জন তাহলে এই! কে হয় তোমার?'

সরিৎশেখর বললেন, 'আমার নাতি।'

শনিবাবা বললেন, 'আর নাতি আছে?'

সরিৎশেখর উত্তর দিলেন, 'না।'

শুয়ে শুয়ে শনিবাবা হাত নেড়ে অনিকে ডাকলেন, 'এদিকে এস।'

ডাকের মধ্যে এমন একটা সহজ ভাব ছিল যে অনির একটুও ভয় লাগল না। ও স্বচ্ছন্দে উঠে এসে কাছে দাঁড়াতেই পিছন থেকে দাদু ওকে প্রণাম করতে বললেন। হাত নেড়ে নিষেধ করলেন শনিবাবা, 'না, তুমি আমার সামনে বস। কেউ শুয়ে থাকলে কক্ষনো তাকে প্রণাম করবে না। নাম কি?'

বসতে বসতে অনি উত্তর দিল, 'অনিমেষ।'

এক গাল হাসলেন শনিবাবা, 'বীর, মানুষ আমরা নহি তো মেষ। অনিমেষ মানে জান?'

ঘাড় নাড়ল অনি, 'স্থির, শান্ত।'

শনিবাবা বললেন, 'যার নিমেষ নেই, দেবতা। আবার মাছকেও অনিমেষ বলা হয়, জান? তোমার বয়স কত?'

পেছন থেকে সরিৎশেখর বললেন, 'সাত।'

শনিবাবা বললেন, 'আমার দিকে তাকাও।'

অনি শনিবাবার মুখের দিকে তাকাতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। অনি হঠাৎ টের পেল ওর শরীর কেমন হয়ে যাচ্ছে, ও যেন নড়তে-চড়তে পারছে না অথচ সব কিছু বুঝতে দেখতে পারছে। শনিবাবার চোখের মধ্যে ওগুলো কি? নিজের চোখ বন্ধ করতে গিয়েও পারল না অনি।

শনিবাবা বললেন, 'সরিৎশেখর, তোমার এই নাতি বংশছাড়া, যৌবন এলে একে আর তোমাদের মধ্যে পাবে না। এর জন্যে মায়া আর বাড়িও না। এই ছেলে যতটা নরম হৃদয়ের ততটাই নির্দয়। তবে হ্যাঁ, এ যদি তোমার সব চেয়ে প্রিয়জন হয় তবে তোমার আর অঙ্গহানির সম্ভাবনা নেই। জন্ম থেকে এ প্রতিরোধ শক্তি নিয়ে এসেছে।'

সরিৎশেখর ফিসফিস করে বললেন, 'ভবিষ্যৎ?'

'কেউ বলতে পারে না সরিৎশেখর, কারণ সেটা প্রতিমুহূর্তের আবর্তনে পাল্টে যেতে পারে। অতীত স্থির থাকে চিরকাল তাই সেটা বলা যায়। তবে মনে হয়, ও বিদ্বান হবে কিন্তু আঠারো বছর বয়সে রাজনৈতিক কারণে ওকে জেলে যেতে হতে পারে। যদি তাই যায় তাহলে আমি আর কিছু বলতে পারব না। কিন্তু একটা জিনিস বলছি, সরিৎশেখর, একে তুমি কোন কাজে বাধা দিও না কখনো।' কথাগুলো একটানা বলে চোখ বন্ধ করলেন শনিবাবা। তারপর স্থির হয়ে গেলেন। পুরোহিত মশাইয়ের ইঙ্গিতে সরিৎশেখর উঠে এসে অনিকে বাইরে নিয়ে এলেন। অনির মনে হল, অনেকক্ষণ বাদে একটা অন্ধকার ঘর থেকে সে আলোয় এল।

কাজকর্ম সারতে বিকেল হয়ে এল। সকাল থেকে টুপটাপ হালকা চালে যে বৃষ্টিটা খেলা করে যাচ্ছিল, দুপুরের পর সেটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ব্যাণ্ডেজ জড়ানোর মত আকাশটা মেঘে ঢাকা রইল। এখনও এখানে শীত পড়েনি। মাত্র ত্রিশ মাইলের ফারাকে স্বর্গছেঁড়া আর জলপাইগুড়ির মধ্যে প্রকৃতিদেবী দু রকম চেহারা নিয়ে বিরাজ করেন। ভোরের দিকে একটু হিমহিম হয়। কাল রাত্রে মেঝেতে যারা বিছানা করে শুয়েছিল শেষরাত্রে তারা তাই তড়িঘড়ি উঠে পড়েছে। এবার পূজা কার্তিকের কিছুটা পেরিয়ে। মনে হচ্ছে কালীপুজোর অনেক আগেই শীত পড়ে যাবে। কাল রাত্রে আকাশে মেঘ ছিল, আজ হিমেল হাওয়া দিচ্ছে। মাধুরী অনিকে সোয়েটার পরিয়ে দিয়েছেন। আকাশ দেখে কে বলবে এটা শরৎকাল, কদিন বাদেই পুজো!

শনিবাবা বিকেলের ট্রেনে শিষ্য সমেত ফিরে গেলেন। জলো হাওয়া লাগলে টনসিল ফুলবে বলে অনিমেষকে স্টেশনে নিয়ে যাননি সরিৎশেখর। ওঁরা ফিরতে ফিরতে মেঘে মেঘে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে গেল। অনি

আজ সারাদিন মায়ের কাছাকাছি। শনিবাবা ওর সম্বন্ধে যা ভবিষ্যৎ-বাণী করেছেন তা এখন সবাই জেনে ফেলেছে। মাধুরী চাপা গলায় বলেছিলেন, 'ঐটুকুনি ছেলের সামনে এসব কথা কেন যে ওঁরা বললেন!'

হেমলতা বলেছিলেন, 'ভীমরতি গো, ভীমরতি। নাতি নাতি করে বাবা হেদিয়ে গেলেন। তুমি জান না এই কটা মাস আমাকে সব সময় পিটপিট করেছেন যেন অনির কোন্ কষ্ট না হয়! তুমি হাসছ যে!'

মাধুরী বলেছিলেন, 'আপনার ভাই বলে, আপনিই নাকি ওকে বেশী প্রশ্রয় দেন।'

হেমলতা কিছু বললেন না প্রথমটা, তারপর আস্তে আস্তে বলেছিলেন, 'কিন্তু জেলে যাবার কথাটা শুনে অবধি ভাল লাগছে না আমার। হ্যাঁগো, লোকটা সত্যিই সিদ্ধপুরুষ নাকি?'

কথাটা এক ফাঁকে মহীতোষকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন মাধুরী। সিগারেট খেতে ছাদে গিয়েছিলেন মহীতোষ। এখনও ছাদের অনেক কাজ বাকী। চিলে কোঠার ঘরে প্লাস্টার হয়নি। ইঁটগুলো সিমেন্টের ভাঁজ গায়ে জড়িয়ে রয়েছে। ছাদ থেকে তিস্তা নদীর দিকে চোখ পড়তেই অবাক হয়ে গেলেন মহীতোষ। এত জল বেড়েছে যে ওপার দেখা যাচ্ছে না। জলের রঙ এই এত দূর থেকে কেমন কালচে কালচে লাগছে। এমন সময় অনিকে নিয়ে মাধুরী ছাদে এলেন। ন্যাড়া ছাদে ছেলেকে একা ছাড়তে চাননি মাধুরী। এসে স্বামীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আর তখনি অনির কথাটা, জেলে যাবার কথাটা বললেন তিনি। মহীতোষ কথাটা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন, 'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, এসব কেউ বিশ্বাস করে! শনিবাবা বোধ হয় ভুলে গিয়েছেন যে, দেশ স্বাধীন হয়ে গিয়েছে। এখন আর আঠারো বছর বয়সে কাউকে জেলে যেতে হবে না।'

মাধুরী বললেন, 'কিন্তু এতবড় সিদ্ধপুরুষ—'

মহীতোষ হাসলেন, 'কত বড়?'

মাধুরী ভ্রুকুটি করলেন, 'সব তাতে ঠাট্টা ভাল লাগে না। দুম করে উনি ছেলেটার নামে এ সব বলবেনই বা কেন?'

মহীতোষ বললেন, 'কারণ উনি বাবাকে কব্জা করতে চান। না হলে বাবার প্রিয়জনকে আনতে বলতেন না। আমাদের চৌদ্দপুরুষ কেউ রাজনীতি করেনি— অনি খামোখা জেলে যেতে যাবে কেন? যত্ত সব?'

মাধুরী বললেন, 'মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল!'

মাধুরীর মুখটা খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। অনিকে এক হাতে জড়িয়ে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। সেদিকে তাকিয়ে মহীতোষ বললেন, 'তা দেশ যখন উদ্ধার হয়ে গিয়েছে ও নিশ্চয় চুরি ডাকাতি করে জেলে যাবে—।'

মাধুরী ভ্রুকুটি করে সরে দাঁড়াতে গেলেন, 'কি যে সব ছাইপাঁশ বল।' ঘুরে দাঁড়াবার মুহূর্তে ওঁর মাথাটা কেমন করে উঠল। ভিজে ছাদের ওপর পা যেন স্থির থাকছে না। সারাদিন খুব পরিশ্রম গিয়েছে, হেমলতার নিষেধ শোনেননি। খাওয়া-দাওয়ার ঠিক ছিল না। আজ, অবেলায় খেয়ে অম্বল হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ চোখে অন্ধকার দেখলেন।

অনি এতক্ষণ হাঁ করে বাবা-মায়ের কথা শুনছিল, এখন ঘাড়ে মায়ের দুই হাতের প্রচণ্ড চাপ পড়তে চিৎকার করে উঠে দেখল মা পা পিছলে পড়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ও মায়ের কোমর জড়িয়ে ধরতে গেল। পেটে চাপ পড়তে মাধুরী চিৎকার করে ছাদের ওপর উপুড় হয়ে পড়লেন। মহীতোষ দৌড়ে এসে স্ত্রীকে আঁকড়ে ধরলেন, 'কি হল, পড়ে গেলে কেন?' চোখের সামনে ওঁকে পড়ে যেতে দেখে হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন প্রথমটা। মারাত্মক কিছু ঘটে গেছে একটা এই রকম বোধ হতে মাধুরীর মুখটা তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কষ্ট হচ্ছে?'

মাধুরী ঘাড় নাড়লেন, 'না।' কিন্তু তাঁর মুখ দেখে মহীতোষ চমকে উঠলেন। দরদর করে ঘামছেন মাধুরী। স্ত্রীকে ছাদের ওপর শুইয়ে দিয়ে ছেলেকে বললেন, 'যা, শিগগির পিসীমাকে ডেকে আন।' মাধুরীর চেতনা ছিল, তিনি হাত নেড়ে নিষেধ করতে না করতে অনি এক লাফে ছাদ থেকে চিলেকোঠার সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এল।

পাতলা অন্ধকার নেমে এসেছে বাড়িটার ওপর, ছাদে এতক্ষণ বোঝা যায়নি। নিচে নামতেই অনি দেখল পিসিমা ছোটঘরের বারান্দায় লণ্ঠনগুলো জড়ো করেছেন। ও চিৎকার করে উঠল, 'পিসিমা তাড়াতাড়ি এসো—মা কেমন করছে!' চিৎকারটা হঠাৎ কান্না হয়ে যেতে হেমলতা চমকে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। লণ্ঠন পড়ে রইল, তিনি দুদ্দাড় করে অনির দিকে ছুটে এলেন। সরিৎশেখর সবে স্টেশন থেকে এসে পাঞ্জাবি খুলে হাতপাখার বাতাস খাচ্ছিলেন, অনির চিৎকার শুনে তিনিও হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন।

হেমলতা তাঁর ভারী শরীর নিয়ে অনির কাছে এসে দেখলেন ছেলের মুখ সাদা হয়ে গেছে ভয়ে, 'তোর মা কোথায়, কি হয়েছে?'

অনি কথা বলতে পারছিল না, আঙ্গুল দিয়ে ছাদটা দেখিয়ে দিল। এক পলক ওপর দিকে তাকিয়ে হেমলতা গজগজ করতে করতে ছাদের সিঁড়ির দিকে ছুটলেন, 'আঃ, এই সন্ধ্যেবেলায় আবার ছাদে উঠল কেন?'

সরিৎশেখর দ্রুত এসে অনিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে দাদু?'

অনি কেঁদে ফেলল, 'মা পড়ে গেছে।'

সরিৎশেখর আর দাঁড়ালেন না। অনি দাদুর পেছনে পেছনে ছাদে ছুটল।

বৃষ্টিটা এতক্ষণ থমকে ছিল, বেশ আবার ছোট ছোট ফোঁটাপড়া শুরু হল। এ এক অদ্ভুত ধরনের বৃষ্টি। মেঘ ডাকছে না, সামান্য হাওয়াও নেই, আকাশ চিরে ঝলকে ওঠা বিদ্যুতের দেখা নেই। তবু বৃষ্টি পড়ছে, থমথমে মেঘগুলো নিঃশব্দে গলে গলে পড়ছে। মহীতোষ বোকার মত স্ত্রীর পাশে বসেছিলেন, দিদিকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন। হেমলতার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে?'

যন্ত্রণায় মাধুরীর চোখ বোজা ছিল, হেমলতার গলা শুনে কিছু বলতে গিয়ে না পেরে মাথা নাড়লেন। মহীতোষ বললেন, 'হঠাৎ মাথা ঘুরে গেছে।' কথাটা শেষ হতে না হতে মাধুরীর শরীরটা কাঁপতে লাগল। তারপর প্রচণ্ড যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার জন্য শরীর মোচড়ানো শুরু হল। সারা শরীর ওর ঘামে ভিজে যাচ্ছে, তার উপর বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে এখন। বেশীক্ষণ এভাবে থাকলে ভিজে একসা হয়ে যাবে।

হেমলতা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ভাইকে বললেন, 'ওকে নিচে নিয়ে চল।' মহীতোষ একটু বিব্রত হয়ে পড়লেন। দিদিকে ডাকতে পাঠিয়ে তিনি মাধুরীকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মাধুরীর শরীর এমনিতেই ভারী, এখন যেন আরো ওজন বেড়েছে। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নিয়ে যাওয়া খুব সহজ নয়, ওঁর পক্ষে অসম্ভব।

মহীতোষ বললেন, 'তুমি একটা দিক ধরো, চিলেকোঠার দিকে নিয়ে যাই, বৃষ্টিতে ভিজবে না।' হেমলতা বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন মাধুরীকে একা মহীতোষের পক্ষে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না, তাই দুজনে ধরাধরি করে চিলেকোঠার ঘরে নিয়ে এলেন। সিঁড়িটা এখানে চট করে ছাদে উঠে আসেনি। সিঁড়ি শেষ হবার পর খানিকটা সমতল জায়গাকে ঘরের মতো

ঢেকে ছাদের শুরু। মাধুরীকে সেখানে রাখা হল। এটুকু আনতেই হেমলতা টের পেলেন যে ওকে নিচে নিয়ে যাওয়া বোকামি হত, সামান্য নড়াচড়ায় ওর কষ্ট যে অনেক গুণ বেড়ে যাচ্ছে এটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না।

এখন চিলেকোঠার ঘরে মাধুরীকে শুইয়ে দিয়ে মুখ তুলতেই হেমলতা সরিৎশেখরকে দেখতে পেলেন। উদ্বেগ মুখে নিয়ে উঠে আসছেন তড়িঘড়ি। চোখাচোখি হতে হেমলতা খুব সাধারণ গলায় বললেন, 'তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকুন।'

মেয়ের মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে থেকে সরিৎশেখর তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেলেন। মহীতোষ ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়াবে ভাবতে পারেননি। হঠাৎ ওঁর খুব ভয় হল। মাধুরীর যদি কিছু হয়ে যায়। কোন কথা না বলে মহীতোষ সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন, দরকার হলে ওকে হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে। হেমলতা দেখলেন মাধুরী ছট্‌ফট করছে। কি করবেন বুঝতে না পেরে মুখ তুলতেই দেখলেন অনি সিঁড়ির মুখে গাল চেপে করুণ চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। বোধ হয় ওপরে উঠে আসতে সাহস পাচ্ছে না। হেমলতা হেসে বললেন, 'যা বাবা, তাড়াতাড়ি নিচ থেকে একটা বালিশ আর চাদর নিয়ে আয়।' কাজ করতে পেরে অনি যেন বেঁচে গেল।

কোনমতে বিছানা করে মাধুরীকে শুইয়ে দিয়ে হেমলতা বললেন, 'অনি, তুই মায়ের কাছে বোস, আমি গরম জল করি গে।' পিসিমা চলে গেলে অনি খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। বাইরে এখন বেশ বৃষ্টি পড়ছে। ছোট বাড়ি থেকে চাদর-বালিশ আনতে গিয়ে ও একটু ভিজেছে। অন্য সময় মা নিশ্চয় বকত, এখন কিছু বলছে না। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ওর কান্না পাচ্ছিল। মা যে খুব কষ্ট পাচ্ছে এটা ও বুঝতে পারছিল।

মায়ের মুখটা একদম সাদা হয়ে গিয়েছে। ও মায়ের পাশে এসে সন্তর্পণে বসে পড়ল। এখন কাছে-পিঠে কেউ নেই, কারো গলা শোনা যাচ্ছে না। চিলেকোঠার দরজাটা আলো আসার জন্যে অথবা ভুলে খোলা রয়েছে। অনি এখান থেকে বৃষ্টি পড়া দেখতে পেল। জলের ছাঁট ঘরের মধ্যে সামান্যই আসছে। অনির খুব ইচ্ছে হল মায়ের মুখে হাত বোলাতে। ঠিক সেই সময় মাধুরী চোখ খুললেন। অনি দেখল মাধুরীর চোখের কোণে দু ফোঁটা জল টলটল করছে। মাধুরী একবার দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ালেন, তারপর মাথা ঘুরিয়ে ঘরটাতে চোখ বোলালেন। মায়ের চোখে জল দেখতে

পেয়ে অনি ফুঁপিয়ে উঠল। মাধুরী খুব ধীরে ধীরে একটা হাত তুলে ছেলের কোলের ওপর রাখতেই অনি মায়ের বুকের ওপর ভেঙে পড়ল। অনেকক্ষণ চুপচাপ ছেলেকে বুকের মধ্যে রেখে মাধুরী বললেন, 'হ্যাঁরে বোকা, কাঁদছিস কেন?'

ফিসফিসিয়ে অনি বলল, 'তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, না?'

'আমার কষ্ট হলে তোর খারাপ লাগে, না রে!'

অনি ঘাড় নাড়ল। মাধুরী আস্তে আস্তে বললেন, 'আমি যদি না থাকি তুই আমাকে ভুলে যাবি না তো!'

অনি দুই হাতে মাকে আঁকড়ে ধরে কেঁদে উঠল শব্দ করে। মাধুরী কেমন ঘোরের মধ্যে বললেন, 'আমি যদি না থাকি তুই একা একা আকাশের দিকে তাকিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলিস, আমি ঠিক শুনতে পাব। অনি, আমি তোকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না রে।'

অনি কোন কথা বলতে পারছিল না। ওর ঠোঁট দুটো থর থর করে কাঁপছিল। মাকে এ রকম করে কথা বলতে ও কোনদিন শোনেনি। মা কেন ওকে ছেড়ে চলে যাবে। ও দেখল মাধুরী একটানা কথা বলে কেমন নিস্তেজ হয়ে গেছেন, অনেক দূর দৌড়ে এলে যেমন হয় মায়ের বুক তেমনি ওঠানামা করছে। হঠাৎ ও মায়ের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে গেল। কিন্তু ক্রমশ কথা বলার শক্তিটা চলে যাচ্ছিল যেন মাধুরীর, চোখের সামনে সব ঝাপসা হয়ে আসছে। অনি ঝাপসা—মহীতোষ ঝাপসা-দু'চোখে এত জল থাকে কেন?

এই সময় সিঁড়িতে কয়েক জোড়া শব্দ পেল অনি। একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে যেন দম আটকে যাচ্ছিল ওর, হঠাৎ মনে হল ডাক্তারবাবু এসে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। হেমলতা একটা বড় লণ্ঠন নিয়ে আগে আগে উঠে এলেন। ছাদের এই ঘরটা এতক্ষণে আবছা হয়ে এসেছে। হেমলতার পিছন পিছন একজন বৃদ্ধ, সরিৎশেখর, মহীতোষকে ব্যাগ হাতে নিয়ে উঠে আসতে দেখল অনি। অনি বুঝতে পারল এই লোকটিই ডাক্তার, কারণ তৎক্ষণাৎ তিনি মাধুরীর পাশে বসে একটা হাত তুলে নিয়ে নাড়ি দেখতে লাগলেন। তারপর খুব গম্ভীর মুখে বললেন, 'আপনারা নিচে চলে যান।' সরিৎশেখর অনিকে এক হাতে আঁকড়ে ধরে নিচে নেমে গেলেন।

মহীতোষ খানিক ইতস্তত করে ব্যাগটা মেঝেতে রাখতে হেমলতা
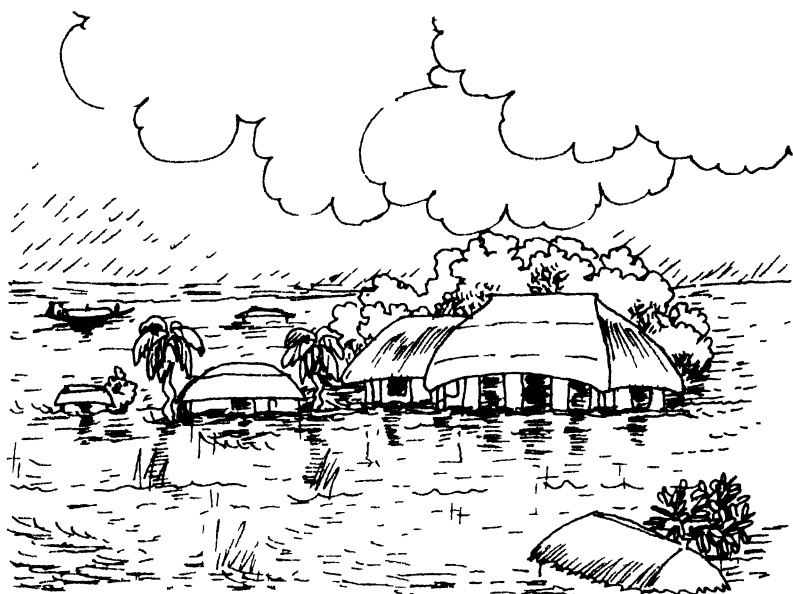
বললেন, 'গরম জলের সসপ্যানটা এনে দে শিগগীর।'

মহীতোষ নিচ থেকে জল ওপরে দিয়ে এসে দেখল সরিৎশেখর অনিকে জড়িয়ে ধরে চুপচাপ সিঁড়ির শেষ ধাপে বসে আছেন। ছেলেকে দেখে সরিৎশেখর বললেন, 'হাসপাতালে রিমুভ করা যাবে?'

ছোট ঘর থেকে আনা লণ্ঠনটা নামিয়ে মহীতোষ ঘাড় নাড়লেন। 'জানি না। করতে হলে এখনি করা দরকার। সেনপাড়ার দিকটায় তিস্তার জল ঢুকে পড়েছে।'

সরিৎশেখর বললেন, 'এ তো প্রতি বছরই হয়।'

মহীতোষ বললেন, 'দেখলেন না, মাইকে অ্যানাউন্স করছে। মনে হচ্ছে এবার খুব ভোগাবে।'

কথাটা শেষ করে মহীতোষ দেখলেন প্রিয়তোষ দরজায় দাঁড়িয়ে। এদের দেখেই সে চেঁচিয়ে উঠল, 'ফ্লাড আসছে, সামনের মাঠটা জলে ডুবে গেছে। চটপট্ মালপত্র ছাদে তোল।'

মহীতোষ তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে শুনলেন ওদের উঠোনে বাগানে জল শব্দ করছে। এতক্ষণ খেয়াল ছিল না, হঠাৎ ঠাণ্ডা বাতাস লাগতে টের পেলেন ওর সমস্ত জামাকাপড় ভিজে চুপসে গেছে, সরিৎশেখরেরও এক অবস্থা। অন্ধকারে এতক্ষণ যেটুকু দেখা যাচ্ছিল আর তাও দেখা যাচ্ছে না।

ঝিম ঝিম বৃষ্টি পড়ছে আর হঠাৎ সমস্ত পৃথিবী ধাঁধিয়ে দিয়ে বিদ্যুৎ চমকে উঠতেই মহীতোষ দেখলেন, ঘোলাজলের স্রোত উঠোনময় কিলবিল করছে।

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে মহীতোষ দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, 'বন্যা এসে গেছে, এখন তো নিয়ে যাওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না।'

প্রিয়তোষ বলল, 'কি হয়েছে?'

মহীতোষ বললেন, 'তোর বউদি পড়ে গিয়ে অবস্থা সিরিয়াস।'

প্রিয়তোষ বলল, 'সে কি! কখন?'

সরিৎশেখর বিরক্তিচাপা গলায় বললেন, 'বাড়িতে কতক্ষণ থাক যে এসব খবর রাখবে? যাও, জিনিসগুলো যাতে জলে না ডোবে দেখগে যাও।'

মহীতোষ একবার ওপরের দিকে তাকিয়ে জলের মধ্যে গেলেন। অন্ধকারে চলতে কষ্ট হচ্ছে, প্রিয়তোষ ওঁর পিছনে। ছোট ঘরে তখন পায়ের পাতার ওপর জল। কি নেওয়া যায় কি নেওয়া যায় ভাবতে না পেরে আবিষ্কার হল অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। দ্রুত জল বাড়ছে। হাঁটুর কাছটা যখন ভিজে গেল তখন মহীতোষ টর্চটা খুঁজে পেলেন। খাটের অনেকটা এখন জলের তলায়। লেপ তোশক নিয়ে যাবার কোন মানে হয় না। মেঝেয় রাখা সুটকেশগুলোর ওপর জল বয়ে যাচ্ছেঁ। সেগুলোকেই টেনে-টুনে খাটের ওপর রাখা হল। ভিজে গেছে সব। সরিৎশেখরের টাকাপয়সা আলমারিতে আছে, অদ্দূর জল উঠবে না নিশ্চয়ই। ঘরটাকে সামলে কিছু শুকনো কাপড়চোপড় আর গায়ের চাদর নিয়ে ওঁরা বেরিয়ে এলেন। আসবার সময়ে মহীতোষ মাধুরীর সুটকেসটা তুলে নিলেন। মহীতোষের টাকা এই সুটকেসে আছে। সুটকেসটা এর মধ্যে ভিজে ঢোল হয়ে গেছে।

নতুন বাড়ির বারান্দার ইঞ্চি কয়েক নিচে জল। মহীতোষ ছাদের সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়াতে দেখলেন সরিৎশেখর ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলছেন। হ্যারিকেনের আলোয় দেওয়ালে ওঁদের ছায়া কাঁপছে। ছেলেকে দেখে সরিৎশেখর কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'আমি কিছু ভাবতে পারছি না মহী, ভগবান এ কি করলে।'

মহীতোষ ডাক্তারবাবুর দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, 'হাসপাতালে

নিয়ে যেতে পারলে একটা চেষ্টা করা যেত। কিন্তু যা অবস্থা—জল শুনলাম বড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে!' মহীতোষ ঘাড় নাড়লেন।

'হয়ে গেল তাহলে।' ডাক্তারবাবু ছট্‌ফট করে উঠলেন, 'ভোরের আগে কোন বার জল কমে না। এইজন্যেই আমি আসতে চাইছিলাম না। এখন আমি বাড়ি যাই কি করে। অন্ধকারে জল ভেঙে যেতে কোথায় পড়ব—ইস!'

মহীতোষ বললেন, 'ডাক্তারবাবু, আপনি চলে গেলে ওকে নিয়ে আমরা—না, আপনার যাওয়া চলবে না। আপনি ওকে দেখুন, আমি আপনার বাড়িতে খবর দিয়ে আসছি!'

কথাটা শেষ হতেই প্রিয়তোষ 'আমি খবর দিয়ে আসি' বলে অন্ধকারে ছুটে বেরিয়ে গেল। সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, 'আমি আর দেখে কি করব! চোখের সামনে মেয়েটা চলে যাচ্ছে আমি ফ্যালফ্যাল করে দেখছি। ভগবানকে ডাকুন!'

এখন এখানে শুধু ঝড়ো বাতাস ছাড়া কোন শব্দ নেই। বাইরে তিস্তার জল নতুন বাড়ির বারান্দার গায়ে ধাক্কা লেগে যে শব্দ তুলছে তাও বাতাসে চাপা পড়ে গেছে। মহীতোষ পাথরের মত দাঁড়িয়ে। সরিৎশেখর নাতিকে দুহাতে জড়িয়ে ওপরের দিকে মুখ করে বসে আছেন সিঁড়িতে। লণ্ঠনের আলোয় দেওয়ালে পড়া তাঁদের ছায়াগুলো নিয়ে বাতাস উদ্ভট ছবি এঁকে এঁকে যাচ্ছে। সময় এখন খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগুচ্ছে। যে কোন মুহূর্তে ওপর থেকে কোন শব্দ ভেসে আসবে এই রকম একটা আশঙ্কায় দুটো শরীর কাঁটা হয়ে রয়েছে। দাদুর বুকের ওপর মাথা রেখে অনি অনেকক্ষণ ধরে দুপ-দুপ বাজনা শুনছিল। এতক্ষণ যে সব কথাবার্তা এখানে হয়ে গেল তার প্রতিটি শব্দ ওর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। মা আর থাকবে না! ডাক্তারবাবু ওদের ভগবানকে ডাকার কথা বললেন, কিন্তু কেউ ডাকছে না কেন?

অনির মনে পড়ল স্বর্গছেঁড়ায় এক বিকেলবেলায় হেমলতা ওকে বলেছিলেন সব চেয়ে বড় ভগবান হল মা। অনি সমস্ত শরীর দিয়ে মনে মনে মাকে ডাকতে লাগল। চোখ বন্ধ করে নিঃশব্দে 'মা, মা', উচ্চারণ করতে করতে অনি দেখতে পেল মাধুরী ওর কাছে এসে দুহাতে ওকে জড়িয়ে ধরেছেন। মায়ের গায়ের সেই গন্ধটা বুক ভরে নিতে নিতে ও

শুনতে পেল পিসীমা সিঁড়ির মুখে এসে বলছেন, 'অনিকে একটু ওপরে নিয়ে আসুন।'

কথাটা শুনে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল অনি। অন্ধকারে সিঁড়িগুলো লাফ দিয়ে পেরিয়ে এসে পিসীমার মুখোমুখি হয়ে গেল ও। অনিকে দেখে হেমলতা দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন। অনি বুঝতে পারল পিসীমা কাঁদছেন। কয়েক পা এগিয়ে হেমলতা আবার থমকে দাঁড়ালেন। অনির মাথাটা ওঁর প্রায় কাঁধ-বরাবর। অনি শুনতে পেল কেমন কান্না-কান্না গলায় পিসীমা ওকে বলছেন, 'অনি বাবা, আমার সোনাছেলে, তোমার মা এখন ভগবানের কাছে চলে যাচ্ছেন, যাওয়ার আগে তোমাকে দেখতে চাইছেন—।' হুহু করে কেঁদে ফেললেন হেমলতা।

অনি বলল, 'মা-ই তো ভগবান। তবে মা কার কাছে যাচ্ছে?'

ফিসফিস করে হেমলতা বললেন, 'আমি জানি না বাবা, তুমি কোন কথা বলো না, বেশী কেঁদো না, তাহলে মা'র যেতে কষ্ট হবে।' পিসীমার বারণ তিনি নিজেই মানছিলেন না।

মা শুয়ে আছেন চুপচাপ। ওঁর শরীর নড়ছে না। ডাক্তারবাবু মাটিতে বাবু হয়ে বসে আছেন। হেমলতা অনিকে এগিয়ে দিলেন, সামনে, 'মাধু, অনি এসেছে দ্যাখ।'

চোখের পাতা নাচল, পুরো খুলল না। অনি দেখল মায়ের চোখের কোল জলে ভরে গেছে। অনি মাধুরীর মুখের পাশে মুখ নিয়ে ডাকল, 'মা, মাগো!'

মাধুরী ঘোরের মধ্যে বললেন, 'অনি, বড় কষ্ট হচ্ছে রে।'

ফুঁপিয়ে উঠল অনি, 'মা, মাগো।'

মাধুরী ফিসফিস করে বললেন, 'আমি তোর সঙ্গে থাকব রে, তুই জেলে গেলেও তোর সঙ্গে থাকব।' অনি পাগলের মত মায়ের বুকে মুখ চেপে ধরে ফোঁপাতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে বাইরের বৃষ্টির শব্দ, হাওয়ার শব্দ ছাপিয়ে হেমলতার বুকফাটা চিৎকার কানে আসতে অনি মায়ের বুক থেকে মাথা সরিয়ে অবাক হয়ে দেখল পিসীমা আর বাবা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কাঁদছে। ওর পাশ দিয়ে দুটো পা দ্রুত ছাদের দিকে চলে গেল। পিছন থেকে অনি দেখল দাদু এই বৃষ্টির মধ্যে অন্ধকারে ছাদে হেঁটে যাচ্ছেন।

মায়ের দিকে তাকাল অনি। স্বর্গছেঁড়ায় অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে ও মাধুরীকে এমনি ভাবে শুয়ে থাকতে দেখত। ঘুমিয়ে পড়লে মাধুরী সহজে জাগতে চাইতেন না। ভীষণ বাথরুম পেয়ে গেলে অনি মায়ের গায়ে চিমটি কাটতো। তখন মাধুরী ধড়মড় করে উঠে বসতেন। অনি বুঝতে পারছিল আর মা উঠে বসবে না। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনি চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

মাঝরাতেই জল নেমে গিয়েছিল। ভোরের আলো ফুটতে চারধার একট অদ্ভুত দৃশ্য নিয়ে জেগে উঠল। সমস্ত শহরটার ওপর কয়েক ইঞ্চি পলি পড়ে গেছে। সূর্যের আলো পড়ায় চকচক করছে সেগুলো। ভেসে আসা মৃত গরু ছাগল আটকে আছে এখানে সেখানে। তিস্তার জল করলা নদীর মধ্যে ঢুকে যাওয়ায় নিচু জায়গাগুলো এখনো জলের তলায়। শ্মশানটা শহরের একপ্রান্তে, মাসকলাইবাড়ির কাছে। উঁচু জায়গা বলে সে অবধি জল পৌঁছয়নি। লোকজন যোগাড় করে এই পাঁকের ওপর দিয়ে হেঁটে শ্মশানে আসতে দুপুর হয়ে গেল। ছোট ঘরের অনেক জিনিসপত্র গেলেও খাটটা বেঁচেছে। সরিৎশেখর সেখানে সকাল থেকে শুয়ে রইলেন। কাল রাত্রে বৃষ্টিতে ভিজে সর্দিজ্বর হয়েছে ওঁর। বার বার বলছেন, 'আমার অঙ্গহানি ঠেকাতে পারলো না কেউ।'

মৃতদেহ নিয়ে যাবার লোকের অভাব হয় না। তারা সবাই হরিধ্বনি দিতে দিতে মাধুরীকে নিয়ে যাচ্ছিল। প্রিয়তোষ কাঁধ দিয়েছে। হেমলতা কাল রাত থেকেই সেই যে অনিকে জড়িয়ে ধরে বসেছিলেন মাধুরীর পাশে, একবারও ওঠেননি। কাঁদতে কাঁদতে অনি কখন তাঁর বুকে ঘুমিয়ে পড়েছে, আবার জেগেছে, হেমলতা পাথর।

শ্মশানে ওরা যখন চিতা সাজাচ্ছিল তখন ছেলেকে জড়িয়ে ধরে চুপচাপ বসেছিলেন মহীতোষ। কাঁদতে ভয় করছিল অনির জন্যে। আজকে এই শ্মশানে আর কোন চিতা জ্বলছে না। একমাত্র যেটি সাজানো হচ্ছে সেটি মাধুরীর জন্য।

হঠাৎ অনি কেমন কাঠ-কাঠ গলায় বলল, 'মাকে ওরা শুইয়ে রেখেছে কেন?' মহীতোষ জবাব দিতে গিয়ে দেখলেন তাঁর গলা আটকে যাচ্ছে।

অনেক কষ্টে বললেন, 'ভগবান কাউকে নিয়ে গেলে তাঁর শরীরটা পুড়িয়ে ফেলতে হয়।'

হঠাৎ একজন এগিয়ে এল ওঁদের দিকে, 'দাদা, আর দেরি করা ঠিক হবে না। মুখাগ্নি তো ওই করবে?' মহীতোষ ঘাড় নাড়লেন। ছেলেটি অনির হাত ধরল, 'এস তুমি।' তারপর অনিকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'মা তো চিরকাল থাকে না, আমারও মা নেই, বুঝলে?'

পর পর সুন্দর করে কাঠ সাজিয়ে মাধুরীকে শোয়ানো হয়েছে। মাধুরীর চুল খুব বড়, চিতার একটা দিক কালো করে ঢেকে রয়েছে। প্রিয়তোষ এসে অনির পাশে দাঁড়াল। অনি দেখল কয়েকজন পাটকাঠিতে আগুন ধরাচ্ছে। মাকে খুব শান্ত দেখাচ্ছে এখন।

মায়ের সেই কথাগুলি মনে পড়ল অনির— অনি, আমি তোমার সঙ্গে আছি। 'মা, মাগো।' অনি ডুকরে কেঁদে উঠতে প্রিয়তোষ বলল, 'কাঁদিস না অনি, কাঁদিস না।'

আগের ছেলেটি একগোছা পাটকাঠিতে আগুন জ্বালিয়ে এনে অনির সামনে ধরল, 'নাও, মায়ের মুখে আগুনটা একটু ছুঁইয়ে দাও।'

কথাটা শুনে আঁতকে উঠল ও। সদ্য জ্বালা আগুনের শিখাটা যদিও ছোট কিন্তু লকলক করছে। সেদিকে তাকিয়ে অনি বলে উঠল, 'আগুন দিলে মুখ পুড়ে যাবে না!'

কথাটা মহীতোষের কানে যেতে মহীতোষ ডুকরে কেঁদে উঠলেন। ছেলেটি আর দেরি করল না, অনির একটা হাত টেনে নিয়ে পাটকাঠির ওপর চেপে ধরে নিজেই জোর করে আগুনের শিখাটা মাধুরীর মুখে ছুঁইয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আরো কয়েকটা শিখা চিতার আশেপাশে লকলক করে উঠল যেন। প্রিয়তোষ অনিকে সরিয়ে নিয়ে এল চিতার কাছ থেকে। ওকে ধরে উল্টোদিকে হাঁটতে লাগল সে। কয়েক পা হেঁটে অনি শুনতে পেল পেছন থেকে অনেকগুলো গলায় চিৎকার উঠছে, 'বল হরি, হরি বোল।'

হঠাৎ কাকার হাতের বাঁধন থেকে ছিটকে সরে গিয়ে অনি মায়ের চিতার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। দাউ দাউ করে অজস্র শিখা নিয়ে আগুন জ্বলছে। শব্দ হচ্ছে কাঠ পোড়ার। আগুন ক্রমশ দলা পাকিয়ে লাল হয়ে নাচতে শুরু করেছে। অনি আগুনের মধ্যে অস্পষ্ট একটা অবয়ব দেখতে পেল, যাকে মা বলে কিছুতেই চেনা যায় না।

তাঁকে প্রশ্ন করা হল,'যিনি তোমাকে গর্ভে ধরেছেন, স্তন্যদান করে জীবন দিয়েছেন, তোমাকে জ্ঞানের আলো দেখিয়েছেন সেই তিনি আর যিনি মাতৃজঠর থেকে নির্গত হওয়া মাত্র তোমার জন্য জায়গা দিয়েছেন, তাঁর সংস্কৃতি তাঁর সংস্কার রক্তে মিশিয়ে দিয়েছেন এই তিনি—কাকে তুমি আপন বলে গ্রহণ করবে?' তিনি বললেন, 'দুজনকেই। কারণ একজনের সঙ্গে নাড়ির বাঁধন ছিন্ন হওয়া মাত্রই আর একজনের সঙ্গে নাড়ির বাঁধন যুক্ত হয়েছে। কিন্তু ছিন্ন না হলে যে যুক্ত হতো না। তাই দুজনেই আমার আপন।'

তাঁকে বলা হল, 'যদি একজনকে ত্যাগ করতে বলা হয় তবে কাকে ত্যাগ করবে?' তিনি বললেন, 'এই মাটি তো তাঁরও জননী। তাঁর এর জন্য জীবন দিলে তিনিই ধন্য হবেন। সে ত্যাগ মানে আরো বড় করে পাওয়া, সে ত্যাগেই আমার আনন্দ।'

সমস্ত ক্লাস চুপচাপ, নতুন স্যার একটু থামলেন, তারপর উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকা মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সেই মায়ের পায়ে যখন লোহার বেড়ি পরিয়ে দিয়েছিল ইংরেজরা তখন তাঁর এমন কত দামাল ছেলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দুঃখিনী মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে। একবারে না পারলে বলেছিল, একবার— বিদায় দে মা ঘুরে আসি।

এই মা দেশমাতৃকা। তোমরা নতুন ভারতবর্ষের নাগরিক। আজ আমাদের মায়ের পায়ে বেড়ি নেইকো, অনেক রক্তের বিনিময়ে তিনি আজ মুক্ত কিন্তু

এতদিনের শোষণে তিনি আজ রিক্তা, মলিনা, শীর্ণা। তোমাদের ওপর দায়িত্ব তাঁর মুখে হাসি ফিরিয়ে আনবার। নাহলে তোমরা যাঁদের উত্তরাধিকারী তাঁদের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না ভাই। ব্যাস, আজ এই পর্যন্ত।' টেবিলের ওপর থেকে ডাস্টার বই তুলে নিয়ে স্যার ক্লাস-রুম থেকে সোজা মাথায় বেরিয়ে গেলেন।

তাঁর খদ্দরের পাঞ্জাবির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনিমেষ বুঝতে পারেনি ওর সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। এইসব কথা এই স্কুলে নতুন স্যার আসার আগে কেউ বলেনি। ব্যাপারটা ভাবলেই কেমন হয়ে যায় মনটা। নতুন স্যার বলেছেন, 'শিবাজীও একজন স্বাধীনতা আন্দোলনের যোদ্ধা ছিলেন। শিবাজীর কথা শুনলে মনের মধ্যে কিছু হয় না কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসু যখন বলেন 'গিভ মি ব্লাড' তখন হৃৎপিণ্ড দপদপ করে।' এই ব্লাড শব্দটা উচ্চারণ করার সময় নতুন স্যার এমন জোর দিয়ে বলেন অনিমেষ চট করে মায়ের সেই শেষযাত্রার ছবিটা দেখতে পায়। ওর তখন ভীষণ কান্না পেয়ে যায়।

নতুন স্যার থাকেন হোস্টেলে। ওদের স্কুলের সামনে বিরাট মাঠ পেরিয়ে হোস্টেল। ক'দিনের মধ্যে অনিমেষের সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল নতুন স্যারের। ওদের স্কুলের অন্যান্য টিচাররা দীর্ঘদিন ধরে পড়াচ্ছেন। ওঁরা নতুন স্যারের সঙ্গে ছাত্রদের মেলামেশা ঠিক পছন্দ করেন না। একমাত্র ড্রিল স্যার বরেনবাবুর সঙ্গে নতুন স্যারের বন্ধুত্ব আছে। ওঁরা দুজন এক ঘরে থাকেন।

অনিমেষের পড়ার চাপ পড়েছে বলে সরিৎশেখর ভোরে আর ওকে বেড়াতে যেতে বলেন না। কিন্তু এইটুকু ছেলের মধ্যে যে চাঞ্চল্য ছটফটানি থাকার কথা অনিমেষের মধ্যে তা নেই। সারাদিন যখনই বাড়িতে থাকে তখনই মুখ গুঁজে বই পড়ে।

বই পড়ার এই নেশাটা ওর মধ্যে ঢুকিয়েছিল প্রিয়তোষ। ঢুকিয়ে দিয়ে হাওয়া হয়ে গিয়েছে সে। সরিৎশেখরের জীবনে আর একটি আঘাত এই ছোট ছেলে। দিন-রাত বাড়ির বাইরে পড়ে থাকত, কখন যেত কখন আসত হেমলতা ছাড়া আর কেউ টের পেত না। রাগারাগি করতে করতে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন সরিৎশেখর। চাকরিবাকরি করে না, তাঁর কোন সাহায্য হচ্ছে না, এছাড়া এই ছেলের বিরুদ্ধে ওঁর অভিযোগ করার অন্য কারণ
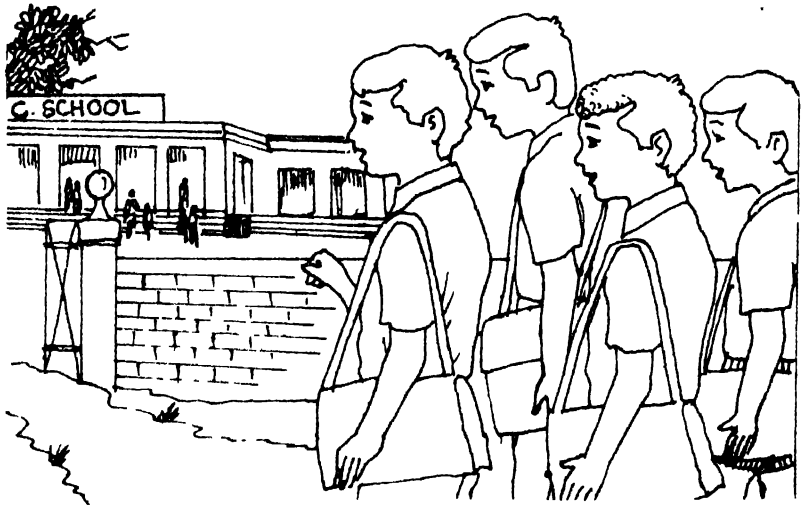
নেই। অনি তখন সবে স্কুলে ভর্তি হয়েছে। বাড়ি এলে অনির সঙ্গে আড্ডা হত খুব।

স্বর্গছেঁড়ায় ওর যে আকর্ষণের আভাস তিনি হেমলতার কাছে পেয়েছেন সেটা নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা ছিল। কিন্তু ও যে আর স্বর্গছেঁড়ায় যায় না, জোর করেও তাকে স্বর্গছেঁড়ায় পাঠাতে পারেননি সে কথাও তো সত্যি।

তারপর সেইদিনটা এল। তিন দিন বাড়ি আসেনি প্রিয়তোষ। সরিৎশেখর এখানে সেখানে ওকে খুঁজেছেন। যে ক'জন ওর সমবয়সী ছেলেকে ওর সঙ্গে ঘুরতে দেখেছেন তারাও ওর হদিস দিতে পারেনি। বিরক্ত চিন্তিত সরিৎশেখর ঠিক করেছিলেন প্রিয়তোষ এলে পাকাপাকি কথা বলে নেবেন ভদ্রভাবে সে বাড়িতে থাকতে পারবে কিনা।

তখন ওঁরা নতুন বাড়িতে উঠে এসেছেন। ছোট বাড়িটায় পুরোন জিনিসপত্রের গুদাম করে রাখা হয়েছে। মাঝখানের বড় ঘরটায় সরিৎশেখর একা শোন, লাগোয়া ঘরটায় হেমলতা। বাইরের দিকের ঘরটায় প্রিয়তোষ এবং অনিমেষ থাকত। অনিমেষকে সে বছরই প্রথম স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে, খুব কড়া স্কুল। এ জেলার মধ্যে এই স্কুলের নামডাক সবচেয়ে বেশী। সরিৎশেখর নিজে গিয়ে ওকে ক্লাসে বসিয়ে এসেছেন। ভেবেছিলেন ক্লাসে ঢুকে ছেলেটা নিশ্চয়ই কান্নাকাটি করবে। কিন্তু অনি ওঁর চলে আসার সময় খুব গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল।

অদ্ভুত পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে ছেলেটার। সেই জন্ম থেকে তিনি ওকে দেখছেন, ওর নাড়িনক্ষত্র জানা, কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর ছেলেটা রাতারাতি পাল্টে যাচ্ছে। বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে চুপচাপ ছাদে গিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। প্রিয়তোষ ওর দিদিকে বলেছে রাতদুপুরে অনি নাকি জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে নিজের মনে কথা বলে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন সরিৎশেখর। কিন্তু অন্য সময় ও ভুলেও মায়ের কথা বলে না। হেমলতাকে নিষেধ করে দিয়েছিলেন অনির কাছে মাধুরীর গল্প বলতে। অনি একা একা নিজের মত করে বড় হোক — সরিৎশেখর এটাই চাইছিলেন।

মাধুরী বেঁচে থাকতে কাকার সঙ্গে অনির খুব একটা ভাব ছিল না। বরং কারণে অকারণে প্রিয়তোষ ওর উপর অত্যাচার করত। অনির কান দুটো প্রিয়তোষের আঙুলের বাইরে থাকার জন্য তখন প্রাণপণে চেষ্টা করত। মা মরে যাবার পর প্রিয়তোষের ব্যবহার একদম পাল্টে গেল।

নতুন স্যার তখন সদ্য স্কুলে এসেছেন। ওঁর কথাবার্তা, হাসি অনিমেষের খুব ভাল লাগছে। মাঝে মাঝে যখন খুব শক্ত কথা বলেন তখন অনিমেষরা বুঝতে পারে না। কিন্তু যখন দেশের গল্প করতে করতে নতুন স্যার জানতে পারলেন অনির মা নেই, অনি দেখল, ক্লাসের সমস্ত মুখগুলো ওর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছে। যেন মা নেই ব্যাপারটা কেউ ভাবতে পারছে না। নতুন স্যার ওকে কাছে ডেকে আদর করে বললেন, 'মা নেই বলো না। আমাদের তো দুটো মা, একজন চলে গেছেন ঈশ্বরের কাছে কিন্তু আর এক মা তো রয়েছেন। তুমি তাঁর কথা ভাববে, দেখবে আর খারাপ লাগবে না। বঙ্কিমচন্দ্র বলে একজন বিরাট সাহিত্যিক ছিলেন, তিনি এই দেশকে মা বলেছিলেন, বলেছিলেন 'বন্দেমাতরম্।'

স্কুলের প্রথম বছরে অনিমেষের স্বর্গছেঁড়ায় যাওয়া হয়নি। মহীতোষ ওখানে অত বড় কোয়ার্টারে একা আছেন ঝাড়িকে নিয়ে। সে-ই রান্নাবান্না করে সংসার সামলায়। গরমের ছুটিতে বা পুজোর সময় সরিৎশেখর ভেবেছিলেন নাতিকে পাঠাবেন কিন্তু মহীতোষই আপত্তি করেছেন। ওখানে গেলে মাধুরীর কথা বারংবার মনে হবে অনিমেষের।

হেমলতার হয়েছে মুশকিল, হাজার দোষ করলেও ভাইপোকে বকামারা চলবে না, সরিৎশেখরের হুকুম। মহীতোষ দুদিন ছুটি থাকলেই শহরে চলে

আসেন কিন্তু ছেলের সঙ্গে ইচ্ছে থাকলেও মিশতে পারেন না ঠিকমত। কোথায় যেন আটকে যায়। ঐটুকুনি ছেলে একা একা শোয়, একা একা বাগানে ঘোরে, কি গম্ভীর দেখায়। পড়াশুনায় রেজাল্ট ভালই হচ্ছে। হেডমাস্টারমশাই সরিৎশেখরকে বলেছেন, 'হি ইজ একসেপশনাল, অত্যন্ত ভাবুক।'

হেমলতা জলপাইগুড়িতে আসার পর হঠাৎ যেন বুড়িয়ে যাচ্ছেন। প্রায়ই অম্বল হচ্ছে আজকাল, কিছু খেলে হজম হয় না ঠিক। সব কাজ শেষ করে খেতে খেতে চারটে বেজে যায়। সেই সময় অনিমেষ আসে। পিসীমার আলোচালের ভাত নিরামিষ তরকারি দিয়ে খেতে ও খুব ভালবাসে।

সরিৎশেখরের সন্দেহ অনিমেষের সঙ্গে খাবার জন্যেই হেমলতার চারটের আগে খেতে বসা হয় না। অনেক বকাঝকা করেছেন কোন কাজ হয়নি। নিজের হাতে রান্না সেরে সরিৎশেখরকে খাইয়ে সমস্ত বাড়ি ঝেড়ে মুছে বাসন মেজে তবে নিজের নিরামিষ রান্না শুরু করবেন হেমলতা। একটু পিটপিটে স্বভাব আগেও ছিল, সরিৎশেখর লক্ষ্য করেছেন ইদানিং সেটা আরো বেড়েছে। চব্বিশ ঘন্টা জল ঘেঁটে ঘেঁটে দু'পায়ের আঙুলের ফাঁকে সাদা হাজা বেরিয়ে গেছে, অনিমেষের মুখে সরিৎশেখর সদ্য সেটা জানতে পারলেন।

বিকেলে যখন ওরা মুখোমুখি খেতে বসে সে দৃশ্য বেশ মজার। পিঁড়িতে বাবু হয়ে বসে অনিমেষ, হেমলতা অত বড় ছেলেটাকে ভাত, তরকারী মেখে গোল্লা পাকিয়ে দিয়ে নিজে মাটিতে উবু হয়ে বসে খাওয়া শুরু করেন। প্রায় একই সংলাপ দিয়ে খাওয়া শুরু হয়ে রোজ, সরিৎশেখর চুরি করে শুনেছেন।

অনিমেষ বলে, 'মাকে তুমি ফ্রক পরা দেখেছ?'

হেমলতা খেতে খেতে বলেন, 'পনের বছরের মেয়ে ফ্রক পরবে কি! তবে বিয়ের আগের দিনও নাকি রান্নাঘরে ঢোকেনি। তোর দাদু যখন দেখতে গিয়েছিল তখন ওর বাবা খুব ভুজুং দিয়েছিল — এই রাঁধতে পারে সেই রাঁধতে পারে।'

'তারপর'?

'তারপর আর কি! বিয়ের পর আমি রেঁধে দিতাম আর তোর দাদু

জানতো মাধুরী রেঁধেছে। তবে খুব চটপট শিখেছিল।'

'মা দেখতে খুব সুন্দরী ছিল, না?'

'মুখটা খুব মিষ্টি ছিল তবে ভীষণ মোটা। হাত-টাতগুলো কি, এক হাতে ধরা যায় না। মাথায় চুল ছিল বটে, হাঁটুর নীচ অবধি নেমে আসতো। দু'হাতে চুল বাঁধতে হিমসিম খেতে হত। একদিন রাগ করে অনেকটা কেটে দিলাম।'

'মা মোটা ছিল?' অনিমেষের গলায় বিস্ময়।

'হুঁ। বাবার তো ঐরকম পছন্দ ছিল। আমার প্রথম মা'র নাকি পাহাড়ের মত শরীর ছিল। বিয়ের পর আমরা তোর মাকে নিয়ে খুব ঠাট্টা করতাম। তারপর তুই হতে কেমন রোগা রোগা হয়ে গেল।'

তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ দুজনে কথা না বলে খেয়ে যায়। বিকেলে অনির এই ভাত খাওয়াটা একদম পছন্দ করেন না সরিৎশেখর। কিন্তু মেয়ের জন্য কিছু বলতেও পারেন না। অনেক কিছু এখন মেনে নিতে হচ্ছে বাধ্য হয়ে।

সরিৎশেখর বুঝতে পারছেন তাঁর পুঁজি দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। এতদিন চা-বাগানের চাকরিতে মাইনে ছাড়া বাড়তি কোন উপার্জন করেননি। বিলাসিতা ছিল না তাই জমানো টাকার বেশির ভাগ দিয়ে এই বাড়িটা তৈরি করার পর হাতে যা আছে তাতে মাত্র কয়েক বছর চলতে পারে। এখনও তাঁর স্বাস্থ্য ভাল, ইচ্ছে করলে এই শহরে কোন দেশী চা-বাগানের হেড অফিসে একটা চাকরি জুটিয়ে নিতে পারেন কিন্তু আর গোলামি করতে প্রবৃত্তি হয় না। চা-বাগানের ইতিহাসে এতদিন পেন্সনের ব্যাপারটাই ছিল না। রিটায়ার করার পর অনেক লেখালেখি করে কলকাতা থেকে তাঁর জন্য পঁচাত্তর টাকার একটা মাসিক পেন্সনের অনুমতি আনিয়েছেন। সরিৎশেখরের ধারণা তাঁর চিঠির চেয়ে ম্যাকফার্সনের সুপারিশ বেশী কাজ করেছে। মেমসাহেব এখনও প্রতি মাসে তাঁকে চিঠি লেখেন ডিয়ার বাবু বলে। স্বর্গছেঁড়ার জন্য কষ্ট হয় তাঁর, সরিৎশেখরকে তিনি ভোলেননি — এইসব। টানা টানা হাতের লেখা। অনিমেষকে সে চিঠি পড়ান সরিৎশেখর। খামের ওপর ডাকঘরের ছাপ থেকে দেশটাকে নাতির কাছে উপস্থিত করতে চেষ্টা করেন। মিসেস ম্যাকফার্সন লিখেছিলেন তোমার গ্র্যান্ডসন যখন এখানে ব্যারিস্টারি পড়তে আসবে তার সব খরচ আমার। সরিৎশেখর

অনিমেষকে বিলেতে পাঠাবেন বলে যখন ঘোষণা করেন তখন সময়ের হিসাব তাঁর হারিয়ে যায়।

পেন্সন পাবার পর চলে যাচ্ছে একরকম। তিনটে তো প্রাণী, এতবড় বাড়িটা খালি পড়ে থাকে। মহীতোষ তাঁকে টাকা পাঠাতে চেয়েছিলেন প্রতি মাসে, রাজী হননি তিনি। বলেছিলেন তাহলে ছেলেকে হোস্টেলে রাখ। আর কথা বাড়াননি মহীতোষ। টাকার দরকার হলে বাড়ি ভাড়া দিতে পারেন সরিৎশেখর। প্রচুর লোক আসছে ভাড়ার প্রস্তাব নিয়ে। এতগুলো ঘর খালি পড়ে আছে, কেউ এসে থাকবে তারও তো সম্ভাবনা নেই। তবু ভাড়া দেওয়ার কথা চিন্তাই করেন না সরিৎশেখর। এটা তাঁর এক ধরনের আনন্দ। কেউ ভাড়া চাইতে এলে তাকে মুখের ওপর না বলে দিয়ে মেয়ের কাছে এসে বলেন, 'বুঝলে হেম, এই যে বাড়িটা দেখছ — এই হল আমার আসল ছেলে, শেষ বয়সে এই আমাকে দেখবে।'

এখন প্রতি বছর তিস্তায় ফ্লাড আসে। যেমন ভাবে নিয়ম মেনে বর্ষা আসে শীত আসে তেমনি বন্যার জল শহরে ঢুকে পড়ে। নতুন বাড়িতে ওঠার পর জল আর জিনিসপত্র নষ্ট করার সুযোগ পায় না। শুধু প্রতি বছর সরিৎশেখরের বাগানের ওপর পলিমাটির স্তরটা বেড়ে যায়।

এখন নদী দেখলে সরিৎশেখর বুঝতে পারেন দু-একদিনের মধ্যে বন্যা হবে কিনা। এমন কি তিস্তা যখন খটখটে শুকনো, সাদা বালির চরে হাজার হাজার কাশগাছ বাতাসে মাথা দোলায়, যখন ওপারের বার্নিশঘাট অবধি জলের রেখা দেখা যায় না, ভাঙা ট্যাক্সিগুলো সারাদিন বিকট শব্দ করে তিস্তার বুকে ছুটে বেড়ায়, সেইরকম সময়ে একদিন হঠাৎ মাঝরাত্রে বোমা ফাটার মত শব্দ ওঠে তিস্তার বুকে আর সরিৎশেখর বিছানায় শুয়ে শুয়ে নিশ্চিত হয়ে যান কাল ভোরে বেড়াতে গিয়ে দেখতে পাবেন তিস্তার শুকনো বালি রাতারাতি ভিজে গেছে। বিকেল নাগাদ ভুস করে জল উঠে স্রোত বইতে শুরু করবে। চোখের উপর এই শহরটার চরিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

চোখের উপর অনিকে বড় হয়ে উঠতে দেখেছেন। পড়াশুনায় ভাল ছেলেটা, পড়ার কথা কখনো বলতে হয় না। আজ অবধি কারোর কাছ থেকে কোনরকম নালিশ শুনতে হয়নি ওর বিরুদ্ধে। কিন্তু ভীষণ লাজুক অথবা গম্ভীর হয়ে থাকে ছেলেটা। এই বয়সে ওরকম মানায় না। জোর

করে বিকেলে স্কুলের মাঠে পাঠাচ্ছেন ওকে, খেলাধূলা না করলে শরীর ঠিক থাকবে কি করে! ক্রমশ মাথা চাড়া দিচ্ছে ওর শরীর, এই সময় ব্যায়াম দরকার।

অনিমেষ শুনেছিল দাদু সেকালে ফার্স্ট ক্লাস অবধি পড়েছিলেন। কলেজে যাননি কোনদিন। কিন্তু এত ভাল ইংরেজী বুঝিয়ে দিতে পারেন যে ওদের স্কুলের রজনীবাবু অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। একবার প্রতিশব্দ লিখতে বলেছিলেন রজনীবাবু। অনিমেষ বাড়িতে এসে দাদুকে জিজ্ঞাসা করতে একটা শব্দের পাঁচটা প্রতিশব্দ পেয়ে গেল।

রজনীবাবুর মুখ দেখে ক্লাসে বসে পরদিন অনিমেষ বুঝতে পেরেছিল তিনি নিজেও অতগুলো জানতেন না। ছোট ডিক্‌শনারিতে অতগুলো না পেয়ে রজনীবাবু ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কোত্থেকে ও এসব লিখেছে? অনিমেষের-মুখ থেকে শুনে রজনীবাবু বিকেলে এসে দাদুর সঙ্গে আলাপ করে গিয়েছিলেন।

ম্যাকফার্সন সাহেব দাদুকে একটা ডিক্‌শনারী দিয়েছিলেন যার ওজন প্রায় দশ সের হবে, অনিমেষ দু'হাতে কোনক্রমে এখন সেটাকে তুলতে পারে। রজনীবাবু মাঝে মাঝে এসে সেটা দেখে যান।

শেষ পর্যন্ত কিছুই চেপে রাখা গেল না। সরিৎশেখর যতই আড়াল করুন মহীতোষের বিয়ের আঁচ এ বাড়িতে লাগতে আরম্ভ করল। মহীতোষ নিজে আসছেন না বটে কিন্তু তাঁর হবু শ্বশুরবাড়ির লোকজন নানারকম কথাবার্তা বলতে সরিৎশেখরের কাছে না এসে পারছেন না। সরিৎশেখর সকালে বাজারে গিয়ে একগাদা মিষ্টি নিয়ে আসেন, কখন কে আসে বলা যায় না। হেমলতা তা দিয়ে অতিথি আপ্যায়ন করেন।

মেয়ের বাড়ি থেকে যাঁরা আসেন তাঁরা অনিকে দেখে একটু অস্বস্তির মধ্যে থাকেন সেটা অনি বেশ টের পায়। দাদু পিসীমা ওকে মুখে কিছু না বললেও ও যে ব্যাপারটা জেনে গেছে সেটা বুঝতে পেরে গেছেন।

অনির ধারণা ছিল বিয়ে হলে খুব ধুমধাম হয়, অনেক আত্মীয়স্বজন আসে, কিন্তু ওদের বাড়িতে কেউ এল না। শুধু এক বিকেলে সরিৎশেখরের বন্ধু সাধুচরণ এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে সরিৎশেখরের কাছে এলেন। ওঁদের সাজগোজ দেখে কেমন সন্দেহ হল অনিমেষের, পা টিপে টিপে ও

দাদুর ঘরের জানালার কাছে এসে কান পাতল।

সাধুচরণ বলছিলেন, 'সব ঠিকঠাক আছে, এবার আপনাকে যেতে হয়।'

সরিৎশেখর বললেন, 'সন্ধ্যে সন্ধ্যে বিয়েটা হয়ে যাবে আশা করি, আমি আবার আটটার মধ্যে শুয়ে পড়ি।'

বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যাঁ, সন্ধ্যেবেলাতেই বিয়ে; আপনি খাওয়া-দাওয়া সেরে তাড়াতাড়ি ফিরতে পারবেন।'

সরিৎশেখর বললেন, 'খাওয়া-দাওয়া? না বেয়াই মশাই, আমি তো খেতে পারব না। আমাকে এ অনুরোধ করবেন না।'

বৃদ্ধ বললেন, 'সে কি? তা কখনো হয়?'

সরিৎশেখর বললেন, 'হয়। আমার বাড়িতে আমার নাতি আছে যাকে আমরা এই বিয়ের কথা জানাইনি। তাকে বাদ দিয়ে আমি কোন আনন্দ-উৎসবে আহার করতে অক্ষম।'

বৃদ্ধ বললেন, 'কিন্তু তাকে তো আপনি নিজেই নিয়ে যেতে চাননি।'

সরিৎশেখর বললেন, 'ঠিকই। ঐ অনুষ্ঠানে ওর উপস্থিতি কি কারো ভালো লাগবে? তাছাড়া একজনকে যখন এনেছিলাম তখন অনেক আমোদ-আহ্লাদ করেছি তবু তাকে কি রাখতে পারলাম! ওসব কথা যাক। পাত্রের পিতা হিসেবে আমার কর্তব্যটুকু করতে দিন, এর বেশী কিছু বলবেন না।'

অনি শুনল দাদু গলা চড়িয়ে ডাকছেন, 'হেম, হেম।'

রান্নাঘর থেকে সাড়া দিতে দিতে পিসীমা এ ঘরের দরজা অবধি এসে থেমে গেলেন, 'কি বলছেন?'

'আমি চললাম, সেই হারটা দাও তো।'

'ঐ তো, আপনার ড্রয়ারের মধ্যে আছে। কিন্তু আপনি জামা-কাপড়া পাল্টাবেন না? এরকম ময়লা পাঞ্জাবি পরে লোকে বাজারে যায়, বরকর্তা হয়ে যায় নাকি!'

অনি ড্রয়ার খোলার আওয়াজ পেল। তারপর শুনল দাদু বলছেন, 'আমি আটটার মধ্যে ফিরে আসব। অনিকে বলো ও যেন আমার জন্য অপেক্ষা করে, একসঙ্গে খাব।'

পায়ের শব্দ পেতেই অনি দ্রুত সরে এল। আড়ালে দাঁড়িয়ে ও দেখল সাধুচরণ আর সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দাদু বাইরে বেরিয়ে এলেন। পিসীমার

গলায় 'দুর্গা দুর্গা' শুনতে পেল সে।

সাধুচরণ ও সেই ভদ্রলোকের পাশে দাদুকে একদম মানাচ্ছে না। লংক্লথের ময়লা পাঞ্জাবি, হাঁটুর নিচ অবধি ধুতি, লাঠি হাতে দাদু ওঁদের সঙ্গে হেঁটে গলির বাঁক পেরিয়ে গেলেন। দরজা বন্ধ করে পিসীমা ডাকলেন, 'অনি, অনিবাবা।'

সঙ্গে সঙ্গে অনিমেষ সোজা হয়ে দাঁড়াল। দাদু কোথায় যাচ্ছেন সেটা বুঝতে পেরে ওর অসম্ভব কৌতূহল হতে লাগল। চট করে এপাশ ওপাশ দেখে নিয়ে বারান্দায় ছেড়ে রাখা চটিজোড়া এক হাতে তুলে ও লাফ দিয়ে ভেতরের বাগানে নেমে পড়ল।

বাড়ির পেছন দিয়ে দৌড়ে ও যখন গলির মুখে এসে দাঁড়াল, ততক্ষণে সরিৎশেখররা টাউন ক্লাব ছাড়িয়ে গেছেন। দূর থেকে তাঁদের দেখতে পেয়ে নিশ্চিন্তমনে হাঁটতে লাগল ও।

এখন প্রায় শেষ-বিকেল। টাউন ক্লাবের মাঠে ফুটবল খেলা চলছে। রাস্তাটায় লোকজন বেশী, নিরাপদ দূরত্বে অনিমেষ হাঁটছিল। সাধুচরণ একটা রিকশা দাঁড় করিয়ে কি বলতে সরিৎশেখর ঘাড় নাড়লেন। অনিমেষ জানে দাদু রিক্‌শায় উঠবেন না। শরীর ঠিক থাকলে দাদুকে রিক্‌শায় ওঠানো সহজ নয়। অবশ্য এখন যদি দাদু রিক্‌শায় উঠতেন তাহলে অনিমেষ কিছুতেই আর নাগাল পেত না। রিক্‌শায় না ওঠাঁর জন্য সময় সময় ওর দাদুর ওপর খুব রাগ হতো, কিন্তু এখন এই মুহূর্তে ওর খুব ভাল লাগল।

দাদুর সঙ্গে হেঁটে তাল রাখতে পারছেন না সাধুচরণ। সঙ্গের ভদ্রলোকটি প্রায় দৌড়চ্ছেন। বড় বড় পা ফেলে চলেছেন সরিৎশেখর লাঠি দুলিয়ে।

সাধুচরণকে ও কোনদিন দাদু বলতে পারল না। এর জন্য অবশ্য হেমলতা অনেকটা দায়ী। প্রথম থেকেই সাধুচরণকে ভালভাবে দেখেননি হেমলতা। নিজের মেয়েকে যে কষ্ট দেয়, সে মেয়ে মরে গেলে তো কষ্ট পাবেই না — এটা তো জানা কথা কিন্তু তা বলে পাঁচজনকে বলে বেড়াবে, অর্ধমুক্তি হল আত্মার! বাকি অর্ধেকটা যেন স্ত্রীর মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছে। হেমলতা কোনদিন ওকে কাকা জ্যাঠা বলতে পারেননি। সেটাই রপ্ত করেছিল অনি। সামনাসামনি কিছু বলত না কিন্তু আড়াল হলেই পিসীমার মত নাম ধরে বলা অভ্যাস করে ফেলল।

ঝোলনা পুল পার হয়ে করলা নদীর ধার দিয়ে ওঁদের থানার দিকে যেতে দেখে অনি দূরত্বটা বাড়িয়ে দিল। এখানে রাস্তাটা অনেকখানি সোজা, চট করে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকালে ও ধরা পড়ে যাবে।

ঝোলনা পুলে উঠতে ওর বেশ মজা লাগে। দুটো মোটা তারের ওপর পুলটা বাঁধা, বেশ দোলে। নিচে করলা নদীর জল কচুরিপানায় একদম ঢাকা পড়ে আছে। এখনো সন্ধ্যে হয়নি। দাদুদের ওপর চোখ রেখে পুলের মাঝামাঝি এসে নতুন স্যারের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। পুলের তারের জালে হেলান দিয়ে নতুন স্যার দাঁড়িয়ে আছেন। ওঁকে দেখে নতুন স্যার হাসলেন, 'কোথায় যাচ্ছ অনিমেষ?'

কি বলবে বুঝতে না পেরে অনি বলল, 'বেড়াতে।'

'ও, তোমাদের এই নদীটাকে আমার খুব ভালো লাগে, জানো! কেমন চুপচাপ বয়ে চলে যায়। অথচ এর নাম কেন একটা তেতো ফলের নামে রাখল বল তো?' নতুন স্যার বললেন।

অনি দেখছিল দাদুরা খুব দ্রুত দূরে চলে যাচ্ছেন। কিছু বলার দরকার তাই বলল, 'করলা খেলে তো রক্ত পরিষ্কার হয়।'

'গুড!' খুব খুশী হলেন নতুন স্যার, 'এই নদী শহরের দূষিত রক্ত পরিষ্কার করছে। এককালে এসব জায়গায় দেবী চৌধুরানী নৌকো নিয়ে বেড়াতেন। ইংরেজদের সঙ্গে ওঁর খুব যুদ্ধ হয়েছিল। তিস্তার পাড়ে এখনও নাকি একটা কালী-মন্দির আছে যেটা শুনেছি ওঁরই প্রতিষ্ঠিত। তুমি দেবী চৌধুরানীর নাম শুনেছ?'

অনি ঘাড় নাড়ল, 'না।'

নতুন স্যার বললেন, 'ঠিক আছে, তোমাকে পরে একদিন ওঁর কথা বলব। আজ বরং তোমাকে একটা বই দিই। এটা চিরকাল তোমার কাছে রেখে দেবে।'

অনি দেখল নতুন স্যার তাঁর কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে একটা বই বের করে ওর দিকে এগিয়ে দিচ্ছেন। বইটার মলাটে পাগড়ি পরা একজন মানুষের মুখ যাকে দেখলে মারোয়াড়ী দোকানদার বলে মনে হয়। আর ওপরে লেখা রয়েছে আনন্দমঠ, নিচে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

নতুন স্যার বললেন, 'ইনি হলেন আমাদের সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র। আর এই বই হল ভারতের স্বাধীনতার বীজমন্ত্র বন্দেমাতরমের উৎস। এই বই না পড়লে দেশকে জানা যাবে না, আমাদের ইতিহাসকে জানা যাবে না। এই বই-এর নাম বন্দেমাতরমও হতে পারত।'

বইটা থেকে মুখ তুলে অনি দেখল থানার রাস্তায় দাদুদের কাউকে আর দেখা যাচ্ছে না। করলার ওপর আবছায়া সন্ধ্যার অন্ধকার কোন ফাঁকে চুঁইয়ে নেমে এসেছে। হঠাৎ কোন কথা না বলে বই বগলে কবে ও দৌড়তে লাগল। নতুন স্যার খুব অবাক হয়ে ওকে কিছু বললেন কিন্তু সেটা শোনার জন্য সে দাঁড়াল না।

রাস্তাটা বাঁধানো নয়, একরাশ ধুলো উড়িয়ে ও থানার পাশে এসে দাঁড়াতেই ঢং ঢং করে পেটা ঘড়িতে শব্দ হতে লাগল। এখান থেকে রাস্তা দুই ভাগ হয়ে গিয়েছে। কোন রাস্তা দিয়ে দাদু গিয়েছেন কি করে বোঝা যাবে? হঠাৎ খেয়াল হল সেদিন দাদু হোটেলের কথা বলছিলেন। থানার ওপাশে কি একটা হোটেলের সাইনবোর্ড দেখেছিল ও একদিন। সেদিকেই পা চালাল অনি।

এখন সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে। রাস্তায তেমন আলো নেই। দুই একটা রিক্‌শা ছাড়া লোকজন কম যাওয়া-আসা করছে। থানার সামনে দুটো সিপাই বন্দুক ঘাড়ে করে দাঁড়িয়ে ওব দিকে তাকিয়ে আছে। একা সন্ধ্যেবেলায় এইদিকে কখনো আসেনি ও। আনন্দমঠটা দুহাতে চেপে ধরে সামনে দিয়ে হেঁটে এল অনি। সামনেই একটা বিরাট বটগাছ, তার তলায় ভুজাওয়ালার দোকান।

অনি গাছের তলায় চলে এল। এদিকে আলো নেই একদম, শুধু ভুজাওয়ালার দোকানের সামনে একটা গ্যাস পাইপ জ্বলছে। সেই আবছায়া অন্ধকারে দাঁড়িয়ে অনি দেখল বেশ কিছু লোক হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। একটা কালো রঙের গাড়ির সামনের সিটে দাদু বসে আছেন। দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর মধ্যে সাধুচরণ ছাড়া স্বর্গছেঁড়ার মনোজ

হালদার, মালবাবুকে দেখতে পেল ও। একটু বাদেই অনি অবাক হয়ে দেখল কয়েকজন লোক মহীতোষকে দুপাশে ধরে হোটেলের সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে আনছে। বাবাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে এখন। এক হাতে টোপর, ধুতি কুঁচিয়ে ফুলের মত অন্য হাতে ধরা, কপালে চন্দনের ফোঁটা, পাঞ্জাবিটা কেমন চকচক করছে আলোয়।

বাবা এসে গাড়ির পিছনে উঠে বসলেন। সাধুচরণ আর সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক মালবাবুকে নিয়ে গাড়িতে উঠলেন। গাড়িটা কিন্তু হুস করে চলে যেতে পারল না। কারণ গাড়ির সামনে ধুতি পাঞ্জাবি পরা লোকজন হেঁটে যেতে লাগল পথ চিনিয়ে। সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে অনি গাড়িটাকে প্রায় ওর সামনে দিয়ে যেতে দেখল। দাদু গম্ভীরমুখে বসে আছেন। বাবা হেসে মালবাবুকে কি বলছেন। মুখ ফেরালেই ওঁরা ওকে দেখে ফেলতে পারতেন। দেখতে পেলে কি বাবা ওকে বকতেন?

হঠাৎ ওর মনে পড়ল বাবার এইরকম পোশাক-পরা একটা ছবি স্বর্গছেঁড়ার বাড়িতে মায়ের অ্যালবামে আছে। মা বলতেন, বিয়ের ছবি। আনন্দমঠ জড়িয়ে ধরে অনি চুপচাপ গাড়ির খানিক পেছনে হাঁটতে লাগল।

গলির মুখটায় বেশ ভিড়, গাড়ি ঢুকল না। তিন-চারটে গোরা মতন মেয়ে শাঁখ বাজাতে বাজাতে এসে বাবাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে নিয়ে গেল, তারপর ভিড়টা সিনেমা হলে ঢোকার মত গলির ভেতর চলে গেল।

এখন চারিদিক বেশ অন্ধকার। এ রাস্তায় আলো নেই, শুধু বিয়েবাড়ি বলে গলির মুখে একটা হ্যাজাক ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনির খুব কৌতূহল হচ্ছিল ভিতরে গিয়ে দেখতে সেখানে কি হচ্ছে! বাবা যখন মাকে বিয়ে করতে গিয়েছিল তখনও কি এইরকম ভিড় হয়েছিল? এইরকম আলো দিয়ে মায়েদের বাড়ি সাজানো হয়েছিল? মা বেঁচে থাকলে বাবা আর বিয়ে করতে পারতো না এটা বুঝতে পারে অনি। কিন্তু এখন, এই একটু আগে বাবাকে যখন মেয়েরা গাড়ি থেকে নামিয়ে নিয়ে গেল তখন তো একদম মনে হল না বাবার মনে কষ্ট আছে! বউ মরে গেলে যদি আবার বিয়ে করা যায় তো পিসীমা কেন বিয়ে করেনি? পিসীমা তো আবার শাড়ি পরে মাছ খেতে পারতো। আজন্ম দেখা পিসীমার চেহারাটায় ও মনে মনে শাড়ি সিঁদুর পরিয়ে হেসে ফেলল, দ্যুৎ, পিসীমাকে একদম মানায় না। ঠিক ওইসময় ও শুনতে পেল কে যেন ওর দিকে এগিয়ে আসতে আসতে

জিজ্ঞাসা করছে, 'কি চাই খোকা? এখানে দাঁড়িয়ে কি করছ?'

অনিমেষ কি বলবে মনে মনে তৈরি করতে না করতে লোকটা এসে দাঁড়াল সামনে, 'নেমন্তন্ন খেতে এসেছ তো এখানে দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে যাও।'

লোকটা ওর পিঠে হাত রেখে বলছে, 'ভেতরে যাও।' এখন তো ও বেশ সহজে যেতে পারে। কিন্তু বাবা, দাদু—অনিমেষ এক পা এগিয়ে আবার থমকে দাঁড়াল।

'কি হল, দাঁড়ালে কেন? যাও।' লোকটা কথাটা শেষ করতেই ওর মনে হল এবার এক ছুটে পালিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু ততক্ষণে একটা সন্দেহ এসে গেছে লোকটাব মনে, 'তোমার নাম কি? কোন বাড়িতে থাক?'

'আমি এখানে থাকি না।' অনিমেষ বলল।

'কোন পাড়ায় থাক? কার সঙ্গে এসেছ?'

'আমি নেমন্তন্ন খেতে আসিনি।' অনিমেষ প্রায় কেঁদে ফেলল।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটার চেহারা পালটে গেল, 'তাহলে এখানে ঘুরঘুর করছিস কেন? চুরিচামারির ধান্দা, অ্যাঁ? যা ভাগ।'

অনিমেষ দেখল লোকটা চড় মারার ভঙ্গীতে একটা হাত উপরে তুলেছে। নিজেকে বাঁচাবার জন্য সরে যেতে না যেতেই লোকটা খপ করে ওর হাত ধরল, 'তোর হাতে এটা কি! বই? কোত্থেকে মেরেছ বাবা!' প্রায ছোঁ মেরে বইটা কেড়ে নিয়ে লোকটা বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে উচ্চাবণ করল, 'আনন্দমঠ, অ্যাঁ? ধান্দাটা কি?'

'আমার বইটা দিন।' অনিমেষ কোনরকমে বলল।

'অ্যাই চোপ্। যা পালা এখান থেকে।' লোকটা তেড়ে উঠতে পেছন থেকে আর একটা গলা শোনা গেল, 'কি হয়েছে শ্যামসুন্দব? চেঁচাচ্ছ কেন?'

'আরে এই ছোকরা তখন থেকে ঘুরঘুব করছে, এ পাড়ায় কোনদিন দেখিনি।' লোকটা মুখ ফিরিয়ে বলল।

'খুব সাবধান। আজকাল চোর-ডাকাতের দল এইসব বাচ্চা ছেলেকে পাঠিয়ে খবরাখবর নেয়।'

অনিমেষ দেখল একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক ওদের দিকে এগিয়ে আসছে।

হঠাৎ মাথা গরম হয়ে গেল ওর। শ্যামসুন্দর নামে লোকটা কিছু বোঝার

আগেই ও ঝাঁপিয়ে পড়ে হাত থেকে আনন্দমঠটা ছিনিয়ে নিল। এত জোরে লাফিয়ে উঠেছিল অনিমেষ যে শ্যামসুন্দর ব্যালেন্স রাখতে না পেরে ঘুরে মাটিতে পড়ে গিয়ে 'ওরে বাপরে বাপ' বলে চিৎকার করে অনিমেষকে জড়িয়ে ধরতে গেল। বেটাল হয়ে অনিমেষ মাটিতে পড়তে পড়তে কোনরকমে শ্যামসুন্দরের মুখে একটা পেনালটি শট কষিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

অনিমেষকে ছেড়ে দিয়ে নিজের মুখ দুহাতে চেপে 'ডাকাত ডাকাত' বলে শ্যামসুন্দর চেঁচাচ্ছে আর সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক হঠাৎ গলা ফাটিয়ে একটা বিকট শব্দ তুলতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে গলির ভিতরে অনেকগুলো গলায় হইহই আওয়াজ উঠল। অনিমেষ দেখল পিল পিল করে লোকজন বেরিয়ে আসছে গলি দিয়ে। আর দাঁড়াল না অনিমেষ, এক হাতে বইটা সামলে প্রাণপণে ছুটতে লাগল সামনের রাস্তা ধরে। কেউ পালিয়ে গেছে এটা বুঝতে পেরে শোরগোল বেড়ে গেল। বেশ কয়েকজন তার পিছনে ছুটে আসছে। কি করবে বুঝতে না পেরে ও একটা অজানা অন্ধকার গলির ভেতর ঢুকে পড়ল।

কতক্ষণ দৌড়েছিল সে জানে না, যখন বাড়িতে পৌছালো তখন শরীরে একফোঁটা শক্তি নেই। পেছনে যারা তাড়া করছিল তারাও হাল ছেড়ে দিয়েছে। নিজের বাড়ির বারান্দায় বসে বইটা রাখতেই সেটার পাতা খুলে গেল। অনেকক্ষণ বাদে একটু শান্ত হযে সে বইটাকে তুলে নিল। তার মনে পড়ল নতুন স্যার বলেছেন এই বই-এর নাম বন্দেমাতরম্‌ও হতে পারত।

সে চোখ বন্ধ করে বলল, বন্দেমাতরম্‌।

দাদুর সঙ্গে চলে আসার পর আর স্বর্গছেঁড়ায় যায়নি অনিমেষ। মহীতোষ এর মধ্যে অনেকবার এসেছেন জলপাইগুড়িতে। প্রত্যেকবারই স্ত্রীকে নিয়ে এসেছেন, রাত্রে থাকেন নি কখনো, বেলায় বেলায় চলে গিয়েছেন।

হেমলতা বলেছিলেন, 'মা না বলতে পারিস তুই, নতুন মা বলে ডাকিস, অনি। আমিও তাই বলতাম। হাজার হোক মা তো।'

ওরা এলে ধারেকাছে থাকত না অনি। প্রথম দিকে কেমন একটা অস্বস্তি, পরে লজ্জা-লজ্জা করত। অথচ ওঁরা আসবেন ছুটির দিন দেখে যখন অনিকে বাড়িতে থাকতেই হয়। মহীতোষ বাড়ি এসে বেশির ভাগ সময় তাঁর বাবার সঙ্গেই গল্প করেন, চা-বাগানের বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ নেন। সেই সময় তাঁর স্ত্রী রান্নাঘরে হেমলতার পাশে গিয়ে বসে থাকে। মেয়েটির বয়স অল্প এবং হেমলতা প্রথম আলাপেই বুঝে গিয়েছিলেন, একদম মারপ্যাঁচ নেই মেয়েটার মধ্যে। এই একটা ব্যাপারে সাধুচরণ সত্যি কথা বলেছিলেন, মেয়েটির স্বভাবের সঙ্গে মাধুরীর যথেষ্ট মিল আছে। চিবুকের আদলটায় তো মাধুরী বসানো, সেই রকমই হাবভাব। তবে মাধুরী একটু ফরসা ছিল এই যা।

প্রথম কদিন তো একদম কথাই বলেনি। হেমলতা তিনবার জিজ্ঞাসা করলে একবার উত্তর পান। সে সময় কি কারণে মহীতোষ এদিকে এসেছিলেন, হেমলতা তাঁকে ডেকে বললেন, 'ও মহী, তোর বউ-এর বোধ হয় আমাকে পছন্দ হয়নি, আমার সঙ্গে একদম কথা বলে না।'

মহীতোষ উত্তর দেননি কিছু, চুপচাপ চলে গিয়েছিলেন ঘর থেকে। তাঁর চলে যাওয়া বুঝতে পেরে খুব আস্তে অথচ দ্রুত নতুন বউ বলে উঠেছিল, 'আমার ভয় করে।'

'ভয়! ভয় কেন?' অবাক হয়েছিলেন হেমলতা।

মাথা নিচু করে নতুন বউ বলেছিল, 'আমি যদি দিদির মত না হই!'

ব্যাস। সঙ্গে সঙ্গে জল হয়ে গেলেন হেমলতা। মহীতোষের বিয়ে করাটা উনি একদম পছন্দ করেননি সেটা সবাই জানে। নতুন বউ এলে একটা দূরত্ব রেখে গেছেন এই কয়দিন, কখনো অনিকে বলেননি কাছে আসতে। এক সেই প্রথমদিন ওঁরা যখন জোড়ে এলেন, বউ এসে তাঁকে প্রণাম করল, কানের দুল দিয়ে আশীর্বাদ করলেন যখন তখন সরিৎশেখর অনিকে ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। ছেলেটা আগাগোড়া মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে থেকে ওঁদের প্রণাম করে চলে গেল। শ্বশুরের সামনে তখন নতুন বউ একমাথা ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে। এখন এই মেয়েটার কথা শুনে বুকটা কেমন করে উঠল হেমলতার। মাধুরীর মুখটা ভাবতে গিয়ে কাঁপুনি এল শরীরে। কোন রকমে নিজেকে সামলে বললেন, 'তোমার নামটা আমার একদম ভাল লাগে না বাপু, আমি তোমাকে কিন্তু মাধুরী বলে ডাকব।'

সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে ওঁর দিকে তাকিয়েছিল নতুন বউ। হেমলতা দেখছিলেন দুটো বড় বড় চোখ ওঁর দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে হেমলতা দেখলেন একটু একটু করে জল গড়িয়ে এসে চোখের কোণায় জমা হচ্ছে। খুব বড় একটা অন্যায় করে ফেলেছেন বুঝতে পেরে গেছেন ততক্ষণে। সরিৎশেখর চিরকাল তাঁকে বকাবকি করেছেন পেট-আলগা ব'লে, মনে যা আসে মুখে তা না বললে স্বস্তি পান না হেমলতা। এই মেয়েটাকে মাধুরী বলে ডাকলে মনটা শান্ত হবে ভেবেই কথাটা বলেছিলেন।

খপ করে নতুন বউ-এর হাতটা ধরলেন হেমলতা, 'রাগ করলি ভাই, আমি তোকে সত্যি বলছি, দুঃখ দিতে চাইনি।'

নতুন বউ-এর তখন গলা ধরে গেছে, 'আপনি আমাকে যা খুশি ডাকুন।'

হেমলতা বললেন, 'দেখি তোর একটা পরীক্ষা নিই। কাল রাত্রে পায়েস করেছিলাম। অনির জন্য একবাটি সরপাতা হয়ে আছে। ওটা নিয়ে ছেলেটাকে খাইয়ে আয় দেখি। বেলা হয়ে গেল।'

কথার নেশায় হেমলতা কখন টপ করে যে তুইতে নেমে এসেছেন নিজেই বুঝতে পারেন নি। বযসে ছোট কাউকে যদি ভাল লেগে যায় তাহলে তাকে তুই না বললে একদম সুখ হয় না তাঁর।

ঘরের কোণায় মিটসেফের ভিতর পায়েসের বাটিগুলো চাপা দেওয়া আছে। আগের সন্ধ্যেবেলায় রাঁধা পায়েস এক-একটা বাটিতে ঢেলে রেখে দেন হেমলতা। নাড়াচাড়া না হওয়ায় বাটিগুলোতে পায়েস জমে গিয়ে পুরু সর পড়ে যায়। সরিৎশেখরের ভালবাসার জিনিসের মধ্যে এখন এই একটা জিনিস টিকটিক করে বেঁচে রয়েছে। ভাল দুধ পাওয়া যায় না এখানে, স্বর্গছেঁড়ায় যখন পায়েস রান্না হত সাত বাড়ির লোক টের পেত। কালানোনিয়া চালের গন্ধে চারধার ম-ম করত। সরিৎশেখর নিজেই এক জামবাটি পায়েস দু বেলা খেতেন। দাদুর এই সখটা পেয়েছে নাতি, পায়েস খেতে বড় ভালবাসে ছেলেটা।

আজ মহীতোষরা আসবেন বলে প্রত্যেকের জন্য আলাদা বাটিতে পায়েস রেঁধে রেখেছেন হেমলতা। সকালে দেখেছেন সেগুলো জমে গিয়েছে বেশ। বিভিন্ন সাইজের বাটি আছে মিটসেফে। নতুন বউ উঠে দাঁড়ালে তিনি মিটসেফটা ওকে দেখিয়ে দিলেন।

বুক সমান মিটসেফের দরজা খুলে নতুন বউ সেদিকে তাকাতেই হেমলতা আড়চোখে দেখতে লাগলেন। অনির মন অল্পে ভরে না, ছোট বাটিতে পায়েস দিলে চেঁচামেচি করবেই। নতুন বউ কোন্ বাটিটা তোলে দেখছিলেন তিনি, মন বোঝা যাবে। দেওয়ার হাতটা টের পাওয়া যাবে। মেয়েটার বুদ্ধি আছে, মনে মনে খুশি হলেন হেমলতা। বড় তিনটে বাটির একটাকে বের করে আনল নতুন বউ, ছোট দুটোতে হাত ছোঁয়াল না। যাক, অনিটার কখনো কষ্ট হবে না। চামচটাও মনে করে নিল।

হেমলতা বললেন, 'বড় বাড়িতে রয়েছে ও, তুই গিয়ে ভাল করে আলাপ করে পায়েস খাইয়ে আয়।' এক পা হেঁটে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল নতুন বউ। কিছু একটা বলব বলব করে যেন বলতে পারছিল না। সেটা বুঝতে পেরেই যেন হেমলতা বললেন, 'কি হল, আরে বাবা নিজের ছিলের কাছে যাচ্ছিস লজ্জা কিসের! অনি বড় ভাল ছেলে, মনটা খুব নরম। নে যা, আমি আর বকবক করতে পারছি না, উনুন কামাই যাচ্ছে।'

নতুন বউ এদিকটায় কখনো আসেনি। বিরাট বারান্দা পেরিয়ে সার দেওয়া ঘরগুলোর কোনটায় অনিমেষ আছে বুঝে উঠতে সময় লাগল তার। দরজাটা ভেজানো ছিল। হঠাৎ তার মনে হল শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছে, হাতে কোন সাড় নেই। এ বাড়িতে যেদিন প্রথম এসেছিল সেদিনও এ রকম মনে হয়নি। এতবড় একটা ছেলে যাঁর তাঁকে বিয়ে করতে কখনই ইচ্ছে হয়নি তার, তবু বিয়েটা হয়ে গেল। আর বিয়ের পর ইস্তক অহরহ যার নাম শুনছে ও, সে হল এই ছেলে। মহীতোষের কথাবার্তায় বুঝতে পেরেছে ছেলের মন জয় করতে মহীতোষ স্ত্রীকে যেন পরোক্ষভাবে নির্দেশ দিচ্ছেন। কিন্তু সেটা কি করে হয়! আজ অবধি জেনেশুনে কোন মন জয় করার চেষ্টা ওকে করতে হয়নি। সেটা কি করে করতে হবে মহীতোষ তাকে শিখিয়ে দেয়নি কিন্তু। ভেজানো দরজাটা ঠেলল নতুন বউ।

বাবা এবং নতুন মা এসেছেন জানতে পেরে অনি চুপচাপ করে বসেছিল। পিসীমার নির্দেশমত ও মনে মনে নতুন মা শব্দটাকে অনেকখানি রপ্ত করে নিয়েছে কিন্তু ব্যবহার করেনি। দূর থেকে কয়েকবার নতুন মাকে ও দেখেছে। এর আগে ওঁরা যখন এসেছেন তখন দুপুরের খাওয়ার সময় বাবা আর দাদুর পাশে বসে খেতে খেতে মাথা নিচু করে আড়চোখে দেখেছে, একটা রঙিন শাড়ি রান্নাঘরের দরজার অনেকটা আড়ালে দাঁড়িয়ে

রয়েছে। খাওয়ার সময় বসে থাকাটা অত্যন্ত খারাপ লাগে অনির। বাবা যেন না বললে নয় এরকম দু'একটা প্রশ্ন করেন। কত তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করতে পারবে সেই চেষ্টা চালিয়ে যায় অনি। পিসীমা পরিবেশন করে বলে স্বস্তি পায় ও। এতদিন যা মনে হয়নি, আজ ওঁরা যখন রিক্‌শা থেকে নামলেন তখন অনি খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। বাথরুমে টিনের বালতিতে ওর জামাকাপড় জলে ভিজিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে আসছিল পড়তে, এমন সময় রিক্‌শাটা বাড়ির সামনে এসে থামে। মহীতোষ রিক্‌শাওয়ালাকে পয়সা দিচ্ছিলেন যখন তখন নতুন মা রিক্‌শা থেকে নেমে ঘোমটা ঠিক করে বাড়ির দিকে তাকাল। তার তাকানোর ভঙ্গীটা অনিকে কেমন চমকে দিল। ওর মনে যেটুকু আছে, মাধুরী এইরকম ভাবে তাকাতেন। এক ছুটে নিজের ঘরে চলে গিয়েছিল অনি, কেউ ওকে লক্ষ্য করেনি।

কালকের পড়া হয়ে গিয়েছিল। খুব একটা আটকে না গেলে ও পড়া বুঝতে সরিৎশেখরের কাছে যায় না। এমনিতে দাদু খুব ভাল কিন্তু পড়াতে গেলেই চট করে এমন রেগে যান যে অনিকে অবশ্যই চড়-চাপড় খেতে হয়। সে সময় ওঁর চেহারাই অন্যরকম হয়ে যায়। একটা সাধারণ ইংরেজী শব্দ অনি কেন বুঝতে পারছে না এই সমস্যাটা এত প্রবল হয়ে ওঠে যে সেটা সমাধান করতে প্রহার ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সামনের বছর থেকে মাস্টার রাখবেন মহীতোষ। সরিৎশেখরকে এ রকম বলতে শুনেছে ও। পিসীমাকে অনি বলেছে যদি মাস্টার রাখতেই হয় তাহলে নতুন স্যারকে যেন রাখা হয়।

অনি দেখল দরজাটা খুলে গেল, এক হাতে বাটি নিয়ে নতুন মা দাঁড়িয়ে আছে। চোখাচোখি হতে মুখ নিচু করল অনি। এ ঘরে কেন এসেছে নতুন মা? ও তো কাউকে বিরক্ত করতে যায়নি। যেন কিছুই দ্যাখেনি এই রকম ভঙ্গী করে অনি সামনে খুলে রাখা একটা বই-এর দিকে চেয়ে থাকল।

'পায়েসটা খেয়ে নাও।' বড়দের মতন নয়, একদম ওদের মত গলায় কথাটা শুনতে পেল অনি। অবাক হয়ে তাকাল ও। পায়েস খেতে ওর খুব ভাল লাগে কিন্তু জ্ঞান হওয়া অবধি রান্নাঘরের বাইরে ভাতের সকড়ি এ বাড়িতে কাউকে আনতে দ্যাখেনি। পিসীমা এ ব্যাপারে ভীষণ খুঁতখুঁতে। জামা-কাপড় না ছেড়ে পায়খানায় গেলে চিৎকার করে পাড়া মাত করে দেন। পায়েস শোয়ার ঘরে বসে খেতে দেবেন, এ একেবারেই অবিশ্বাস্য।

হয়তো পিসীমা জানেন না, নতুন মা না বলে নিয়ে এসেছে। উলটো ব্যাপারটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করল না অনিমেষের।

খুব আস্তে ও বলল, 'আমি শোয়ার ঘরে পায়েস খাই না।'

থতমত হয়ে গেল নতুন বউ। কথাটা ওর একদম খেয়াল হয়নি, আসার সময় দিদিও বলে দেয়নি। এইটুকুনি ছেলে যে এতটা বিচক্ষণের মত কথা বলতে পারে ভাবতে পারেনি সে, শুনে লজ্জা এবং অস্বস্তি হল। মাথায় বেশ লম্বা ছেলেটা, গড়ন অবিকল মহীতোষের মত। মুখটা খুব মিষ্টি, চিবুকের কাছে এমন একটা ভাঁজ আছে যে দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে। এই ছেলে, এত বড় ছেলের মা হতে হবে, বরং দিদি হতে পারলে ও সবচেয়ে খুশি হত।

চেষ্টা করে হাসল নতুন বউ, তারপর ঘরটা দেখতে দেখতে অনির পাশে এসে দাঁড়াল, 'ঠিক বলেছ, আমার ছাই মাথার ঠিক নেই। যেই শুনলাম তুমি পায়েস খেতে ভালবাস নিয়ে চলে এলাম। একবারও মনে হল না যে এটা রান্নাঘর না, এখানে সকড়ি চলে না। তা এসেছি যখন তখন এক কাজ করা যাক্, আমি হাতে ধরে থাকি তুমি চামচ দিয়ে তুলে তুলে খাও।' পায়েসে গাঁথা চামচসুদ্ধ বাটিটা অনির সামনে ধরল নতুন বউ।

সেদিকে তাকিয়ে অনির জিভে জল প্রায় এসে গেল, কি পুরু সর পড়েছে। কিন্তু কেউ বাটি ধরে থাকবে আর তা থেকে ও খাবে কোনদিন হয়নি। হঠাৎ ও নতুন বউ-এর দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমরা বাঙাল, না?'

হকচকিয়ে গেল নতুন বউ, 'মানে?'

পায়েসের দিকে তাকিয়ে অনি বলল, 'পিসীমা বলেন, বাঙালরা সকড়ি-টকড়ি মানে না?'

খিলখিল করে হেসে ফেলল নতুন বউ। হাসির দমকে সমস্ত শরীর কাঁপছে তার। এই বাড়িতে আসার পর এই প্রথম সে বিয়ের আগের মত হাসতে পারছে। অনির খুব মজা লাগছিল। নতুন মা একদম তপুপিসীর মত করছে। কোন রকমে হাসির দমক সামলে নতুন বউ বলল, 'ঘটি ঘটি ঘটি, বাঙাল বললে চটি।' তারপরেই হঠাৎ গলার স্বর পালটে প্রশ্ন করল, 'তুমি আমার ওপর খুব রাগ করেছ, না?'

মাথা নিচু করল অনি। সেই রাত্রে বাড়িতে ফিরে বারান্দায় দাঁড়ানো

সরিৎশেখরকে সে রেগে-মেগে যে সব কথা বলেছিল তা কি বাবা জানেন? বাবা জানলেই নতুন বউ জানবে। পিসীমা তো কোনদিন অনির সঙ্গে ও ব্যাপারে কথা বলেননি। কিন্তু অনি জানে পিসীমা সব শুনেছিলেন। আবার বউ-এর দিকে ও পূর্ণচোখে তাকাল। শরীর দেখে খুব বড় বলে একদম মনে হয় না। একটুও ভারিক্কি দেখাচ্ছে না কিন্তু এখন যেভাবে ঠোঁট টিপে হাসছে, চট করে মায়ের কথা মনে পড়ে যায়। অনি বলল, 'আমি তোমাকে চিনি না, খামোখা রাগ করতে যাব কেন?'

এক হাতে পায়েসের বাটিটা তখনও ধরা, অন্য হাত অনির চেয়ারের পেছনে রাখল নতুন বউ, 'আমাকে তুমি কি বলে ডাকবে?'

একটু ভেবে অনি বলল, 'তুমি বল?'

'তোমাকে কেউ বলে দেয়নি?'

'হুঁ, বলেছে। পিসীমা বলেছে 'নতুন মা' বলতে।'

খুব ফিসফিস করে শব্দটা উচ্চারিত হতে শুনল অনি।

'তোমার নতুন মা বলে ডাকতে ভাল লাগবে তো?'

অনির কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল। কথাবার্তাগুলো এমনভাবে হচ্ছে যে, অন্য একটা অনুভূতির অস্তিত্ব টের পাচ্ছিল সে।

'অনি, আমাকে তুমি ছোট মা বলে ডাকবে? আমি তো চিরকাল নতুন থাকতে পারব না।'

ঘাড় নাড়ল অনি। নতুন মার চেয়ে ছোট মা অনেক ভাল। মায়ের কথা মনে করিয়ে দেবার জন্যেই যেন ছোট মা বলা।

'তাহলে এই পায়েসটা খেয়ে ফেল।' চামচটা এগিয়ে দিল ছোট মা।

হেসে ফেলল অনিমেষ, 'যদি না খাই?'

কপট নিঃশ্বাস ফেলল ছোট মা, 'কি আর করা যাবে। ভাবব আমার কপাল এই রকম। তোমাকে তো আর বকতে পারব না।'

'কেন? মায়েরা তো বকে।'

'হুঁ, ঠিকই তো। আগে তোমাকে খুউব ভালবাসি, না হলে বকব কি করে। এখন থেকে আমরা কিন্তু বন্ধু হলাম, ঠিক তো?'

ঘাড় নাড়ল অনি, ওর খুব মজা লাগছিল।

'বন্ধু হলে কিন্তু সব কথা শুনতে হয়, বিশ্বাস করতে হয়। আমার আজ অবধি একটাও বন্ধু ছিল না। তুমি আমার বন্ধু হলে।'

হাত বাড়িয়ে চামচটা ধরল সে, পুরু সরের চাদর কেটে এক চামচ পায়েস তুলে মুখে পুরতে পুরতে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি খেয়েছ?'

একগাল হেসে ছোট মা বলল, 'কেন?'

'পিসীমা দারুণ পায়েস রাঁধে, খেয়ে দেখো।' নিশ্চিত বিশ্বাসে বলল অনি, 'মাও এত ভাল পারত না।'

নতুন বউ-এর সঙ্গে অনির ভাব হয়ে গিয়েছে জানতে পেরে মহীতোষ সবচেয়ে খুশি হলেন। হেমলতার মনটা ব্যবহারে বোঝা যায়, নতুন বউ-এর ওপর তাঁর টান বেড়ে গেছে। সরিৎশেখরকে চট করে বোঝা মুশকিল। হেমলতা দুপুরে খাওয়ার সময় পাখার হাওয়া করতে করতে অনেকবার নতুন বউ-এর সঙ্গে অনির ভাবের কথা তুলেছেন। সরিৎশেখর হাঁ-না করেননি। চিরকালই আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে তাঁর একটা আড়াল রাখা সম্পর্ক আছে, মনে কি হচ্ছে বোঝা যায় না। মহীতোষের বিয়ের রাত থেকে এ ব্যাপারে একটা কথাও তাঁর মুখ থেকে বের হয়নি।

এবার মহীতোষরা ফিরে যাবার পর বেশ কিছুদিন আসতে পারলেন না। চা পাতা তোলা হচ্ছে। এখন ফ্যাক্টরীতে দিনরাত মেশিন চলছে। রবিবারেও সময়-অসময়ে ডাক পড়ে। এখন স্বর্গছেঁড়া ছেড়ে কোথাও যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। অ্যানুয়াল পরীক্ষার পর অনির স্কুল এখন ছুটি। কিন্তু নতুন স্যার ওদের প্রত্যেকদিন স্কুলে যেতে বলেছেন। রোজ দুটো থেকে স্কুলের মাঠে মহড়া হচ্ছে। ছাব্বিশে জানুয়ারি আসছে। নতুন স্যার বলেছেন আমরা জন্মেছি পনেরই আগস্ট আর আমাদের অন্নপ্রাশন হবে ছাব্বিশে জানুয়ারি।

ঠিক এই সময় এক দুপুরে অনি সেজেগুজে বেরুচ্ছে, ডাকপিয়ন চিঠি দিয়ে গেল। শীতের এই দুপুরে পশ্চিমে সূর্য চলে গেলে সরিৎশেখর পেছন-বারান্দায় ইজিচেয়ার পেতে শুয়ে থাকেন রোদে গা ডুবিয়ে। ডাকপিয়ন ওঁর হাতে চিঠিটা দিয়ে গেল। খামের ওপর ঠিকানা পড়ে তিনি চিৎকার করে ডাকলেন, 'দাদুভাই, তোমার চিঠি।'

ভেতরের কলতলায় বাসন মাজছিলেন হেমলতা। এখনও স্নান হয়নি তাঁর, জল লেগে পায়ের হাজা জ্বলছে, বাবার চিৎকার শুনে হাত থামিয়ে

বললেন, 'ওমা, অনিকে আবার কে চিঠি দিল!'

ঘর থেকে বেরিয়ে চিৎকার শুনে দাঁড়িয়ে পড়েছিল অনিমেষ। আজ অবধি তাকে কেউ চিঠি দেয়নি। চিঠি দেবার মত বন্ধু তার কেউ নেই।

অবশ্য ওর ঠিকানা স্কুলের অনেকের কাছে আছে। স্কুল বন্ধ হবার সময় যারা বাইরে যায় তারা পছন্দমত ছেলের ঠিকানা নিয়ে যায়। কিন্তু কোনবার চিঠি দেয়নি কেউ তাকে। বিশু আর বাপী যেন কেমন হয়ে গিয়েছে। ওরা কোনদিন তাকে চিঠি দেয়নি। বেশ একটা উত্তেজনা বুকের ভেতরে নিয়ে অনিমেষ বারান্দায় দাদুর কাছে গেল। ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন সরিৎশেখর, এক হাত ওপরদিকে তোলা, তাতে একটা মোটা নীল খাম ধরা। খামটা নিয়ে একছুটে ভিতরে চলে এল ও, এদিক ওদিক চেয়ে সোজা বাগানে নেমে গেল। সুপুরিগাছে বসে একজোড়া ঘুঘু সমানে ডেকে যাচ্ছে। পেয়ারাতলায় এসে খামটা খুলতেই মিষ্টি একটা গন্ধ পেল সে। চট করে মায়ের কথা মনে পড়ে গেল ওর। মার শরীর থেকে ঠিক এরকম গন্ধ বেরুত। মার একটা খুব বড় সেন্টের শিশি ছিল। এই চিঠি যে লিখেছে সেও কি সেই সেন্ট মাখে!

খামের ওপর লেখাটা দেখল ও। গোটা গোটা মুক্তোর মত অক্ষরে তার নাম লেখা দাদুর কেয়ার অফে। নীল আকাশের চেয়ে নীল খামটা সন্তর্পণে খুলতেই ভাঁজ করা কাগজ হাতে উঠে এল। চিঠির বুক চিরে চারটে ভাঁজের রেখা চারদিকে চলে গিয়েছে। চিঠির তলায় চোখ রাখল অনি, 'আমার স্নেহাশিষ জানিও। ইতি, আশীর্বাদিকা, তোমার ছোট মা।'

উত্তেজনাটা হঠাৎ কমে এল অনির। জানা হয়ে গেলে কোন কিছু নতুন থাকে না। উত্তেজনার জায়গায় কৌতূহল এসে জুড়ে বসল। চিঠিটা পড়ল সে, 'স্নেহের অনি। এই পত্র পাইয়া নিশ্চয়ই খুব অবাক হইয়াছ। এখানে আসিয়া শুধু তোমার কথা মনে পড়িতেছে। তুমি নিশ্চয় জান এই সময় তোমার পিতার চাকরিতে ছুটি থাকে না, তাই আমাদের জলপাইগুড়ি যাওয়া হইতেছে না! তাই বলি কি, তোমার যখন পাসের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে তখন আমার নিকট চলিয়া আসিও। এখন তো আমরা বন্ধু, বন্ধুর নিকট বন্ধু আসিবে না?

তোমাকে লইয়া আমি নদীর ধারে বেড়াইব। শুনিতেছি নদী বন্ধ হইবে, উহা কি জিনিস আমি জানি না। কুলগাছে প্রচুর কুল ধরিয়াছে। তুমি জানিয়া

খুশি হইবে কালীগাই-এর একটি নাতনী হইয়াছে। রং সাদা বলিয়া নাম রাখিয়াছি ধবলি। বাড়িতে এখন এত দুধ হইতেছে যে খাইবার লোক নাই। তুমি আসিলে আমি তোমাকে যত ইচ্ছা পায়েস খাওয়াইব। জানি দিদির মত ভাল হইবে না।

গতকাল এখানকার স্কুলের ভবানী মাস্টার আমাদের বাড়িতে আসিয়াছিলেন। তোমাদের স্কুল এই বৎসর হইতে নতুন বাড়িতে উঠিয়া যাইতেছে। ভবানী মাস্টারের ইচ্ছা তুমি অবশ্যই আগামী ছাব্বিশে জানুয়ারী এখানে থাক। কারণ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রথম পতাকা তুমি উত্তোলন করিয়াছিলে। ছাব্বিশে জানুয়ারীতেও সেই কাজটি তোমাকে দিয়া তিনি করাইতে চান। শুনিলাম এই বৎসরই তিনি অবসর লইয়া দেশে চলিয়া যাইবেন।

তোমার পিতা পরে পত্র দিতেছেন, দিদিকে বলিও। গুরুজনদের আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম দিলাম। তুমি আমার স্নেহাশিষ জানিও। ইতি, আশীর্বাদিকা, তোমার ছোট মা।'

'পুনশ্চ ॥ এ জীবনে আমি কাহাকেও দুঃখ দিই নাই। অনি, তুমি কি আমাকে দুঃখ দিবে?'

চিঠিটা পড়ে অনিমেষ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। এখন সেই ঘুঘু দুটোই শুধু নয়, একরাশ পাখি সমস্ত বাগান জুড়ে তারস্বরে চেঁচামেচি শুরু করেছে। চোখের সামনে স্বর্গছেঁড়ার গাছপালা মাঠ নদী যেন একছুটে চলে এল। সেই কাঁটাল গাছের ঝুপড়ি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, ছোট ছোট পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থাকা লাল চিংড়িগুলো কিংবা সবুজ গালচের মত বিছানো চা-গাছের উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে আসা কুয়াশার দঙ্গল একটা নিঃশ্বাস হয়ে অনিমেষের বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল।

ভবানী মাস্টার চলে যাবেন! 'একটা কথা মনে রাখবা বাবা, নিজের কাছে সৎ থাকলে জীবনে কোন দুঃখই থাকে না।' একটা ঘাম জড়ানো নস্যিব গন্ধ যেন বাতাসে ভেসে এল। স্বর্গছেঁড়ায় যাবার যে ইচ্ছেটা মাধুরী চলে যাওয়ার পর একদম চলে গিয়েছিল সেটা হঠাৎ ঝুপ ঝুপ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মায়ের কথাটা ভাবতেই বুকের মধ্যে একটা শীতল ছোঁয়া লাগল অনির। স্বর্গছেঁড়ায় গেলে সবাইকে দেখতে পাবে ও, শুধু মা নেই। তাঁর জায়গায় ছোট মা সারা বাড়িময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিয়ের পর হেমলতা রাগ

করে বলেছিলেন, 'দুধের স্বাদ কি ঘোলে মেটে? মা হল মা, সৎমা সৎমাই।' আচ্ছা, সৎমা বলে কেন? সৎ মানে তো ভাল, ভাল মা-রা আবার খারাপ হবে কি করে! কিন্তু ছোট মাকে তো নিজের মায়ের মত মনেই হয় না, বরং দিদির মত মনে হয়।

সৎমারা নাকি খুব অত্যাচার করে। ছোট মাকে দেখে, এই চিঠি পড়ে. কেউ সে কথা বললে অনি তাঁকে মিথ্যুক বলবে। এখানে ছোট মাকে তার ভাল লেগেছে কিন্তু স্বর্গছেঁড়ায় গেলে মাকে মনে পড়বেই. তখন ছোট মাকে—। অনির মনে হল বাবাকে সে জিজ্ঞাসা করতে পারত, মাকে ভুলে গেছে কিনা? কিন্তু তবু স্বর্গছেঁড়ায় যাবার জন্যে বুকের মধ্যে যে ছটফটানি শুরু হয়ে গেছে সেটা যাচ্ছে না।

নতুন স্যার বলেছিলেন, 'মা নেই কে বলল? জন্মভূমিই তো আমাদের মা। বন্দেমাতরম্।' শব্দটা উচ্চারণ করলেই শরীর গরম হয়ে ওঠে। তখন আর কারো মুখ মনে পড়ে না ওর। পেয়ারা গাছের তলায় পায়চারি করতে করতে ও নিচু গলায় আবৃত্তি করতে লাগল, 'আমরা অন্য মা জানি না— জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ি নাই— আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জসমীরণ? শীতলা, শস্যশ্যামলা—।'

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল অনি। একদৃষ্টে ও মাটির দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। পেয়ারা গাছের তলায় ছোট ছোট ঘাসের ফাঁকে কালো মাটি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেই মাটিটাকে চেনা যাচ্ছে না আর। সেই স্বর্গছেঁড়া থেকে চলে আসার দিন ও রুমালে করে লুকিয়ে একমুঠো মাটি এনে পেয়ারা গাছের তলায় রেখে দিয়েছিল। যখনই মন খারাপ করত তখনই এসে মাটিটাকে দেখত, মাটিটা দেখা মানে স্বর্গছেঁড়াকে দেখা। তারপর এক সময় ভুলে গিয়েছিল সেই মাটির কথা। এতদিন ধরে কত বৃষ্টি গেল, প্রতি বছরের বন্যা গেল। এখন আর কাউকে আলাদা করে চেনা যাবে না। মাটিদের চেহারা কেমন এক হয়ে যায়। আমাদের মা নাই বাপ নাই, আমাদের জন্মভূমি আছে। চিঠিটা পকেটে রাখতে রাখতে অনি ঠিক করল এখন ও স্বর্গছেঁড়ায় যাবে না।

★ ★ ★

বন্দেমাতরম্! জেলা স্কুলের বিরাট মাঠ জুড়ে চিৎকারটা উঠে সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে পড়ল। প্রায় সাড়ে চারশ' ছেলে তিনটে লাইনে ভাগে ভাগে মাঠ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকের পরনে স্কুলের য়ুনিফর্ম। প্রথম দিকে স্কাউটরা, পরে সমস্ত স্কুল। একটু আগে হেডমাস্টারমশাই ছাব্বিশে জানুয়ারীর পতাকাটা তুললেন।

লাইনের সামনে দাঁড়িয়ে অনির মনে পড়ছিল স্বর্গছেঁড়ার কথা। সাতচল্লিশ সালের পনেরই আগস্ট পতাকা তোলার সময় তার কি অবস্থাটাই না হয়েছিল। প্রত্যেকটা ক্লাসের ছেলেদের সামনে একজন করে লিডার দাঁড়িয়ে। নতুন স্যার অনিকে ওর ক্লাসের লিডার ঠিক করেছেন। এই নিয়ে রিহার্সালের সময় থেকে মণ্টু ওর পেছনে লেগে আছে, নেহাত নতুন স্যারের জন্য কিছু বলতে পারছে না। আজকেও একটু আগে লাইনে দাঁড়িয়ে নেতাজীর পিয়াজি বলে ক্ষেপাচ্ছিল। যেহেতু সে লিডার তাই মুখটা সামনে ফেরানো, ফলে মণ্টুকে কিছু বলতে পারছে না।

বন্দে মাতরম্ ধ্বনি উচ্চারণ করার সময় ওর গায়ে সেই কাঁটাটা আবার ফিরে এল। এমন কি দাদু যে অনেক গম্ভীর মুখে আজকের মিছিলে যেতে পার্মিশন দিয়েছেন— সে কথাটাও ভুলে গিয়েছিল। আজকাল দাদু যেন কেমন হয়ে গিয়েছেন।

হেডমাস্টার মশাই-এর বক্তৃতার পর নতুন স্যার মঞ্চে উঠলেন, 'এবার আমরা সবাই সুশৃঙ্খল ভাবে মার্চ করে চাঁদমারির মাঠে যাব। তোমরা জানো নিশ্চয়ই কলকাতা থেকে বিশিষ্ট নেতারা সব সেখানে এসেছেন। তাছাড়া সরকারের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত আছেন। আমরা স্কুলের তরফ থেকে সেই ঐতিহাসিক জমায়েতে যোগ দিয়ে পবিত্র কর্তব্য পালন করব।'

স্কুলের সমস্ত মাস্টারমশাই এমন কি ওদের পাগল ড্রইং-স্যার অবধি সামনে হাঁটতে লাগলেন। সাড়ে চারশ ছেলে ভাগে ভাগে মাঠ ছেড়ে রাস্তায় নামল মার্চ করতে করতে। অনি একবার দেখতে পেল ক্লাস টেনের অরুণদার হাতে বিরাট জাতীয় পতাকাটা উড়ছে। অত বড় পতাকা নিয়ে অনি কখনোই সোজা হয়ে হাঁটতে পারত না। অরুণদাকে খুব হিংসে হচ্ছিল ওর।

রাস্তায় পড়তেই গান শুরু হল। 'চল্-চল্-চল্, ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল।' তালে তালে, এতদিনের রিহার্সাল মনে রেখে যখন সবাই গাইতে গাইতে পা ফেলছে তখন মানুষজন অবাক হয়ে ওদের দেখতে লাগল। টাউন ক্লাব মাঠের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ও দেখল রাস্তার দুপাশে ভিড়ের মধ্যে সরিৎশেখর দাঁড়িয়ে আছেন লাঠি হাতে। হঠাৎ দাদুকে ভীষণ বুড়ো বলে মনে হল ওর। চোখাচোখি হতে দাদু মাথা নেড়ে হাসলেন। তখন দ্বিতীয় গানের মাঝামাঝি জায়গায় এসে গিয়েছে। অনি দাদুর দিকে চেয়ে লাইনটা সবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইল, 'সপ্তকোটিকণ্ঠ-কলকল-নিনাদকরালে দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃতখরকরবালে, অবলা কেন মা এত বলে।'

করলা নদীর কাঠের পুলটা পেরিয়ে পোস্ট অফিসের সামনে দিয়ে ওদের মিছিলটা এঁকেবেঁকে গাইতে গাইতে এগোতেই ওরা দেখতে পেল এফ.ডি.আই স্কুল থেকে ছেলেরা বেরুচ্ছে। এফ ডি আই-এর সঙ্গে জেলা স্কুলের চিরকালের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, খেলাধূলায় হেরে গেলেও পড়াশুনায় জেলা স্কুল ওদের থেকে এগিয়ে থাকে প্রতিবার। এফ. ডি. আই-এর ছেলেদের দেখে চিৎকারটা যেন হঠাৎই বেড়ে গেল। হঠাৎ মণ্টু চেঁচিয়ে বলল, 'অনিমেষ, ওদের রাস্তা ছাড়িস না, আমরা আগে বেরিয়ে যাব।'

ওদের রাস্তা জুড়ে চলতে দেখে অসহায় হয়ে এফ. ডি. আই-এর ছেলেরা অপেক্ষা করতে লাগল।

চাঁদমারির মাঠে তিলধারণের জায়গা নেই। সামনের দিকে ওরা যেতে পারল না। স্কাউটরা ড্রিল স্যারের সঙ্গে অন্যদিকে চলে গেল। পুলিস, স্কাউট, গার্লস-গাইডরা পতাকাকে অভিবাদন জানালে। চাঁদমারির গায়ে বিরাট মঞ্চ তৈরি হয়েছে। মণ্টু বলল, 'চল সামনে যাই, এখান থেকে কিছুই দেখতে পাব না।' ভিড় ঠেলে সামনে যাওয়া সোজা কথা নয়, অনির মাঝে মাঝে দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল ভিড়ের চাপে। শেষ পর্যন্ত ওরা একদম মঞ্চের

সামনে যখন এসে দাঁড়াল তখন সমস্ত শরীর এই শেষ জানুয়ারীর সকালেও প্রায় ঘেমে উঠেছে। অনি দেখল বিরাট মঞ্চের ওপর নেতারা বসে আছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন বিরাট লোক, যাঁর ছবি প্রায়ই কাগজে বের হয়, অনি তাঁকে বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। পাশেই পুলিশ ব্যাণ্ডে 'ধনধান্যেপুষ্পেভরা' বাজছে। মণ্টু বলল, 'আমি এরকম কখনও দেখিনি।'

অনি হাসল, 'কি করে দেখবি, প্রজাতন্ত্র দিবস তো এর আগে আসেনি।'

একটু পরেই অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেল। প্রথমে পায়ে পায়ে বিরাট পুলিস-বাহিনী মার্চ করে এসে পতাকাকে স্যালুট করে গেল। পেছনের ব্যাণ্ডের তালে তালে ওদের পা পড়ছিল। স্কাউট আর গার্লস গাইডদের যাবার সময় মাঝে মাঝে হাসি শোনা যাচ্ছে জনতার মধ্যে থেকে। একটি মোটা মেয়ে ঠিক সোজা হয়ে হাঁটতে পারছিল না, বেচারার পায়ে বোধ হয় ফোস্কা পড়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেই বিরাট ব্যক্তিটি কপালে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছেন তখন থেকে। অনি বুঝতে পারছিল ওঁর হাত ব্যথা করছে। এর পরেই বন্দে-এ-এ মাতরম্ ধ্বনি দিতে দিতে কংগ্রেসের ফ্ল্যাগ নিয়ে নেতারা এগিয়ে এলেন অভিবাদন জানাতে। সেই চিৎকারের সঙ্গে গলা মিলিয়ে জনতার মধ্যে কেউ কেউ বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিল। অনির সমস্ত শরীরে এখন অদ্ভুত উত্তেজনা তির তির করে ওঠানামা করছে।

অন্ধকারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অনি বাড়ি ফিরে আসতো। সূর্য ডুবে গেলে যে ছায়াটা চারধার জুড়ে থাকে সেটা মন-কেমন করার। কারণ একটু বাদেই দৌড়তে হবে, পিসীমা ঠাকুরঘর থেকে সন্ধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসার আগেই কলতলায় পৌঁছে যেতে হবে। এই একটি ব্যাপারে সরিৎশেখর দারুণ কড়া। রাত হয়ে গেলে কি হবে অনি অনুমান করতে পারে।

আজ অবশ্য সেরকম কোন সমস্যা তার নেই। ছুটির পর বাড়ি এসে বেরুতে যাবে এমন সময় শচীন আর তপন এসে হাজির হল। শচীন ওদের ক্লাসের গোলগাল মার্কা ভাল ছেলে, ওর বাবার দুটো চা-বাগানে শেয়ার

আছে। শচীন তপনকে নিয়ে এসেছে অনিকে নেমন্তন্ন করতে। স্কুলে বললে হবে না বলে বাড়ি বয়ে এসেছে, তার দিদির বিয়ে।

ভেতরের বারান্দায় চেয়ার পাতা ছিল, সেখানে ওদের বসিয়ে অনি পিসীমাকে ডেকে আনল। দাদু বাড়িতে নেই, নিশ্চয়ই কিং সাহেবের ঘাটে গিয়েছেন। অনির বন্ধুরা খুব কমই বাড়িতে আসে, পিসীমা তড়িঘড়ি দেখতে এলেন। আজকাল পিসীমা বাড়িতে শেমিজ পরেন না, কেমন যেন হয়ে গেছেন। কিছুতেই খেয়াল থাকে না।

হেমলতাকে দেখে অনির বন্ধুরা উঠে দাঁড়াল। ফুটফুটে দুটো ছেলেকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হেমলতা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'বসো বসো, দাঁড়াতে হবে না, তোমবা তো সব অনির বন্ধু? তা আমাদের বাড়িতে আসো না কেন? কি নাম তোমাদের?'

অনির খুব মজা লাগছিল, পিসীমা যখন কথা বলেন তখন যেন থামতে চান না। ওর বন্ধুরা বেশ হকচকিয়ে গেছে, কোন্ উত্তরটা দেবে বুঝতে পারছে না। অনি বলল, 'পিসীমা, এ হচ্ছে তপন, খুব ভাল গান গায় আর ও—'

অনিকে থামিয়ে হেমলতা বললেন, 'তপন কি?'

তপন এবার চটপট বলল, 'মিত্র।' বলে এগিয়ে এসে হেমলতাকে প্রণাম করল।

হেমলতা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'বেঁচে থাক, বাবা। মিত্তির হল কুলীন কায়েত।'

অনি বলল, 'আর এ হচ্ছে আমাদের ক্লাসের গুড বয়। ওর দিদির বিয়েতে নেমন্তন্ন করতে এসেছে।'

হেমলতা বললেন, 'কি নাম তোমার, বাবা?'

'আমার নাম শচীন রায়।'

শচীন এগিয়ে গেল প্রণাম করতে। কিন্তু বেচারা নিচু হতে না হতেই হেমলতা ধড়মড় করে কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন, 'না না, থাক থাক, প্রণাম করতে হবে না।' শচীন তো বটেই, অনিও খুব অবাক হয়ে গেল পিসীমার এ রকম ব্যবহারে। একটু সামলে নিয়ে বললেন, 'বামুনের ছেলে তুমি—।' কথা শেষ করার আগেই অবাক গলায় শচীন বলল, 'না না, আমরা বৈদ্য।'

হেমলতা তাই শুনে দোনোমনা হয়ে বললেন, 'একই হল। বদ্দিরাও তো এক ধরনের বামুন। তোমরা সব বসে গল্প কর।' হেমলতা আর দাঁড়ালেন না। উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে আর একবার ওদের দেখে গেলেন।

শচীন বলল, 'তোর পিসীমা খুব সেকেলে, না রে?'

অনি বলল, 'কই, না তো?'

তপন বলল, 'যাঃ। আমি প্রণাম করলাম কিছু হল না। ও প্রণাম করতেই বামুন-টামুন বের করে ফেললেন।'

শচীন বলল, 'মিত্ররা তো কায়েত সবাই জানে। আগেকার লোকেরা বামুনদের শুধু সম্মান দিত। তোর পিসীমার কথা বাড়িতে গিয়ে বলতে হবে।'

তপন গম্ভীর গলায় বলল, 'স্বাধীনতা এলেও আমরা যে কত পরাধীন তা তোর পিসীমাকে দেখলে বোঝা যায় অনি।'

এসব কথা শুনতে অনির একদম ভাল লাগছিল না। পিসীমা এমন কাণ্ড করবেন ও ভাবতে পারেনি। বদ্যি কি বামুন, না জেনেই প্রণাম নিলেন না, বন্ধুদের কাছে ওই খবরটা ওরা নিশ্চয়ই ছড়িয়ে দেবে। খুব খারাপ লাগছিল ওর। এমন সময় রান্নাঘর থেকে হেমলতা চাপা গলায় তাকে ডাকলেন। হেমলতা এইভাবে তাকে ডাকেন না, অন্য সময় তাঁর চিৎকার শুনে সরিৎশেখর অবধি বিরক্ত হয়ে ধমক দেন, 'কি কাকের মত চেঁচাচ্ছ?'

চটপট হেমলতা জবাব দিতেন, 'কি করব, জন্মাবার সময় তো কেউ মধু দেননি।' তা এখনও এই ওকে ডাকছেন, ওঁকে মোটেই কর্কশ মনে হচ্ছে না। অনি উঠে রান্নাঘরে এল।

হেমলতা প্লেট সাজিয়ে বসেছিলেন। তিলের নাড়ু, নারকেলের নাড়ু আর মোটা পাকা কলা। হেমলতা বললেন, 'হ্যাঁরে, ও আবার এসব খাবে-টাবে তো! নাহলে বল দুটো লুচি ভেজে দিই।'

অনি বলল, 'কে খাবে না, কার কথা বলছ?'

হেমলতা বললেন, 'ঐ যে, ফরসা মতন—'

অনি বলল, 'দুজনেই তো ফরসা। তপন—?'

হেমলতা দ্রুত ঘাড় নাড়লেন, 'না না, যে প্রণাম করতে আসছিল—।'

'ও, শচীনের কথা বলছ? তুমি ওকে প্রণাম করতে দিলে না কেন?

আমার বন্ধুরা শুনলে ক্ষ্যাপাবে।' অনি সোজাসুজি বলে ফেলল।

হেমলতা বলে উঠলেন, 'না বাবা, প্রণাম করতে হবে না। তা ও কি খাবে এসব?'

'খাবে না কেন?' অনি দুটো প্লেট হাতে নিয়ে যেতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, 'একটাতে বেশী দিয়েছ কেন অত?'

হেমলতা হাসলেন, 'বেশী কোথায়? ওটা ওকে দিবি।'

অনি বলল, 'কেন? দুজনকেই সমান দাও। তপন কি দোষ করল? একেই প্রণাম নেবার সময় অমন করলে, খাবার সময় যদি তপনকে কম দাও তো ও ছেড়ে কথা বলবে?'

হেমলতা যেন অনিচ্ছায় দুটো প্লেটের খাবার সমান করতে চেষ্টা করলেন, 'হ্যাঁরে ছেলেটা খুব শান্ত, না রে?'

'কোন্ ছেলেটা?' অনির হঠাৎ মনে হল পিসীমাকে যেন অন্য রকম লাগছে। এমন ভঙ্গিতে পিসীমাকে কথা বলতে ও কোনদিন দ্যাখেনি।

'ওই যে, বদ্যিব্রাহ্মণ—।'

'ওঃ', অনি বলল, 'তুমি বার বার ওই যে ওই যে করছ কেন? শচীন নামটা বলতে পারছ না?'

হেমলতা কিছু বললেন না।

সরিৎশেখরের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে তপন আর শচীন চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল, অনি যেন অবশ্যই যায়, ওর দাদুকে যেন অনি বলে যে ওরা এতক্ষণ বসে ছিল। জলপাইগুড়িতে তখন একটা অদ্ভুত নিয়ম চালু ছিল। কোন বিবাহ-অনুষ্ঠানে পত্র দিয়ে অথবা মুখে নিমন্ত্রণ করলেই চলবে না, অনুষ্ঠানের দিন ঘনিষ্ঠদের বাড়ি গিয়ে বলে আসতে হবে। এ রকম অনেকবার হয়েছে, এই সামান্য ত্রুটির জন্য বিবাহ-অনুষ্ঠান ফাঁকা হয়ে গেছে, বাড়িতে বলা হয়নি বলে অনেকেই আসেননি।

শচীনরা চলে গেলে অনি চুপচাপ গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। এখন খেলার মাঠে গিয়ে কোন লাভ নেই। পিসীমা আজ ওরকম করছিলেন কেন? শচীনকে নাম ধরে ডাকছিলেন না পর্যন্ত। হঠাৎ ওর খেয়াল হল পিসীমার বরের নাম ছিল শচীন। দাদু একদিন সে-সব গল্প বলেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অনি ঘুরে দাঁড়াল। এখন ও বুঝতে পেরে গেছে কেন শচীনকে উনি প্রণাম করতে দেননি। ইদানীং ও পিসীমার সঙ্গে ঠাট্টাতামাশা করে,

বয়স হয়ে যাবার জন্যে বোধ হয় পিসীমা ওকে প্রশ্রয় দেন। এরকম একটা ব্যাপার আবিষ্কার করে অনি এই নিয়ে একটু মজা করবে বলে হাঁটতে যেতেই পেছন থেকে একজন তাকে ডেকে উঠল। অনি ফিরে দেখল, ওদের পাড়ার একটি বড় ছেলে ওকে ডাকছে, 'এই খোকা, তোমার নাম অনি তো?'

অনি ঘাড় নাড়ল।

'তাড়াতাড়ি বাড়িতে খবর দাও, তোমার দাদুর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।' ছেলেটি গেটের কাছে এসে দাঁড়াল।

'দাদুর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে?' অনি হতভম্বের মত তাকাল। কি করতে হবে কি বলতে হবে বুঝতে পারছিল না। ছেলেটি আবার বলল, 'দাঁড়িয়ে থেকো না, যাও। খুব খারাপ কিছু না, পায়ে চোট লেগেছে বোধ হয়, ভয়ের কিছু নেই।'

দুর্ঘটনা ঘটে গেছে অথচ ভয়ের কিছু নেই— এ কথা লোকে চট করে বিশ্বাস করতে চায় না। তা ছাড়া প্রিয়জনের দুর্ঘটনা মানেই একটা মারাত্মক ব্যাপার হয়ে যায়। অনি ছুটে গিয়ে হেমলতাকে চেঁচিয়ে এই খবরটা দিল। খবরটা শুনে আচম্বিতে কি করবেন বুঝতে না পেরে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলেন। বাবার দুর্ঘটনা ঘটেছে, যে লোকটা একটু আগে সুস্থ শরীরে বেড়াতে গেল সে লোকটা এখন হাসপাতালে—একথা ভাবলেই বুকটা কেমন করে ওঠে। এই দীর্ঘ জীবনটা তাঁর বাবার সঙ্গে কেটেছে, বাবা ছাড়া তিনি কিছু ভাবতেই পারেন না। ফলে এই খবরটা ওঁর শরীর নিঙড়ে একটা ভয়ের কান্না বের করে আনল।

হাসপাতালে যেতে হবে। তাড়াতাড়ি বাড়ির ঘর-দোর বন্ধ করে তালা দিতে গিয়ে হেমলতা আবিষ্কার করলেন বাড়িটা একদম খোলা পড়ে থাকছে। এত বড় বাড়িতে তালা দিয়ে এর আগে সবাই মিলে কোথাও যাওয়া হয়নি। হেমলতা দেখলেন বাগানের ভেতর দিয়ে কেউ এসে তালা ভেঙে যদি সব বের করে নিয়ে যায় তবে পাড়ার লোকে কেউ টের পাবে না। কিন্তু একটা বড় আতঙ্ক ছোট ভয়ের সম্ভাবনাকে চাপা দিতে পারে, হেমলতা ইষ্টনাম করতে করতে অনিকে নিয়ে বের হলেন।

অনি দেখল, পিসীমা থান-শেমিজের ওপর একটা সুতীর চাদর জড়িয়েছেন। এর আগে কখনও সে পিসীমার সঙ্গে রাস্তায় বের হয়নি।

এখানে আসার পর পিসীমা কখনও বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন কিনা মনে পড়ে না। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। টাউন ক্লাব মাঠের পাশ দিয়ে যেতেই ওরা রিকশা পেয়ে গেল। হেমলতা তখন থেকে শুধু নাম জপ করে যাচ্ছেন। দাদুর পায়ে চোট লেগেছে, ভয়ের কিছু নেই শোনার পরও কিন্তু অনি সহজ হতে পারছিল না। খারাপ খবর নাকি লোকে টপ করে দেয় না, সইয়ে সইয়ে দেয়। দাদু যদি মরে গিয়ে থাকে এতক্ষণে, তাহলে ও কি করবে?

হাসপাতালে প্রথমে ঢুকল অনি। পিসীমা পেছন পেছন। রিকশা থেকে নেমেই অনি দেখল পিসীমা মাথায় ঘোমটা দিয়েছেন। এ রকম বেশে ওঁকে দেখে অনির খুব হাসি পেলেও কিছু বলল না। তাড়াহুড়োয় পয়সাকড়ি আনা হয়নি বলে রিকশাওলাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হল। ফিরে গিয়ে একেবারে ডবল পাবে। কড়া ওষুধের গন্ধ নাকে ধক করে আসতেই অনির মনে হল, হাসপাতালে থাকতে খুব কষ্ট হয়। অনুসন্ধান লেখা কাউণ্টারটায় কেউ নেই। একটা শুঁটকো মত বেয়ারাগোছের লোক মেঝেতে বসে ছিল, অনিদের বোকার মত চাইতে দেখে বলল 'কি খুঁজছ, বাবা?'

অনি বলবে কি বলবে না ভেবে বলে ফেলল 'আমার দাদু কোথায় তাই জানতে এসেছি।'

লোকটা কেমন অথর্বের মত তাকাল, 'জানতে চাইলেই জানতে পারবে না। ছটার পর বাবুদের ডিউটি খতম।' হাত দিয়ে ফাঁকা চেয়ার দেখাল সে, ' কি কেস?' অনি ঠিক বুঝতে পারল না প্রথমটা, 'মানে'?

'বাঁচবে না কষ্ট পাবে?' লোকটা উদাস গলায় জিজ্ঞাসা করল। অনিকে ঘুরে পিসীমার দিকে চাইতে দেখে লোকটা বুঝিয়ে দিল, 'চুকে গেলেই বেঁচে যাওয়া যায়, এখানে থাকলেই তো ভোগান্তি, কষ্ট। কিন্তু চাইলেই কি যাওয়া যায়? এই যে, দ্যাখো, আমি একেবারে খোদ যাবার দরজা— এই হাসপাতালে কাজ করছি আর প্রতিদিন চলে যাবার জন্য চেষ্টা করছি তবু সে শালা কি আমাকে টিকিট দেবে? তা কখন ভর্তি হয়েছে?'

'বিকেলে। অ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে পায়ে।' অনি বলল।

'ও সেই রিকশা কেস? কোন আশা নেই, সে শালা দয়া করবে না, অনেক ভোগান্তি আছে। তা তিনি আছেন ওই সামনের হলুদ বাড়িতে। এসে অবধি ডাক্তার-নার্সদের ধমকে বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছেন যাও, রিকশা

কেস বললেই যে কেউ এখন বলে দিতে পারবে।' লোকটা একফোঁটা নড়ল না।

তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে অনি বলল,'আশা নেই বলল, না?'

হেমলতা বললেন, 'তার মানে ভগবান নিয়ে যাবে না, ওর কাছে মরে যাওয়া মানে বেঁচে যাওয়া। যত বদ লোক!'

হেমলতা হাঁটছিলেন টিপটিপে পায়ে। হাসপাতালেব বারান্দায় রুগীরা সার দিয়ে শুয়ে রয়েছে। রাজ্যের মানুষের ছোঁয়া লেগে যাওয়ায় তাঁর হাঁটাটা শ্লথ হচ্ছিল। দুবার তাগাদা দিয়ে অনি এগিয়ে গিয়েছিল হলুদ বাড়ির দরজায়। এখন ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ হয়ে গেছে। দলে দলে মানুষজন হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। দরজায় একজন দরোয়ান গোছের লোক ওদের আটকালো। অনি ব্যাপারটা তাকে বললেও সে যেতে দিতে নারাজ, সময চলে গেছে।

ততক্ষণে হেমলতা এসে পড়েছেন, শুনে খেঁকিয়ে উঠলেন, 'আমরা কি জেনে বসে আছি যে কখন ওঁর অ্যাক্সিডেণ্ট হবে আর আমাদের সে খবর পেয়ে আসতে তোমাদের সময় চলে যাবে?'

দারোয়ান বলল, 'কখন অ্যাডমিট হয়েছে আপনার স্বামী?'

হেমলতা সব ভুলে চিৎকার করে উঠলেন, 'মুখপোড়া বলে কি! ওরে উনি আমার বাবা, স্বামীকে অনেক দিন আগে খেয়েছি।' অনির চট করে মনে পড়ে গেল, দাদু বলেন পিসীমার নাকি রাক্ষস গণ।

দারোয়ানটা একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'কি হয়েছিল?'

এবার অনি চটপট বলল, 'রিকশায় লেগেছে।'

সঙ্গে সঙ্গে দারোয়ানের চেহারা বদলে গেল,'আরে বাপ, যান যান, বাঁ দিকে ঘুরে তিন নম্বর বেড।'

লোকটা এরকম ভয় পেল কেন বুঝতে পারল না অনি। পিসীমা তখনও গজগজ করছেন, 'এদের এখানে চাকরি দেয় কেন? মেয়ে বউ বুঝতে পারে না। যত বদ লোক।'

সরিৎশেখর বিছানার ওপর হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। তাঁর একটা পা মোটা ব্যাণ্ডেজ জড়ানো, টান টান করে রাখা। ওদের দেখে তিনিই কাছে ডাকলেন, 'এই যে, এদিকে এস। দ্যাখো কিভাবে এঁরা সব আছেন। এটা কি হাসপাতাল না শুয়োরের খাঁচা!' ঘরময় নোংরা ছিল, আমি বলেকয়ে

সরিয়েছি, নইলে তোমরা ঢুকতে পারতে না।'

হেমলতা বাবার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে?'

সঙ্গে সঙ্গে গলা তুললেন সরিৎশেখর, 'স্বাধীন হয়ে সব উচ্ছন্নে গেছেন। আমি এখানে এসে এক ঘণ্টা পড়ে আছি, একটা ডাক্তার নেই যে এসে দেখবে! নাকি তার ডিউটি ওভার, নতুন লোক আসেনি। ভাবতে পার?

সরিৎশেখরের পাশের বেডে শুয়ে থাকা একজন রুগী চিনচিনে গলায় বলে উঠলেন, 'আমাদের খাবার থেকে চুরি করে ওরা, কি জঘন্য খাবার!'

সরিৎশেখর হেমলতাকে বললেন, 'শুনলে? চুরি করা আমি বের করছি! আমি এখানকার নাইটিঙ্গেলদের বলেছি খাবারের চার্ট দেখাতে, একটা কিছু বিহিত করতে হবে।,

হেমলতা এবার প্রায় অসহিষ্ণু গলায় বললেন, 'আপনার পায়ের অবস্থা কি রকম?'

'যন্ত্রণা হচ্ছে খুব।' এতক্ষণে মুখ বিকৃতি করলেন সরিৎশেখর, 'কাল সকালে বোধ হয় প্লাস্টার করবে। দুপুর নাগাদ বাড়ি গিয়ে ভাত খাব।'

'পারবেন?' হেমলতা যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

'পারব না কেন? আমার একটা পা তো ঠিক আছে।' হঠাৎ যেন তাঁর কথাটা মনে পড়ে যেতেই তিনি অনিকে কাছে ডাকলেন, 'শোন, তুমি কাল সকালের ফার্স্ট বাসে স্বর্গছেঁড়ায় চলে যাবে।'

অনি অবাক হয়ে বললে, 'কেন? আমার স্কুল যে খোলা!'

সরিৎশেখর বললেন, 'সারাজীবনে অনেক স্কুল খোলা পাবে। আমি যেতে পারছি না, তুমি অবশ্যই যাবে। তোমার বাবার খুব অসুখ।'
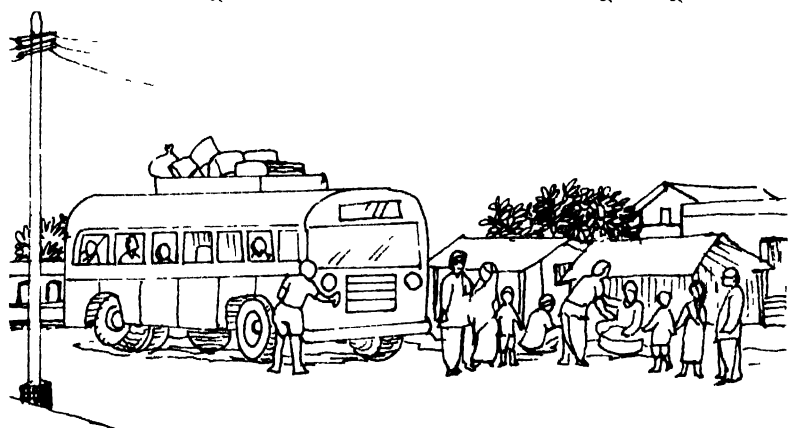
কিং সাহেবের ঘাটের চায়ের দোকানগুলো বোধ হয় দিনরাত খোলা থাকে। এই কাক-ভোরেও তাদের সামনে লোকের অভাব নেই। ভাতের হোটেল এখনও খোলেনি।

সেগুলো ছাড়িয়ে সামান্য এগোতেই অনিকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। একই সঙ্গে চার পাঁচজন ট্যাক্সি-ড্রাইভারের স্যাঙাত এসে ওকে যেন কোলে করেই নিজের গাড়িতে তুলতে চাইছে। অনি অসহায়ের মত এপাশ-ওপাশ তাকাচ্ছিল। সামনে সার দিয়ে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। মণ্টু এগুলোকে বলে মুড়ির টিন। থার্টিটু পার্টস অল আউট। পুরো গাড়িটাই নাকি ভাঙা-চোরা—সব কটা অংশ কোনরকমে জোড়াতালি দিয়ে রাখা হয়েছে। হর্ন নেই, দরকারও হয় না। চলার সময় এক মাইল দূর থেকে সবাই এদের গর্জন শুনতে পায়।

অনি কোনদিন এই ট্যাক্সিতে চড়েনি। স্বর্গছেঁড়া থেকেঁ আসবার সময় লরিতে চেপে জোড়া-নৌকায় পার হয়ে এসেছিল। অনেকদিন ওরা কিং সাহেবের ঘাটে এসে দেখেছে সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপিয়ে আগাপাশতলা যাত্রী বোঝাই করে ট্যাক্সিগুলো তিস্তার কাশবন চিরে ছুটে যায় বার্নিশের দিকে। বছরের যে কটা মাস চর শুকনো থাকে ট্যাক্সিগুলো প্রতাপ দেখিয়ে বেড়ায়। তাও পুরো চর নয়, বার্নিশের কাছে সিকি মাইল গভীর জলের ধারা আছে। সেই অবধি গিয়ে আবার যাত্রী নিয়ে ফিরে আসে ট্যাক্সিগুলো।তারপর যখন বর্ষা বেশ জমে ওঠে, নদীর এপার-ওপার দেখা যায় না, ঢেউগুলো ক্ষ্যাপা গোখরোর মত ছোবল মারতে থাকে অবিরত, তখন ট্যাক্সিগুলো কোথায় যে হাওয়া হয়ে যায়!

অনি দেখল সামনের একটা ট্যাক্সির দরজা খুলে গেল হঠাৎ। তারপর একজন বয়স্ক মানুষ চাপা গলায় ধমকে উঠলেন, 'কি হচ্ছে?'

সঙ্গে সঙ্গে অনি দেখল লোকগুলো বেশ থতমত হয়ে গেল। একজন চট করে বলে উঠল, 'কেন ঝামেলা করস, বাবু তখন থিকা বইস্যা আছেন, ইনারে পাইলেই গাড়ি খুলুম— আসেন কত্তা, আমাগো পক্ষীরাজে বসেন, আমি ডেরাইভার সাহেবকে ডাইক্যা আনি।'

লোকটা ওকে যেন পথ দেখিয়ে খানিকটা দূর এগিয়ে এসে গাড়িটা চিনিয়ে দিল। অনি দেখল অন্যান্য গাড়ির তুলনায় এটা তবু ভদ্র চেহারার, মাথার ওপরের ত্রিপলটা আস্ত আছে। বয়স্ক ভদ্রলোক তখনও বিরক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অনি দেখেই বুঝলো ইনি নিশ্চয়ই খুব বড়লোক, কারণ এঁর ফিনফিনে ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবি আর ফরসা গোলগাল চেহারা থেকে একটা আভা বের হচ্ছিল।

ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় বললেন, 'গাড়িতে উঠিয়ে ছাড়ার নাম নেই! তোমাদের প্যাসেঞ্জার না হওয়া অবধি বসে থাকতে হবে?'

কথাটার কোন জবাব দিল না কেউ। ভদ্রলোক এপাশ-ওপাশ তাকালেন। অনি দেখল যে লোকটা ওকে গাড়ি চিনিয়েছে সে একটা পাটকাঠির মত ফিন্‌ফিনে লোককে সঙ্গে নিয়ে এদিকে আসছে। অনি শুনতে পেল ভদ্রলোক তাকে ডাকছেন, 'এই খোকা, ওপারে যাবে তো? গাড়িতে উঠে বস। এবার না ছাড়লে দেখছি!'

অনি গাড়িতে ওঠার আগের ফিনফিনে লোকটি দরজা খুলে ওকে সামনে বসতে বলল। ড্রাইভারের সিটে কোন গদি নেই। গোল গোল স্প্রিং-এর ওপর মোটা বস্তা পাতা রয়েছে। খুব চওড়া ফুটবোর্ডের ওপর পা রেখে নিচু হয়ে সিটে গিয়ে বসতেই মনে হল ওর পাছায় অজস্র পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে। ড্রাইভারের সঙ্গীটি তখন চেঁচাচ্ছে— 'ফাস্টো টিপ — বার্নিশ, ফাস্টো টিপ— বার্নিশ।'

গাড়িতে ওঠার সময় অনি লক্ষ্য করেছিল ভদ্রলোক একা নেই। একজন মহিলা এবং একটি ছেলেকে এক পলকে নজর করেছিল সে।এখন গাড়িতে উঠে ও দেখল ওর সামনে আয়নাটা আস্ত আছে এবং ভদ্রলোকের পাশে ভীষণ ফরসা একজন মহিলা বসে আছেন লাল কাপড় পরে। মহিলার চোখে নতুন ধরনের চশমা যা অনি কোনদিন দেখেনি, জামাটার হাতা নেই। এ রকম জামা ছোট ঠাকুমা পরত। দাদুর তোলা ছোট ঠাকুমার একটা ছবি দেখেছিল সে, ঠিক এই রকম, তবে একটু ঢোলা। অনি উঠতেই তিনি

চোখ কুঁচকে তাকে একবার দেখলেন, 'রাবিশ! এত করে বললাম গাড়ি বের কর শুনলে না, এখন বোঝ।'

ভদ্রলোক বললেন, 'তিস্তার চরে প্রাইভেট গাড়ি চালালে বারোটা বেজে যাবে।'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'উঃ, চিরটাকাল পুতুপুতু করে কাটালে!'

ভদ্রমহিলার কথা শেষ হওয়া মাত্র হুড়মুড় করে চার-পাঁচজন কাবলীওয়ালার একটা দল এসে পড়ল। ওদের দেখে অন্যান্য ট্যাক্সি-ড্রাইভাররা কিন্তু একদম চিৎকার করল না। ওরা বোধ হয় এই ট্যাক্সিতে প্যাসেঞ্জার দেখে সোজা এখানেই চলে এল। ড্রাইভারের সঙ্গী চেঁচিয়ে বলল, 'এক রুপিয়া খান সাব এক আদমি কো।'

একটা মোটা কাবুলীওয়ালা, যার ঘাড় মাথার অর্ধেক অবধি কামানো, ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, 'পাঁচ আদমী— চার রুপয়া।'

এই নিয়ে যখন ওদের মধ্যে কথা চলছে অনি শুনল ভদ্রমহিলা বললেন, 'এই গাড়িতে ওরা যাচ্ছে নাকি?' ভদ্রলোক জবাব না দিলেও অনি বুঝতে পারল, তিনিও ওদের যাওয়াটা পছন্দ করছেন না। ভদ্রমহিলা বললেন, 'তুমি ড্রাইভারকে বলো ওদের না নিতে।'

ভদ্রলোক বললেন, 'ও শুনবে কেন? আমরা তো পুরো ট্যাক্সি রিজার্ভ করিনি।'

এবার যেন মহিলা ধৈর্য রাখতে পারলেন না, 'তাই কর। আঃ! তুমি জানো না ওরা কি রকম।'

অনি দেখল ভদ্রমহিলার মুখ অসম্ভব লাল হয়ে গেছে। তাঁর একপাশে ওর বয়সী যে ছেলেটা চুপচাপ বসে আছে তার মুখটা অসম্ভব রকমের গোবেচারা। এ রকম ছেলে ওদের দলে একটাও নেই। হঠাৎ ছেলেটা বলে উঠল, 'কাবুলীওয়ালারা খুব ভাল, না মা? আখরোট দেবে আমাদের?'

ভদ্রমহিলা খিঁচিয়ে উঠলেন, 'আঃ, তুমি চুপ কর। যেমন বাপ তেমনি ছেলে।'

ছেলেটি হতচকিত হয়ে বলল, 'হ্যাঁ মা, মিনিকে দিত, আমি পড়েছি।'

অনি ঠিক বুঝতে পারছিল না ছেলেটা কোন পড়ার কথা বলছে। তবে আন্দাজ করল ও কাবুলীদের নিয়ে কোন গল্প পড়েছে।

দর ঠিকঠাক হয়ে গেলে লোকগুলো যখন গাড়িতে উঠতে যাবে তখন

অনি পিঠে একটা হাতের স্পর্শ পেল। ঘাড় ঘুরিয়ে সে দেখল, ভদ্রমহিলা অনেকটা ঝুঁকে প্রায় তার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলছেন, 'তুমি আমাদের এখানে এসে বসো তো ভাই, সামনের সিটটা ওদের ছেড়ে দাও।'

অনি কি করবে বুঝে না উঠতেই ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় বললেন, 'চলে এসো পেছনে, কুইক।' ভদ্রলোক জানলা ছাড়বেন না,তাঁর কি সব দেখার আছে। গোলালু ছেলেটা প্রায় নাকে কেঁদে উঠল, সে ওপাশের জানলা থেকে সরবে না। অনি নেমে দাঁড়িয়েছিল। একটা ছোকরা কাবুলী ওর মাথায় আলতো করে টোকা মারল। তারপর ওরা চারজন ড্রাইভারের পাশে গিয়ে অদ্ভুত ভাষায় উঃ আঃ করতে করতে বসে পড়ল। শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোক নেমে দাঁড়াতে অনি পেছনের সিটে বসতে পেল।

কাবুলীরা উঠে বসেই প্রায় একই সঙ্গে ঘাড় ঘুরিয়ে ওদের দেখল। একজন কি একটা মন্তব্য করতেই সবাই ঠা-ঠা করে হেসে উঠল। অনি দেখল ভদ্রমহিলা এক হাতে ছেলেকে জড়িয়ে ধরেছেন, অন্য হাত তার পিঠের উপর রাখা।

ড্রাইভারের সঙ্গী এবং অবশিষ্ট কাবুলীটা ফুটবোর্ডে উঠল। সঙ্গীটি ওঠার আগে হ্যাণ্ডেল নিয়ে কয়েক মিনিট প্রাণপণে ঘুরিয়ে ইঞ্জিন স্টার্ট করতে সেটা সফল হয়ে এল। ইঞ্জিন গর্জে উঠতেই গাড়িটা থরথর করে কাঁপতে লাগল। অনির মনে হতে লাগল মণ্টুর কথা সত্যি, যে কোন সময় গাড়ির সব কটা অংশ খুলে পড়ে যেতে পারে। বিকট চিৎকার করে গাড়িটা চলতে শুরু করল এবার। ভেতরে বসে কানে তালা লাগার যোগাড়। অনি দেখল পেছনের সিটের গদি এখনও সবটা উঠে যায়নি।

দুপাশে বালি আর বালি, ইতস্তত কিছু কাশগাছ, গাড়িটা যত জোরে ছুটছে তার বহুগুণ বেশী শব্দ করছে। মাঝে মাঝে মরা নদীর খাঁজে কিছু জল জমে রয়েছে। অবলীলায় ট্যাক্সি সেটা পেরিয়ে এল। কাবুলীগুলো খুব মজা পেয়েছে, অনি শুনল, ওরা চিৎকার করে গান ধরেছে। অনির বসতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। নদীর ধারে এসে ট্যাক্সিটা দাঁড়াতেই কাবুলীগুলো আগে লাফিয়ে নামল। এপারে কোন দোকানপাট নেই। প্রায় রোজই ঘাট জায়গা বদলাচ্ছে, তাছাড়া পাহাড়ের বৃষ্টি হলেই শুকনো চরে আট-দশটা মেঠো ধারা গজিয়ে এক হয়ে যাবে। ওপারে বার্নিশ। বার্নেশও বলে অনেকে। লোকজন দোকানপাটে জমজমাট। এই সাতসকালে সেখানে গঞ্জের ভিড়।

সমস্ত ডুয়ার্স এবং সুদূর কুচবিহার থেকে বাসগুলো এসে ওই বার্নিশে বসে থাকে। তিস্তা পেরিয়ে জলপাইগুড়িতে আসার উপায় নেই। তাই বার্নিশের রবরবা এত। বার্নিশের নিচে মণ্ডলঘাট, জলপাইগুড়িতে আসার সময় ওরা মণ্ডলঘাট দিয়ে এসেছিল।

গাড়ি থেকে নেমে অনি দেখল জোড়া-নৌকো একটাও নেই, ছোট ছোট নৌকা দুটো দাঁড়িয়ে আছে। পাড়ে ভিড় নেই একদম, একটা নৌকোয় গোটা আটেক লোক বসে আছে। তবে এই সিকি মাইল চওড়া তিস্তায় এখন প্রচণ্ড ঢেউ, জলের রঙ লালচে। হঠাৎ দেখলে কেমন ভয়-ভয় করে। ড্রাইভারের সঙ্গী এসে তার কাছে টাকা চাইল। ও দেখল ভদ্রলোক মহিলা এবং গোবেচারা ছেলেটিকে নিয়ে নৌকোর দিকে এগোচ্ছেন। টাকাটা দিয়ে ও চটপট এগোল। আসবার সময় পিসীমা তিনটে এক টাকার নোট তাকে দিয়েছেন। এক টাকা ট্যাক্সির ভাড়া, চার আনা নৌকোর ভাড়া, পাঁচসিকা বাসভাড়া আর আট আনায় দুটো রাজভোগ। একদম হিসেব করে দেওয়া টাকা। সকালবেলায় তাড়াতাড়ি না খেয়ে বেরোনো—তাই রাজভোগ বরাদ্দ।

ভদ্রলোক উঠে গেছেন নৌকোয়, উঠে ছেলেকে প্রায় কোলে করে টেনে তুলেছেন। অনিকে আসতে দেখে মহিলা বললেন, 'তোমার জন্য দাঁড়িয়ে আছি ভাই। একসঙ্গে এলাম তো। যাই কি করে!'

অনি দেখল ঢেউ-এর দোলায় নৌকোটা পাড়ের বালিতে ঘষা খেয়ে আবার হাতখানেক সরে যাচ্ছে। সে সময় তার ফাঁক দিয়ে লালচে জলের স্রোত দেখা যাচ্ছে। ভদ্রমহিলা বোধ হয় সেই দিকে চোখ পড়ার পর আর এগোতে পারছেন না। ওদিকে ভদ্রলোক কিন্তু উদাস চোখে বার্নিশের দিকে চেয়ে আছেন। নৌকোটা ছোট। দু'ধারে সরু তক্তা পাতা, যাত্রীরা সেখানে বসে আছে। মাঝখানে কাঠের বীমগুলো এখন ফাঁকা। ছেলেটি জুলজুল করে বাবার পাশে বসে মাকে দেখছিল। অনির একটু ভয়-ভয় করছিল। সে
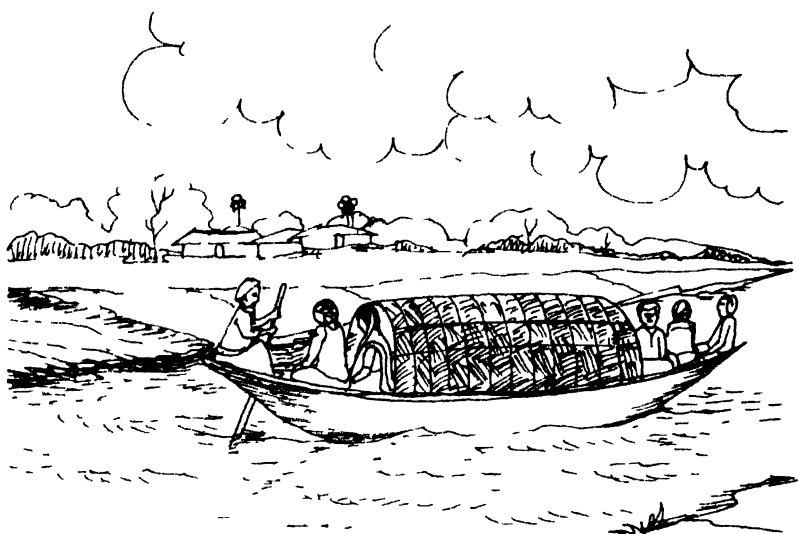
সাবধানে নৌকোতে উঠতেই সেটা সামান্য দুলে উঠল। প্রথমে মনে হয়েছিল বুঝি এবার ব্যালান্স থাকবে না কিন্তু সেটা চট করে ফিরে এল। সোজা হয়ে বেশীক্ষণ দাঁড়ানো যায় না। ও ঘুরে দেখল ভদ্রমহিলা ওর দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, 'বেশী দুলছে না তো?' অনি ঘাড় নেড়ে হাত ধরতেই ভদ্রমহিলা শবীবের সব ওজন নৌকোব ওপর অনিকে ভর করে ছেড়ে দিলেন। অনিব মনে হল ওর দমবন্ধ হয়ে যাবে, ও উলটে জলে পড়ে যাবে। কিন্তু কিছুই হল না. সামলে নিয়ে ভদ্রমহিলা সেখানেই কাঠের ওপর বসে পড়ে অনিকে বললেন, 'বসো।' অনি বসতে বসতে শুনতে পেল মহিলা বলছেন, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'স্বর্গছেঁড়ায়।' অনি বলল।

'দারুণ রোমান্টিক নাম, না? আমবা যাচ্ছি ময়নাগুড়ি। আজই ফিরে আসব। জলপাইগুড়িতে থাক?' কাঁধে হাত বেখে পা নাচালেন মহিলা।

'হ্যাঁ।'

'এলে দেখা করো। আমরা থাকি বাবুপাড়ায়। বাড়ির নাম ড্রিমল্যান্ড। মনে থাকবে তো?'

অনি ঘাড় নাড়ল।

নৌকোটা ছেড়ে দিল। নৌকোর মুখে একটা মোটা লম্বা দড়ি বেঁধে কয়েকজন সেটাকে টানতে লাগল পাড ধবে হাঁটতে হাঁটতে। সেই টানে

নৌকো এগিয়ে যেতে লাগলো ওপারের দিকে। ঢেউ বাঁচিয়ে নৌকোটাকে অনেক দূরে নিয়ে এসে মাঝিরা লাফিয়ে তাতে উঠে বসল।সঙ্গে সঙ্গে ছপ-ছপ করে বৈঠা পড়তে লাগল জলে। বাঁধন খুলে যেতেই স্রোতের টানে সোঁ সোঁ করে নৌকো নদীর ভিতর ঢুকে পড়ল।

বড় বড় ঢেউ দেখা যাচ্ছে মাঝ-নদীতে। এক-একটা এত বড় যে তার আড়ালে বার্নিশ ঘাট ঢাকা পড়ে যাচ্ছে পলকের জন্য। হঠাৎ নৌকার একধারে বসে থাকা রাজবংশীরা চিৎকার করে উঠল, 'তিস্তা বুড়িকি জয়!' সঙ্গে সঙ্গে সেটা গর্জন করে ফিরে এল। মাঝিরা প্রাণপণে নৌকো ঠিক রাখার চেষ্টা করছে। চিৎকার করে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে ওরা। অনি দেখল বড় ঢেউয়ের কাছাকাছি নৌকো এসে যেতেই একটা দিক কেমন উঁচু হয়ে যাচ্ছে নৌকোর।

গোবেচারা ছেলেটি ওর বাবাকে জড়িয়ে চোখ বন্ধ করে বসে আছে। ভদ্রলোক অন্য হাতে নৌকোর তক্তা শক্ত করে ধরে আছেন। ভদ্রমহিলা এই সকালে কুল-কুল করে ঘামছেন। তাঁর মুখের রঙ কাদা হয়ে গড়িয়ে পড়ছে একধারে। সমস্ত শরীর দিয়ে অনিকে জড়িয়ে ধরেছেন। ছিটকে ছিটকে জল আসছে নৌকোয়। কাবুলীগুলো পর্যন্ত নদীর চেহারা দেখে ভয়ে চুপচাপ হয়ে বসে গেছে।

এবার ঢেউটা পার হবে নৌকো। অনি দেখল স্রোতটা এখানে গর্তের মত নিচে নেমে গিয়ে হঠাৎ তুবড়ির মত ওপরে ফুঁসে উঠেছে। নৌকো সেই টানে নিচে নেমে যেতেই অদ্ভুত একটা ঝাঁকুনি লাগল। সেটা সামলে জলের টানে ওপরে উঠতেই একটু বেটাল হয়ে গেলে হুড়মুড় করে একরাশ জল নৌকোয় উঠে এল। আর তখনি অনি দেখল বেটাল নৌকোর একপাশে বসে থাকা একটা লোক টুপ করে জলে পড়ে গেল চুপচাপ। যেন ভেতরে ভেতরে কেউ কাজ করে যায়, নইলে সেই মুহূর্তে মহিলার বাঁধন খুলে অনি ঘুরে বসত না। আর বসতেই ও দেখল সেই শরীরটা ছুটন্ত জলের সঙ্গে পাক খেয়ে তার নিচ দিয়ে নৌকোর তলায় ঢুকে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকে পড়ে অনিমেষ তার পিঠের জামা চেপে ধরল মুঠোয়। জলের স্রোতে শরীরটার ওজন কমে গিয়েছে, তবু তাকে ধরে রাখা অনির পক্ষে অসম্ভব। পিঠের দিকে টান লাগায় শরীরটার নিচ দিক নৌকোর তলায় ঢুকে গেল আর লোকটা চট করে আধা উলটে গেল। অনি দেখল লোকটার সারা

শরীর কাপড়ে মোড়া, বাঁচার স্বাদ পেয়ে একটা হাত ওপরে বাড়িয়ে দিয়েছে। এভাবে কতক্ষণ সে ধরে থাকতে পারে? মহিলা না থাকলে সে নিজে পড়ে যেত। মহিলা তার কোমর দু'হাতে ধরে রাখায় সে ব্যালেন্স রাখতে পারছে।

এতক্ষণে নৌকোটা সেই বড় ঢেউ-এর জায়গাটা পেরিয়ে এসেছে। দুজন মাঝি দৌড়ে ছুটে এল অনিকে সাহায্য করতে। তারা এসে ঝুঁকে পড়ে লোকটাকে ধরতেই সে হাত বাড়িয়ে নৌকোর কাঠ ধরতে গেল।নাগাল পাচ্ছে না দেখে অনি হাতটা ধরে সাহায্য করতে যেতেই দেখল সে কোনরকমেই মুঠো করতে পারছে না। কারণ মুঠো করার জন্য আঙুলগুলোই তার নেই। এই জলে ভেজা হাতের যেখানে সে চেপে ধরেছিল সে জায়গাটা যেন কেমন কেমন লাগছে। আর এই সময় চিৎকারটা শুনতে পেল অনি। কানের কাছে মহিলা প্রচন্ড আর্তনাদ করে তার কোমর ছেড়ে দিলেন। দিয়ে আলুথালু হয়ে দৌড়ে স্বামীর পাশে গিয়ে বসলেন।

যেহেতু এখন নৌকো দুলছে না, অনি সোজা হয়ে একা দাঁড়াতে পারল। ততক্ষণে নৌকোটা পাড়ের কাছে এসে গেছে এবং এই মাঝি দুটো লোকটাকে টেনে অনিরা যেখানে বসেছিল সেখানে তুলেছে। অনি দেখল মৃতপ্রায় একটা মানুষ নৌকোর কাঠের ওপর এলিয়ে পড়ে আছে। মুখভর্তি দাড়ি, দাঁত নেই, হাঁ করে বুক কাঁপিয়ে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। অনি দেখল লোকটার নাক নেই, কানের অর্ধেকটা খসা, চুলের জায়গায় ছোপ ছোপ দাগ। পুরো মুখটা ঢেকে বসেছিল সে নৌকোয়। আর এতক্ষণ পরে অনি টের পেল ওর শরীর থেকে অদ্ভুত একটা পচা গন্ধ বের হচ্ছে। কেমন একটা গা-ঘিনঘিনে ভাব সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ল এবার। অনি নিজের হাতের দিকে তাকাল। তারপর ঝুঁকে তিস্তার জলে হাত ধুয়ে নিল। আর এই সময় একটা মাঝি ওকে বলে উঠল,'পুণ্য করলেন না ভাই, আপনার পাপই হইল।' কথাটার মানে বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে তার দিকে তাকাতেই সে বলল,' এ তো মানুষ না, জন্তুর অধম। মইরা গেলেই এ শান্তি পাইত, তিস্তা বুড়ীর কোল থিকা ছিনাইয়া আইন্যা কি লাভ হইল!'

অনি এত অবাক হয়ে গিয়েছিল যে ওর জামাকাপড়ের অনেকটা যে জলে ভিজে গেছে টের পেল না, 'কিন্তু ও মরে যেত যে!'

মাঝিরা হাসল,'হক কথা। কিন্তু বাঁইচ্যা যাইত।'

ঠিক তখন কাল সন্ধ্যেবেলায় হাসপাতালের সেই লোকটার মুখ মনে পড়ল। এই পৃথিবী থেকে চলে যাওয়া মানে বেঁচে যাওয়া— লোকটা বলেছিল। এখন এই মাঝিও প্রায় সেই কথাই বলছে। নিজের মায়ের কথা ভাবল অনি, মা কি বেঁচে গেছে? তাকে ফেলে রেখে মা কি শান্তিতে আছে? মানুষের কেন পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না বুঝতে পারছিল না অনি। হঠাৎ ওর মনে হল হাসপাতালের সেই লোকটা অথবা খসে-যাওয়া শরীরে লোকটা বোধ হয় একই রকমের।

পাড়ে নৌকো এসে ভিড়তেই খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ভিড় জমে গেল নৌকোটার সামনে। সবাই একে একে পয়সা দিয়ে নেমে গেলে অনি মাঝিটাকে পয়সা দিতে গেল। সে ঘাড় নেড়ে বলল,' না, আপনের ভাড়া লাগব না।'

পাড়ে দাঁড়িয়ে দুলন্ত নৌকোয় দাঁড়ানো মাঝিকে সে বলল,'কেন!'

মাঝি হাসল,'আপনি যা করেছেন তা ক'জনা করে!'

কিছুতেই পয়সা নিল না সে। অনেকগুলো বিস্মিত মুখের সামনে দিয়ে অনি ওপরে উঠে এল। সার সার বাস দাঁড়িয়ে। জায়গাগুলোর নাম মাথার ওপর লেখা— লঙ্কাপাড়া — আলিপুরদুয়ার — কুচবিহার — নাথুয়া — ফালাকাটা। এইসব চেনা বাসগুলোকে দেখতে পেয়ে ওর খুব খিদে পেয়ে গেল। খাবারের দোকান খুঁজতে গিয়ে ও দেখল ভদ্রলোক, মহিলা আর ছেলেটি একটা মিষ্টির দোকানে বসে আছেন। হাসিমুখে ওঁদের কাছে যেতেই অনি দেখল মহিলার মুখ কালো হয়ে গেল। একটা চেয়ার খালি ছিল, অনি সেটা ধরতেই তিনি চিৎকার করে উঠলেন,'বসো না, বসো না, খবরদার, ছোঁয়া লেগে যাবে।'

হাঁ হয়ে গেল অনি।

মহিলা স্বামীকে বললেন, 'ওকে এখান থেকে যেতে বলে দাও। সংক্রামক রোগ অলরেডি ওর ভেতরে এসে গিয়েছে কিনা কে জানে।?'

ভদ্রমহিলার দিকে আড়চোখে দেখে নিয়ে ওঁর স্বামী অনিকে বললেন, 'তুমি বরং কার্বলিক সোপ দিয়ে হাতটা ধুয়ে নিও। হিরোর ডেফিনেশন সব মানুষের কাছে সমান নয় ভাই। উইশ ইউ গুড লাক।'

ভীষণ কান্না পেয়ে গেল অনির। কোনরকমে দ্রুত দোকান থেকে বেরিয়ে এল সে। খাবার ইচ্ছেটা এখন একদম চলে গেছে। এসব রোগ কি সংক্রামক ? তার ভেতরে কি চলে আসতে পারে? এখানে কার্বলিক সোপ সে কোথায় পাবে? চারদিকে তাকিয়ে হঠাৎ নাকের কাছে হাতটা নিয়ে এল সে। না তো, কোন গন্ধ নেই। এই সময় সামনের বাসে হর্ন বেজে উঠতে সে দেখল তার ওপর আলিপুরদুয়ার লেখা, বাসটা এখনই ছাড়বে। স্বর্গছেঁড়ার ওপর দিয়ে একে যেতে হবে।

প্রায় অন্ধের মতন সে বাসে উঠে বসল। এখান থেকে মিষ্টির দোকানটা দেখা যাচ্ছে। জানলার পাশের সিটে বসে অনি দেখল ওদের টেবিলে বড় বড় রাজভোগ এসে গিয়েছে। আজ অবধি কেউ তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করেনি। সে কি জানতো লোকটার খারাপ অসুখ আছে? একটা মানুষ ডুবে যাচ্ছে দেখে তার বুকের মধ্যে এমন একটা ব্যাপার হল যে সে ঠিক থাকতে পারেনি। হঠাৎ ওর মনে পড়ল, মাঝিগুলো তো নির্দ্বিধায় লোকটাকে টেনে তুলেছিল। ওরা কি কার্বলিক সোপে হাত ধোবে? ওদের মনে যদি কোন চিন্তা না এসে থাকে, সে এত ভাবছে কেন? মহিলা নিশ্চয় ভুল বুঝেছেন অথবা তিনি মোটেই আধুনিক নন। সংস্কার না থাকার নামই নাকি আধুনিক হওয়া, আমেরিকানদের মত— মন্টু প্রায়ই বলে। ওর মনে পড়ল মাঝি ওকে বলেছে, আপনি যা করেছেন তা ক'জনে পারে?

অদ্ভুত একটা শান্তি একটু একটু করে ফিরে আসছিল অনিব।

এই সময় ড্রাইভার গাড়ি ছাড়ল দুবার হর্ন বাজিয়ে। সামান্য লোক হয়েছে গাড়িতে। কন্ডাক্টর দরজা বন্ধ করে চেঁচাল,'ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, স্বর্গছেঁড়া, বীরপাড়া — আলিপুরদুয়ার।' আর বাসটা এবার নড়তেই হঠাৎ অনি লক্ষ্য করল কি একটা ছুটে আসছে তার দিকে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই সেই কালো মতন জিনিসটা চটাং করে এসে লাগল জানলার ওপরে। একটা কাদার তাল ঝুলে থাকল জানলায়। একটু নিচু হলেই সেটা গলে অনির মুখে এসে লাগত।

বিস্মিত, হতভম্ব অনি সমস্ত শরীরে কাঁপুনি নিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল একটা লোক ওকে দেখে চেঁচাচ্ছে,'কেন বাঁচালি, কেন বাঁচালি, মরতে চেয়েছিলাম—কেন বাঁচালি?'

সেই আধখানা শরীরটা নৌকোর ওপর থেকে এসে ভেজা কাপড়ে

হিংস্র হয়ে লাফাচ্ছে আর নাকিস্বরে অনির দিকে তাকিয়ে একই কথা বলে যাচ্ছে। ও কি করে টের পেল যে অনি বাঁচিয়েছে? নিশ্চয়ই কেউ বলে দিয়েছে। অনির বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল, চোখের সামনে জলের আড়াল। ও তাড়াতাড়ি কাচের জানলাটা বন্ধ করে দিল। ঝাপসা হয়ে গেলে সব মানুষকে সমান দেখায়।

বাবার অসুখের খবর পেয়ে জোর করে দাদু তাকে পাঠালেন কিন্তু ধূপগুড়ি না পেরোনো পর্যন্ত সেকথা খুব একটা মনেপড়েনি অনির। ডুডুয়া নদী ছাড়িয়ে রাস্তাটা বাঁক নিতে যেই স্বর্গছেঁড়া চা-বাগানের গাছগুলো চোখে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে একটা উত্তেজনা হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল। কদিন বাদে সে আবার এইসব গাছগাছালি, ডানদিকের মদেসিয়া কুলিদের ঘরবাড়ি দেখতে পাচ্ছে। মুখ বাড়িয়ে একটাও পরিচিত মুখ দেখল না ও। যদিও স্বর্গছেঁড়া বাজার এখান থেকে মাইল দুয়েক, তবু কেউ কেউ তো এদিকে আসতেও পারে। তারপর যেই বিরাট শালের মাঝখানে কাজ-করা ফুলের মত চা-বাগানের মধ্যিখানে মাথা তোলা ফ্যাক্টরী-বাড়িটা চোখে পড়ল তক্ষুনি ওর বুকটা কেঁপে উঠল। বাবার খুব অসুখ, ওই ফ্যাক্টরীতে বাবা নিশ্চয়ই কাজ করতে যেতে পারছেন না। চা-বাগানের শেষে বাঁ দিকে বাবুদের কোয়ার্টার, দু'দুটো চাঁপা গাছ বুকে নিয়ে বিরাট খেলার মাঠ চুপচাপ পড়ে আছে। অনি চিৎকার করে বাস থামাল।

মাটিতে নামতেই ইউক্যালিপটাস গাছের শরীর-ছোঁয়া বাতাসটাকে নাকভরে টেনে নিয়ে ও চারপাশে তাকাল। কোয়ার্টারগুলোর দরজা বন্ধ। রাস্তার এপাশে মাড়োয়ারীদের দোকানের সামনে একজন পশ্চিমাগোছের লোক উবু হয়ে বসে তাকে দেখছে। চোখাচোখি হতে দাঁত বের করে হাসল, অনি তাকে চিনতে পারল না। বাড়ির সামনে পাতাবাহারের যে সার দেওয়া গাছগুলো ছিল সেগুলো যেন শুকিয়ে এসেছে। ক্লাবঘর তালাবন্ধ। অনি বারান্দায় উঠে এসে দরজার কড়া নাড়ল।

ডানদিকের খিড়কি দরজা খুলে বাগান দিয়ে বাড়ির ভেতরে যাওয়া যায়, কিন্তু হঠাৎ এই সদরের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ওর মনটা কেমন হয়ে গেল। এখন এ বাড়িতে মা নেই। এই বারান্দা, এ বাড়ির ঘর উঠোন যে

কোন জায়গায় ও মাকে কল্পনা করতে পারে। মা মারা গেছেন জেনেও মাঝে মাঝে নিজের সঙ্গে খেলা করে ভাবত মা স্বর্গছেঁড়ায় আছেন, গেলেই দেখা হবে। এখন এই সত্যটার সামনাসামনি দাঁড়িয়ে অদ্ভুত কষ্ট হচ্ছিল ওর। মায়ের কথা ভাবতে ভাবতে বাবাকে মনে পড়ে যেতে শক্ত হয়ে দাঁড়াল অনি। বাবার কি হয়েছে? দাদু কেন জোর করে ওকে স্বর্গছেঁড়ায় পাঠালেন? হঠাৎ অনি কুঁই-কুঁই শব্দ পেয়ে পেছন ফিরে তাকাতেই দেখতে পেল একটা কালো রঙের ঘেয়ো নেড়ি কুকুর চার পা মুড়ে মাটিতে বসে ওর দিকে কেমন আদুরে চোখে তাকিয়ে শব্দ করছে। কুকুরটাকে চিনতে পারল! ওমা, এঁটো ভাত দিতেন , কালু বলে ডাকতেন, আর একদম পছন্দ করতেন না পিসীমা কুকুরটাকে। আশ্চর্য, ও কি করে অনিকে চিনতে পারল! আর একবার কড়া নাড়তেই ভেতরে খিল খোলার শব্দ হল। দরজার কপাট খুলে যেতে অনি দেখল ছোট মা দাঁড়িয়ে আছে।

'ওমা, তুমি! কী চমকে দিয়েছ, আমি ভাবলাম কে না কে?' সত্যিই অবাক হয়ে গেছে ছোট মা, হাত বাড়িয়ে অনির ব্যাগটা নিয়ে কাছাকাছি হতেই আবার বলল,'আরে, তুমি যে দেখছি আমাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছ মাথায়!'

অনি এখন চট করে কথা বলতে পারছিল না। অনেকদিন ছোট মা জলপাইগুড়ি যায় নি। মহীতোষ একা গেছেন মাস কয়েক আগে। কিন্তু একটা মানুষের চেহারা যে এই সামান্য কয়েক মাসের ব্যবধানে এত খারাপ হতে পারে ছোট মাকে না দেখলে বোঝা যাবে না। কি রোগা হয়ে গেছে শরীরটা! দেখে মনে হয় ছোট মারই খুব কঠিন অসুখ হয়েছে। কিন্তু গলার ওপর অতখানি কাটা দাগ কেন? অনি সেদিকে তাকিয়ে বলল,'তুমি কি পড়ে গিয়েছিলে?'

'না তো!' বলেই ছোট মা প্রশ্নটা বুঝতে পারল, 'ও হ্যাঁ, খোঁচা লেগেছিল একবার। তা তুমি হঠাৎ চলে এলে যে, স্কুল কি ছুটি?'

'না,ছুটি না। দাদু জোর করে পাঠালেন, বাবার নাকি খুব অসুখ! কি হয়েছে?' অনি ছোট মার পেছনে পেছনে ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

ওদের বাইরের ঘরটা সেইরকমই রয়ে গেছে। এমন কি দু'দুটো সোফার ওপরে যে কভার ছিল সেগুলো অবধি একই রকম আছে, ছিড়ে যায় নি। ছোট মা বলল,'অসুখ মানে? বাবাকে কে খবর দিল?' ছোট মা ঘুরে ওর

দিকে তাকাল।

'জানি না। কাল বোধ হয় কেউ দাদুকে বলেছে। কিন্তু বাড়ি আসার সময় একটা রিকশার সঙ্গে অ্যাক্সিডেন্টে দাদুর পা ভেঙে গেছে, আজ প্লাস্টার করে হাসপাতাল থেকে আসবে।' অনি খবরটা দিল।

'ও মা! কি করে হল? এখন কেমন আছেন?'

'ভাল।'

'কিন্তু ওঁর এই অবস্থায় তুমি চলে এলে কেন?'

'কি করব! দাদু যে জোর করে আমাকে পাঠালেন, কোন কথা শুনতে চাইলেন না। বাবা কোন্ ঘরে ? এখন কেমন আছেন?'

খুব আস্তে ছোট মা বললেন,'এখন ভাল আছেন, ফ্যাক্টরীতে গিয়েছেন।'

অবাক হয়ে গেল অনি,'সে কি! তাহলে কাল যে দাদু খবর পেলেন বাবা খুব অসুস্থ! দাদু লোকের কথায় চট করে বিশ্বাস করেন!' অনির মনে হল ছোট মা খুব কষ্ট করে হাসতে চেষ্টা করল।

মাঝের ঘরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল অনি। কোন জানলা খোলা নেই, যাওয়া-আসার দরজায় ভারী পর্দা ঝোলানো। প্রায়ান্ধকার ঘরের এক কোণায় টেবিলের ওপর প্রদীপ জ্বলছে। সেই প্রদীপের আলোয় অনি দেখতে পেল মাধুরী খুব গম্ভীর মুখে তাকিয়ে আছেন। বেশ বড় ফ্রেমের চৌহদ্দিতে মাধুরীর একটা অচেনা ছবি এনলার্জড করে ধরে রাখা হয়েছে। যেহেতু ঘরের ভেতর আলো আসার রাস্তা নেই তাই ছবির ওপর পড়া প্রদীপের আলোটা অদ্ভুতভাবে চোখ কেড়ে নেয়। অনির মনে হল মাকে যেন দেব-দেবীর মত লাগছে, এ-বাড়ির সবাই এখানে এসে পূজা করে যায়। কিন্তু এই বন্ধ ঘরে কিছুক্ষণ থাকলে দম বন্ধ হয়ে যাবে। একটা চাপা অস্বস্তি সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। মুখ ঘুরিয়ে ছোট মার দিকে তাকাতেই দেখল ছোট মা একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। খুব দ্রুত অনি বলল,'জানলা বন্ধ করে রেখেছ কেন, খুলে দাও।'

সঙ্গে সঙ্গে ছোট মা চমকে উঠল, 'না, না। এ ঘরের জানলা খোলা বারণ। চল, ভেতরে যাই।' ছোট মা আর দাঁড়াল না। অনি দেখল ঘরের ভেতর ঠিক ছবির সামনে একটা খাট পাতা। ঘরটা থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে ছবিটার দিকে আর একবার তাকিয়ে ওর মনে হল মা যখন খুব গম্ভীর হয়ে যেতেন অথবা কোন কারণে যখন মায়ের মন খারাপ হয়ে যেত তখন

এইরকম দেখাত।

ভেতরের ঘরে যেখানে অনিরা শুতো সেখানে একটা ছোট খাট আর তার চারপাশের কাপড়চোপড় দেখে বুঝতে অসুবিধে হল না যে এটা ছোট মার ঘর, ছোট মা একাই শোয় এখানে।

ছোট মা বলল,'আগে একটু জিরিয়ে নাও, আমি তোমার জন্য খাবার করি।'

অনি বলল,'ঝাড়িকাকু কোথায়?'

ছোট মা যেন সামান্য ভ্রূকুটি করল,'তুমি জান না?'

অনি ঘাড় নাড়ল। ছোট মা মুখ নিচু করে বলল,'তোমার বাবার সঙ্গে তর্ক করেছিল বলে উনি তাড়িয়ে দিয়েছেন। তা আমার অসুবিধে হচ্ছে না কিছু, একা মানুষ সারাদিন বসে থাকতাম. এখন কাজ করতে করতে বেশ দিনটা কেটে যায়।'

ছোট মা উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলে অনির মনে হল ও যেন একদম অচেনা কোন পরিবেশে চলে এসেছে।

খাওয়া-দাওয়াব পর মহীতোষ এলেন। খুব শব্দ করে। জুতো মশমশিয়ে। বারান্দায় পা দিয়ে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে যেন অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। এই কয় মাসে লাউডগার মত চড়চড় করে বেড়ে গেছে শরীরটা, মাথায় মহীতোষকে ধরতে আর দেরি নেই নিজের ছেলেকে এখন হঠাৎ লোক-লোক বলে মনে হল মহীতোষের। চোখাচোখি হতেই গলা ঝাড়লেন মহীতোষ,'কখন এলে?'

অনি কয়েক পা এগিয়ে এসে বাবাকে প্রণাম করল। প্রণাম সেরে উঠতে উঠতে ওর খেয়াল হল ছোট মাকে প্রণাম করেনি। এখন চারপাশে ছোট মাকে দেখতে পেল না। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল,'একটু আগে।'

বাবার চেহারাটা এবকম হয়ে গেল কি করে? কেমন রোগা-রোগা, চোখের তলায় কালি, গাল ভাঙা। মাথার চুল লালচে-লালচে—মাঝে মাঝে চিকচিক করছে। অসুখটা কি! মহীতোষ বললেন,'স্কুল বন্ধ?'

'না। অসুখের খবর শুনে দাদু জোর করে পাঠালেন।'

'অসুখ? কার অসুখ ? আরে না, না, কে এসব বাজে কথা রটায়। আমি

ভাল আছি। স্কুল যখন খোলা তখন আসা উচিত হয় নি। তোমার মা থাকলে রাগ করতেন। তোমার এখন ফার্স্ট ডিউটি অধ্যয়ন। তোমার মায়ের ঘরে গিয়েছ?' মহীতোষ চোখ বড় বড় করে তাকালেন।

অনির হঠাৎ মনে হল বাবা ঠিক স্বাভাবিক ভাবে কথা বলছেন না। কথাগুলো যেন অসংলগ্ন এবং সেটা তিনি নিজেও টের পাচ্ছেন। মায়ের ঘর মানে? যে ঘরে মায়ের ছবি আছে সেই ঘর? ও না বুঝে ঘাড় নাড়ল।

মহীতোষ বললেন,'গুড। ও ঘরে গিয়ে চুপচাপ করে বসে থাকলে দেখবে, ইউ ক্যান ফিল হার!' অনি লক্ষ্য করল কথাটা বলার সময় বাবার চোখ কেমন জ্বলজ্বল করে উঠল।

ছোট মাকে রান্নাঘর থেকে জলখাবার নিয়ে বের হতে দেখে বাবা হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন,'আচ্ছা, তুমি তাহলে আজকের দিনটা থাক অনি। স্কুল কামাই করা ঠিক কথা নয়। দাদু কেমন আছেন?'

'ভালো না। গতকাল এ্যাক্সিডেন্টে ওঁর পা ভেঙ্গে গেছে। হাসপাতালে ছিলেন, আজ বাড়িতে আসবেন।' অনি বলল।

মহীতোষ চমকে উঠলেন, 'অ্যাঁ! দাদুকে হাসপাতালে রেখে তুমি চলে এসেছ? আশ্চর্য অকৃতজ্ঞ ছেলে! লেখাপড়া শিখে তুমি বাঁদর তৈরী হচ্ছ! যে তোমাকে বুকে আগলে রেখেছে তার প্রতি কর্তব্য বলে কিছু নেই! ছি ছি ছি!'

জীবনে এই প্রথম কেউ তাকে এসব শব্দ দিয়ে তৈরী কড়া বাক্য শোনাল। অনি বাবার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সমস্ত শরীরে একটা আলোড়ন অনুভব করল। তারপর কোনরকমে বলল,'আমি আসতে চাই নি, দাদু জোর করে পাঠালেন।'

এখন অনির আর কান্না পাচ্ছিল না, এত শক্ত কথা শুনেও ওর ভেতরে কোন অভিমান হচ্ছিল না। বরং ও খুব শক্ত হয়ে সিটিয়ে দাঁড়াল।

বাগানের এলাকা ছাড়িয়ে আসাম রোড ধরে বাজারের দিকে হাঁটতে বেশ অবাক হয়ে গেল অনি। দুপাশে এত দোকানপাট হয়ে গেছে যে, জায়গাটাকে চেনাই যায় না। আগে যেসব জায়গায় শুধু হাটবারে ত্রিপল টাঙিয়ে দোকান বসত সেখানে বেশ মজবুত কাঠের দোকানঘর দেখতে পেল সে। দোকানদারদের অধিকাংশই অচেনা, বোঝা যাচ্ছে বাইরে থেকে প্রচুর লোক স্বর্গছেঁড়ায় এসে স্থায়ী আস্তানা গেড়ে বসেছে। শুয়োর-কাটার মাঠটা ছাড়িয়ে আগে নদী, ওপারের ধানক্ষেত স্পষ্ট দেখা যেত, এখন সব আড়ালে পড়ে গিয়েছে।

বিলাসের মিষ্টির দোকানটা বেশ বড় হয়েছে যেন, নতুন শো-কেসের মধ্যে মিষ্টির থালাগুলো দূর থেকে দেখা যায়। বিলাসকে কাছেপিঠে দেখল না সে। আঙরাভাসা নদীর পুলটার ওপরে এসে দাঁড়াল অনি। নীচে লকগেটের তলা দিয়ে সেই রকম জল প্রচণ্ড স্রোতে ফেনা ছড়িয়ে বয়ে যাচ্ছে ওদের কোয়ার্টারের পিছন দিক দিয়ে ফ্যাক্টরীর হুইল ঘোরাতে। অনির মনে পড়ল বাপী একবার বলেছিল, এখান থেকে সাঁতরে বাড়ির পেছন অবধি যাবে, আর যাওয়া হয়নি।

★ ★ ★

ভরত হাজামের দোকানটা নেই। সেখানে বেশ বড়সড় সেলুন হয়েছে, ওপরে সাইনবোর্ডে নাম পড়ল অনি, 'কেশচর্চা'। রাস্তা থেকেই ভেতরের বড় বড় আয়না, চেয়ার দেখা যায়। বুকে সাদা কাপড় বেঁধে তিনজন লোক চুল কাটছে খদ্দেরের। সেই ল্যাংড়া কুকুর বা ভরত হাজাম, কাউকে কাছেপিঠে চোখে পড়ল না। নাচ বুড়িয়া নাচ, কান্ধে পর নাচ—অনি হেসে ফেলল।

চৌমাথায় এসে অনির চমক আরো বেড়ে গেল। স্বর্গছেঁড়া যেন রাতারাতি শহর হয়ে গিয়েছে। পুরো চৌমাথা ঘিরে পান সিগারেট,রেস্টুরেন্ট আর স্টেশনারি দোকানে ছেয়ে গেছে। ওপাশের পেট্রলপাম্পের গায়ে অনেক নতুন নতুন সাইনবোর্ড ঝুলছে। সকাল পেরিয়ে যাওয়া এই সময়টায় আগে স্বর্গছেঁড়ার রাস্তায় লোকজন থাকত না বললেই চলে, এখন জলপাইগুড়ির মত জমজমাট হয়ে আছে। এমন সময় কুচবিহার-জলপাইগুড়ি রুটের একটা বাস এসে স্ট্যান্ডে দাঁড়াতে অনি সেদিকে তাকাল। দু'তিনজন কুলি মাল বইবার জন্য ছুটে গেল সেদিকে। তাদের একজনের দিকে নজর পড়তে অনি সোজা হয়ে দাঁড়াল, ঝাড়িকাকু! হাফপ্যান্ট আর ময়লা একটা ফতুয়া মতন পরে বাসের মাথার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে, স্বর্গছেঁড়ায় এখন কেউ মালপত্র নিয়ে নামল না। অনির মনে হচ্ছিল, ও ভুল দেখছে। সেই ঝাড়িকাকু এখন কুলিগিরি করছে! ভিড়টা একটু হালকা হতে ঝাড়িকাকু ঘুরে দাঁড়াতে রাস্তার এপাশে দাঁড়ানো অনির সঙ্গে চোখাচোখি হল। অনি দেখল, প্রথমে যেন চিনতে পারেনি চট করে, তারপর হঠাৎ ঝাড়িকাকুর চেহারাটা একদম অন্য রকম হয়ে গেল। যেন অনিকে দ্যাখেনি এমন ভান করে দ্রুত পা চালিয়ে অন্যদিকে চলে যেতে চাইল। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে অনি আর দেরি করল না। পেছন পেছন দৌড়ে গিয়ে চিৎকার করতে লাগল,'ও ঝাড়িকাকু, ঝাড়িকাকু!'

কয়েক পা হেঁটে বোধ হয় আর এড়াতে পারল না ঝাড়িকাকু দাঁড়িয়ে পড়ল। হাঁপাতে হাঁপাতে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াল অনি, 'আরে, তুমি আমাকে দেখেও চলে যাচ্ছিলে কেন?' ঝাড়িকাকুর একটা হাত ধরল সে। খুব বুড়িয়ে গেছে ঝাড়িকাকু। মুখে কাঁচা-পাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি। গাল ভেঙ্গে গেছে, হাতটা থরথর করে কাঁপছে। তারপরই মুখ বিকৃত করে

অতবড় মানুষটা একটা কান্না চাপবার চেষ্টা করে যেতে লাগল প্রাণপণে। কারো চোখে জল দেখলেই অনির চোখ কেমন করে ওঠে, 'এই, তুমি কাঁদছ কেন?'

এবার হাউমাউ করে উঠল ঝাড়িকাকু, 'তোর বাবা আমাকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে রে, এই একটুখানি দেখেছি মহীকে, সে আমাকে দূর করে দিল!'

এরকম একটা দৃশ্য প্রকাশ্য চৌমাথায় ঘটতে দেখে মুহূর্তেই বেশ ভিড় জমে গেল। দু'তিনজন কুলিগোছের লোক ঝাড়িকাকুকে বারংবার জিজ্ঞাসা করতে লাগল, কি হয়েছে? কে মেরেছে?

অনি দেখল লঙ্কাপাড়া থেকে একটা প্রাইভেট বাস এসে স্ট্যাণ্ডে দাঁড়াতেই কুলিরা সেদিকে ছুটে গেল। ঝাড়িকাকু একবারও বাসটার দিকে না তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কখন এলি? কর্তাবাবু কেমন আছে?'

'সকালে। দাদুর পা ভেঙে গেছে কাল, এমনিতে ভাল আছে।'

'সে কি? পা ভাঙল কেন? এই বুড়ো বয়সে— পড়ে গিয়েছিল?'

'না, রিকশায় ধাক্কা লেগেছে।'

শুনে ঝাড়িকাকু জিভ দিয়ে কেমন একটা চুক চুক শব্দ করল।

'দিদি কেমন আছে?'

'ভাল। কিন্তু তুমি কেমন আছ?'

'আমি ভাল নেই রে।' ঝাড়িকাকু ওকে নিয়ে হাঁটতে লাগল স্কুলের রাস্তায়।

যদিও শরীর দেখেই বোঝা যায় তবু অনি জিজ্ঞাসা করল, 'কেন?'

'আমার যে কেউ নেই রে, একা একা কি ভাল থাকা যায়!' অনি কথাটা শুনে ঝাড়িকাকুর হাতটা চট করে জড়িয়ে ধরে হাঁটতে লাগল। ঝাড়িকাকু বলল, 'তুই আমার সঙ্গে হাঁটছিস দেখলে মহী রাগ করবে।'

'কেন, রাগ করবে কেন! তুমি কি আমার পর?'

'তুই যে কবে বড় হবি!'

'আমি তো বড় হয়েছি, তোমার চেয়ে লম্বা!'

'এই বড় নয়। যে বড় হলে মহীর মত আমাকে চড় মারা যায়!'

'কেন তোমাকে মেরেছিল বাবা?' কি করেছিলে তুমি?'

'কি হবে সেকথা শুনে! হাজার হোক মহী তোর বাবা, বাবার নিন্দে

কোন ছেলের শুনতে নেই।' মুখ ঘুরিয়ে নিল ঝাড়িকাকু।

তবু অনি জেদ ধরল, 'মা বলত সত্যি কথা বললে শুনলে কোন পাপ হয় না।'

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল ঝাড়িকাকু,'মা! তোর মায়ের কথা মনে আছে?

অবাক হয়ে গেল অনি, 'কেন থাকবে না! সব মনে আছে।'

'আমি খবরটা শুনে বিশ্বাস করতে পারিনি। এই সেদিন কর্তাবাবু মহীকে বিয়ে দিয়ে নিয়ে এলেন তোর মাকে। তারপর তুই হলি— কি যে হয়ে যায় সব। তোর মা চলে গেলে মহীটা একদম ভেঙে পড়েছিল। তখন রোজ রাত্রে ওর ঘরে শুতাম আমি । একা শুলেই কান্নাকাটি করত। ওর খাটের পাশে মাটিতে শুয়ে আমি শুধু তোর মায়ের কথা ছাড়া সব গল্প করতাম।' ঝাড়িকাকু কথা থামিয়ে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলল।

এসব খবর অনির জানা নেই। ঝাড়িকাকু কোন রকমে তখন বাবাকে রান্না করে খাওয়াচ্ছে— এই খবরটাই শুনেছিল শুধু। তাই বাকিটা শোনার জন্য বলল, 'তারপর?'

বাঁ হাতেব ডানায় চট করে মুখটা ঘষে নিয়ে ঝাড়িকাকু বলল, 'তারপর যখন মহীর আবার বিয়ের কথা উঠল তখন ও কিছুতেই রাজী হচ্ছিল না। আমারও পছন্দ ছিল না। কিন্তু অন্য বাবুরা বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওর মত করিয়ে বিয়ে দিয়ে দিল।' হঠাৎ ওর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝাড়িকাকু বলল, 'তোর নতুন মায়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে?'

হেসে ফেলল অনি,'বা রে! কেন হবে না?'

ঝাড়িকাকু বলল, ' বড় ভাল মেয়ে রে। বিয়ের পর বছর তিনেক তো বেশ ভাল ছিল সবই। আমি ভাবতাম, যাক, এই ভাল হল। তোর মায়ের অভাব টেব পেতে দিত না মেয়েটা। এমন কি আমার সঙ্গে থেকে গরুর কাজও শিখে নিয়েছিল। যে গেছে তার জন্যে মানুষ কতদিন দুঃখ করতে পারে! কিন্তু এই মেয়েটা রাতারাতি যেন এই বাড়ির লোক হয়ে গেল।'

'আরে! তুমি আমাদের বড়বাবুর নাতি না?'

অনি মুখ ঘুরিয়ে দেখল, একজন বৃদ্ধ মতন লোক ওর দিকে তাকিয়ে আছেন।

মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'বড়বাবু কেমন আছেন?' বৃদ্ধ যেখানে দাঁড়িয়ে তার পিছনে বিবাট

স-মিল। অনি এতক্ষণে চিনতে পারল।ওঁর নাম হারাণচন্দ্র পাল। খুব বড়লোক। দু-তিনটে স-মিল আছে, বাস-টাস, জমিটমি আছে। দাদুর কাছে শুনেছে অনি একদম ছোটবেলায় ইনি স্বর্গছেঁড়ায় এসে মুড়ি বিক্রি করতেন। পা ভাঙার কথাটা বলতে গিয়েও ঘাড় নাড়ল অনি। ক্লাসে সংস্কৃতের স্যার পড়া জিজ্ঞাসা করলে মন্টু এইরকম ভাবে ঘাড় নাড়ে। হ্যাঁ কিংবা না দুটোই হয়।

'ভাল,ভাল। তুমি তো বেশ বড় হয়ে গেছ হে। কিন্তু এত রোগা কোন? তালপাতার সেপাই! আরে দেশ গড়তে গেলে স্বাস্থ্য ভাল চাই। সেই পনেরই আগস্ট সকালে ফ্ল্যাগ তুলেছিলে তুমি, যতই বড় হও, দেখেই চিনেছি। হেঁ হেঁ। বেশ বেশ।' বৃদ্ধ হাসি-হাসি মুখ করে ছবির মত দাঁড়িয়ে আছেন দেখে ওরা আবার হাঁটতে লাগল। সাতচল্লিশ সালের পনেরই আগস্টের কথাটা বৃদ্ধ বলতেই ওর বেশ রোমাঞ্চ হচ্ছিল। স্বর্গছেঁড়ায় অনেকেই নিশ্চযই মনে করে রেখেছে তার কথা। উঃ, ফ্ল্যাগটা কি দারুণ উড়েছিল!

ভবানীমাস্টারের মুখটা মনে পড়তেই ও দেখা করার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠল। ঝাড়িকাকু চুপচাপ কিছু ভাবছিল। ও বলল, 'চল, স্কুলে যেতে যেতে সব শুনব।'

'কেন, স্কুলে কি হবে?' ঝাড়িকাকু ব্যাপারটা পছন্দ করল না।

'ভবানীমাস্টারকে দেখে আসি।'

'কাকে?'

'ভবানীমাস্টার। আমাদের পড়াত না? ভবানীমাস্টার, নতুন দিদিমণি!'

'ও! সে স্কুল তো উঠে গিয়েছে। এখন হিন্দুপাড়ায় বিরাট স্কুল হয়েছে। তোমাদের সেই নতুন দিদিমণির বিয়ে হয়ে গিয়েছে মরাঘাটে। আর ভবানীমাস্টারের খুব অসুখ, বাঁচবে না।'

'কি হয়েছে?' অনি সেই মুখ মনে করতে চেয়ে স্পষ্ট দেখে ফেলল।

'শরীর নাকি অবশ হয়ে গেছে। কলোনিতে আছে, আমি দেখিনি।'

একটা অদ্ভুত নিঃসঙ্গতা-বোধ অনিমেষকে ঘিরে ধরল আচমকা। এইসব মানুষ এবং এই পরিচিত জায়গাটা যদি এমনি করে তার চেহারা পালটে একদম অচেনা হয়ে যায় তাহলে কি করবে।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর কাঁঠাল গাছতলায় এসে দাঁড়াল অনি। বাড়ি ফেরার পর থেকে ছোট মার সঙ্গে কথাই হচ্ছে না প্রায়। এমন কি অনিকে খাবার দেবার সময় মনে হচ্ছিল রান্নাঘরে ওঁর খুব কাজ, সামনে দাঁড়িয়ে গল্প করার সময় পাচ্ছেন না। উঠোনে ডাঁই করা বাসন অথচ বাড়িতে কাজের লোক নেই —বাবার ওপর অনি ক্রমশ চটে যাচ্ছিল। ছোট মাকে এখন সব কাজ করতে হয়। বিয়ের পর পায়েসের বাটি হাতে নিয়ে ওর ঘরে আসা ছোট মার সঙ্গে এখন কেমন রোগা জিরজিরে হয়ে যাওয়া ছোট মার কোন মিল নেই। সত্যি বলতে কি ছোট মার জন্য ওর কষ্ট হচ্ছিল।

অনির খাওয়া হয়ে যাবার পর মহীতোষ এলেন। ভাগ্যিস এক সঙ্গে খেতে বসা হয়নি! তখন বাবার পাশে বসে চুপচাপ শব্দ না করে চিবিয়ে খাওয়া, একটা দমবন্ধ-করা পরিবেশে কথা না বলে খাবার গেলা— অনির মনে হল ও খুব বেঁচে গেছে। কাঁঠাল গাছতলায় দাঁড়িয়ে বাবার গলা শুনতে পেল সে,'অনি কোথায় ?' ছোট মার জবাবটা স্পষ্ট হল না। মহীতোষ গলা চড়িয়ে বললেন, 'এই রোদ্দুরে টো টো করে না ঘুরে মায়ের কাছে গিয়ে বসতে তো পারে। ভক্তি নেই, বুঝলে, আজকালকার ছেলেদের মাতৃভক্তি নেই।' ছোট মার গলা শোনা গেল না।

অনি ঘুরে দাঁড়াল। ও ভাবল চেঁচিয়ে বাবাকে বলে যে মাকে ও যেরকম ভালবাসে তা বাবা কল্পনা করতে পারবে না। কিন্তু বলার মুহূর্তে যেন অনির মনে হল কেউ যেন তাকে বলল, কি দরকার, কি দরকার! কিছুদিন হল অনি এই রকম একটা গলা মনে মনে শুনতে পায়। যখনই কোন সমস্যা বড় হয়ে ওঠে, তার খুব অভিমান বা রাগ হয়, তখনই কেউ একজন মনে মনে তাকে নিষেধ করে। এই নিষেধ যদি চুপচাপ মেনে নেওয়া যায়, তা হলে কোন ক্ষতি হয় না। ক'দিন আগে একটা ব্যাপার হয়েছিল। ওদের স্কুলে একজন নতুন টিচার এসেছেন দক্ষিণেশ্বর থেকে, খুব ভক্ত লোক। আর বেশ ভাল লেগেছিল দেখতে। একদিন হলঘরে প্রেয়ারের পর উনি

ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দিলেন 'ওঁ ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ।' ওরা ভেবেছিল এটা মাস্টারমশাই-এর নিছক খেয়াল। দিন সাতেক পরে হঠাৎ ক্লাসে এসে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন লাইনটা কার স্পষ্ট মনে আছে, কে লিখতে পারবে? কেউ খেয়াল করেনি, ফলে এখন ঠিকঠিক সাহস পাচ্ছিল না। অনি সঠিক জবাব দিতে তিনি ওকে কাছে ডেকে বললেন, 'চিরকাল লাইনটা মনে রাখবে। সুখে কিংবা দুঃখে, বিপদে-আপদে মনে মনে লাইনটা বলে নিজে কপালে মা শব্দটা লিখবে। দেখবে তোমার অমঙ্গল হবে না।' কথাটা বলে ওর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'রামকৃষ্ণ কে ছিলেন জানো তো?' ঘাড় নেড়েছিল অনি।

'গুড। তিনি ছিলেন পরম সত্য, পরম আনন্দ। তাঁর আলোর কাছে কোন অন্ধকার ঘেঁষতে পারে না।'

কথাগুলো তখন ভাল করে বুঝতে না পারলেও মনে মনে তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে নিয়েছিল অনি। তারপর থেকে এই প্রক্রিয়াটাকে অনেকবার কাজে লাগিয়েছে ও । যেমন, বিকেল ফুরিয়ে সন্ধ্যে হয়ে গেলে দেরি করে বাড়ি ফেরার জন্য বুকটা যখন ঢুকঢুক করে ওঠে তখন চট করে ওই চারটে শব্দ আওড়ে কপালে মা লিখলে অনি লক্ষ্য করেছে কোন গোলমালে পড়তে হয় না। এই আজকে যখন ঝাড়িকাকুকে চৌমাথায় ছেড়ে ও বাড়ি ফিরল তখন মনে হচ্ছিল এখন বাবার মুখোমুখি হতে হবে, একসঙ্গে খেতে হবে। বাড়িতে ঢোকার আগে প্রক্রিয়াটা করতে ফাঁড়া কেটে গেল।

রামকৃষ্ণকে ভগবান মনে করে প্রণাম করার একটা কারণ থাকতে পারে কিন্তু এটা অনিমেষের কাছে স্পষ্ট নয় মাস্টারমশাই কেন 'মা' শব্দটা কপালে লিখতে বলেছিলেন? আশ্চর্য, শব্দটা লেখার পর সারা শরীর মনে কেমন একটা নিশ্চিন্তি সৃষ্টি হয়।

সারা দুপুর ওর প্রায় টো-টো করেই কেটে গেল। ওদের বাড়ির পেছনের বাগানের সেই চেনা-চেনা গাছগুলো অদ্ভুত বড়সড় আর অগোছালো হয়ে গিয়েছে। সেই বুনো গাছগুলো যাদের বুকে জোনাকির মত হলুদ ফুল ফুটতো তেমনি ঠিকঠাক আছে। এই দুপুরে ঘুঘুগুলো একা-একা হয়ে যায় কেন? এমন গলায় কি কষ্টের ডাক যে ডাকে! অনি ঘুরতে ঘুরতে নদীর কাছে এসে দেখল জলেরা এখনও তেমনি চুপচাপ বয়ে যায়।

এক সময় সূর্যটা খুঁটিমারির জঙ্গলের ওপাশে মুখ ডোবালে স্বর্গছেঁড়া

ছায়া-ছায়া হয়ে গেল। এখন একরাশ পাখির চিৎকার আর মদেসিয়া কুলিকামিনদের ভাঙা ভাঙা গান জানান দিচ্ছিল রাত আসছে। নদীর ধার ধরে অনি চা-বাগানের মধ্যে চলে গিয়েছিল। ছোট ছোট পায়েচলা পথ, দু'পাশে ঠাসবুনোট কোমরসমান চায়ের গাছে ফুল ফুটেছে, শেড্‌ট্রিগুলোতে ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়াপাখি বসে সবুজ করে দিয়েছে। এখন চা-বাগানের মধ্যে কেউ নেই। লাইনে ফেরার জন্য পথ সংক্ষেপ করে কোন কোন কামিন মাথায় বোঝা নিয়ে দূর দূর দিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ এই নির্জন পরিবেশে বিশাল সবুজের অঙ্গীভূত ঢেউ-এ দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে অনির মনে হতে লাগল ও খুব একা, ভীষণ একা। ওর মা নেই, বাবা নেই, কোন আত্মীয় বন্ধু নেই। ঠিক এই মুহূর্তে ও দাদু বা পিসীমার কথা ভাবতে চাইছিল না। ওঁদের বিরুদ্ধে অনির কোন অভিযোগ নেই কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওঁরা যেন কেমন চুপচাপ হয়ে যাচ্ছেন। পৃথিবীর কিছুই যেন তাঁদের স্পর্শ করে না তেমন করে। তোমাদের দুটো জননী, একজন গর্ভধারিণী অন্যজন ধরিত্রী—যিনি তোমাকে বুকে ধারণ করেছেন। নতুন স্যারের সেই কথাগুলো মনে হতেই এই নির্জন সন্ধ্যা-নামা সময়টায় চা-বাগানের ভিতর দিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে গলা কাঁপিয়ে গাইতে লাগল, 'ধন-ধান্য-পুষ্প-ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা।'

না, বাড়িতে ইলেকট্রিক আসেনি। অনিরা প্রথম যখন জলপাইগুড়িতে গেল তখনই মহীতোষ সব বন্দোবস্ত করে কলকাতা থেকে ডায়নামো আনবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা আসেনি। ফলে এখন রাত্রে এ বাড়িতে হ্যারিকেন জ্বলে। দুটো নতুন জিনিস দেখল অনি, সন্ধ্যে চলে গেলেও ক্লাবঘরে হ্যাজাক জ্বলল না, কেউ এল না তাস খেলতে। আর সব বাবুরা সাইকেলে চেপে টর্চ জ্বালতে জ্বালতে যে যার কোয়ার্টারে ফিরে গেলেও মহীতোষ ফিরলেন না। অথচ রাত হয়ে গেছে বেশ, চা-বাগানে যে রাতটায় কুলি লাইনে মাদল বাজা শুরু হয়ে যায়। অনি ঠিক বুঝতে পারছিল না ও কোন্ ঘরে থাকবে। যদি বাইরের ঘরে থাকতে হয় তা হলে মহীতোষ ফেরার আগেই খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়লেই ভাল। সন্ধ্যের পর বাড়ি ফিরলে ছোট মা একবার জিজ্ঞাসা করেছিল, 'খাবে না?'

সত্যি সারাদিন এত ঘুরেও একটুও ক্ষিদে পায়নি অনির। ও না বলেছিল, ছোট মা আর কথা বাড়ায়নি। সামনের মাঠে গাঢ় অন্ধকার নেমেছে। আসাম রোড দিয়ে মাঝে মাঝে হুস হুস করে হেডলাইট জ্বালিয়ে গাড়ি ছুটে যাচ্ছে। অনি ঠিক করল কাল সকালের ফার্স্ট বাসে ও জলপাইগুড়ি ফিরে যাবে।

একটু বাদে ও খিড়কি দরজা খুলে উঠোন পেরিয়ে ভেতরে এল। ঘরের মধ্যে দিয়ে এলে মায়ের ছবির ঘরটা পার হতে হবে যেটা অনি কিছুতেই চাইছিল না। রান্নাঘরের বারান্দায় উঠে ও দেখল দরজাটা খোলা। ভিতরে কাঠের উনুনে কিছু একটা ফুটছে আর উনুনের পাশে উবু হয়ে গালে হাত দিয়ে ছোট মা বসে আছে। জ্বলন্ত কাঠের লাল আগুনের আভা এসে পড়েছে গালে, স্থির হয়ে কোন ভাবনায় ডুবে থাকা চোখের পাতায়, চুলে, কাপড়ে। চারপাশের অন্ধকারে ছোট মাকে কাঠের উনুনের আঁচ মেখে এখন একদম অন্য রকম দেখাচ্ছিল। অনি এসে দরজায় দাঁড়াতেও ছোট মার হুঁশ হল না। ভাগ্যিস এখানে চুরিচামারি বড় একটা হয় না!

অনি রান্নাঘরে ঢুকতে ছোট মা চমকে সোজা হয়ে বসল, তারপর অনিকে দেখে আঁচলটা ঠিক করে নিল, ' ওমা তুমি? সারাদিন কোথায় ছিলে? '

'ঘুরছিলাম।' অনি খুব আস্তে আস্তে উত্তরটা দিল। ও রান্নাঘরটা দেখছিল। মা যখন ছিল তখন এরকম ব্যবস্থা ছিল না। বোধ হয় কাজ করার সুবিধে অনুযায়ী মানুষ সব কিছু নিজের মত করে নেয়। ছোট মা ওর মুখের ওপর দৃষ্টিটা রেখেছিল, চোখাচোখি হতে বলল, 'খিদে পেয়েছে?'

অনি ঘাড় নাড়ল,'না। আচ্ছা, একটা লম্বা কাঠের পিঁড়ি ছিল, ওপরে গোলাপের ফুল আঁকা, সেটা কোথায়?'

অবাক হল ছোট মা, 'কেন?'

অনি বলল, 'ঐ পিঁড়িটায় আমি বসতাম। রাত্তির বেলায় খুব ঘুম পেয়ে গেলে এই ঘরে পিঁড়িটায় বসে খেয়ে নিতাম।' কথাটা শুনে ছোট মা হাসল, তারপর উঠে পাশের ঘরে গিয়ে সেই পিঁড়িটাকে এনে মাটিতে পেতে দিল, 'বোস, গল্প করি।'

অনি পিঁড়িটায় বসে বেশ আরাম পেল, 'আজকাল ক্লাবে তাস খেলা হয় না?'

প্রশ্নটা করতেই ছোটমা ঘাড় নাড়ল,'না।'

'কেন?'

তরকারিতে হয়তো খুন্তি চালাবার কোন দরকার ছিল না, তবু ছোট মা সেটা নিয়ে কিছুক্ষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ল, তারপর বলল, 'জানি না।'

'বাবা কখন আসবে?'

অনির দিকে পেছন ফিরে তরকারি নামাতে নামাতে ছোট মা বলল, 'ওঁর ফিরতে দেরি হবে, তুমি খেয়ে শুয়ে পড়। কালকে আবার যেতে হবে তো!'

এখানে থাকতে যদিও তার একটুও ইচ্ছা করছিল না, তবুও এখন অনির কেমন রাগ হয়ে গেল, 'বাঃ, তুমি তো আমাকে একসময় আসবার জন্য চিঠি লিখেছিলে, এখন চলে যেতে বলছ কেন?'

মুখটা পলকে কালো হয়ে গেল ছোট মার। অনি দেখল, নিজেকে খুব কষ্টে সামলে নিচ্ছে ছোট মা। তারপর বলল, 'তখন তো তোমার এত পড়াশুনা ছিল না।'

হঠাৎ সোজা হয়ে বসল অনি, 'ঝাড়িকাকুকে বাবা তাড়িয়ে দিয়েছে কেন?'

ছোট মা দু চোখ তুলে ওকে দেখল, 'তাড়িযে দিয়েছে কে বলল?'

'আমার সঙ্গে ঝাড়িকাকুর দেখা হয়েছিল।' অনির কেমন জেদ ধরে যাচ্ছিল। ছোট মা কি ওকে খুব বাচ্চা ভেবেছে? এভাবে কথা লুকিয়ে যাচ্ছে কেন?

'এসব কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করো না, আমি বলতে পারব না।'

'তুমি আমাকে বন্ধু বলেছিলে না?'

ছোট মা কোন উত্তর দিল না। উঁচু করে রাখা দুটো হাঁটুর ওপর গাল রেখে চুপ করে রইল। অনি বলল, 'বাবা আগে এমন ছিল না, মা থাকতে বাবা একদম অন্য রকম ছিল।'

খুব গাঢ় গলায় ছোট মা বলল, 'কি জানি! বোধ হয় আমি খারাপ, তাই!'

উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসল অনি, 'তুমি মিথ্যে কথা বলছ।'

হঠাৎ ঝট করে উঠে বসল ছোট মা, 'বেশ, আমি মিথ্যে কথা বলছি। আমার খুশী তাই বলছি।'

'কেন? মিথ্যে কথা বললে—।' অনি কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না।

কেউ অন্যায় করছে এবং এরকম জেদের সঙ্গে স্বীকার করছে—কখনো দ্যাখেনি সে।

খুব কাটা-কাটা গলায় ছোট মা বলল, 'উনি যা করছেন করুন তবু আমাকে এখানে থাকতে হবে। আমার পেটে বিদ্যে নেই যে রোজগার করব। ভাইদের কাছে গলগ্রহ হয়ে থাকার চেয়ে এখানে অপমান সহ্য করা অনেক সুখের। নিজের জন্যে মিথ্যে বলতে হবে, আমাকে আর প্রশ্ন করবে না তুমি।'

অনি চুপ করে গেল। ছোট মার কথাগুলো বুঝে উঠতে সময় লাগল। ওর হঠাৎ মনে হল এতক্ষণ ও যে-ভাবে কথা বলেছে সেটা ঠিক হয়নি। জলপাইগুড়িতে প্রথম পরিচয়ের দিন যাকে বন্ধু এবং নিজের চৌহদ্দির মধ্যে বলে মনে হয়েছিল, এখন এই রাত্রে তাকে ভীষণ অচেনা বলে মনে হতে লাগল। কিন্তু ছোটমা তাকে একটা চূড়ান্ত সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বাবার এই সব কাজ, কাজ না বলে অত্যাচার বলা ভাল, ছোট মাকে মুখ বুজে সহ্য করতে হচ্ছে তার ভাইদের কাছে গিয়ে থাকা সম্ভব নয় বলে। ছোট মা যদি লেখাপড়া শিখতো তাহলে চাকরি করতে পারত, সেটাও সম্ভব নয়। আচ্ছা, আজ যদি বাবা তাকে—। সঙ্গে সঙ্গে অনি যেন চোখের সামনে সরিৎশেখরকে দেখতে পেল, পেয়ে বুকে বল এল। দাদু জীবিত থাকতে তাব কোন ভয় নেই। কিন্তু দাদুকে আজকাল কেমন অসহায় লাগে মাঝে মাঝে, পিসীমার সঙ্গে টাকাপয়সা নিয়ে প্রায়ই চাপা কথা-কাটাকাটি হয়। হোক, তবু তার দাদু আছে কিন্তু ছোট মার কেউ নেই। ও গম্ভীর গলায় বলল, 'তুমি চিন্তা করো না। আমি পাস করে চাকরি করলে তুমি আমার কাছে গিয়ে থাকবে। বাবা কিছু করতে পারবে না।'

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ছোট মা বলল, 'ছি! বাবাকে কখনো অসম্মানের চোখে দেখতে নেই, ভুল বুঝতে পাবলে তিনি ঠিক হয়ে যাবেন।'

অনি কিছুতেই বুঝতে পারছিল না, বাবার বিরুদ্ধে কিছু বললেই ছোট মা একদম সমর্থন করে না কেন? ছোট মা উঠে মিটসেফ থেকে একটা বিরাট জামবাটি বের করে ওর সামনে এনে রাখল, 'তোমার জন্যে করেছি। বাড়িতে তো আর দুধ হয় না, অনেক কষ্টে এটুকু যোগাড় করতে পেরেছি।' অনি দেখল জামবাটির বুক-টৈটম্বুর পায়েসের ওপর কিসমিসগুলো ফুলে ফেঁপে ঢোল হয়ে আছে, একটা তেজপাতা তিনভাগ শরীর ডুবিয়ে কালো

মুখ বের করে আছে। চোখাচোখি হতে ছোট মা বলল, 'ভাল না হলেও খেতে হবে অনি, দিদির মত হয়নি আমি জানি।'

অনি হাসল, ছোট মা সেই প্রথম দিনের কথাটি এখনও মনে রেখেছ।

'এ বেলা একদম নিরামিষ, তোমার খেতে অসুবিধে হবে খুব।'

ছোট মার কথা শুনে হাসল অনি, 'এতখানি পায়েস পেলে আমার কোন খাবারের আর দরকার নেই।' একটা চা-চামচ দিয়ে ধারের দিকের একটু পায়েস নিয়ে মুখে দিয়ে বলল, 'ফাইন!' তারপর চোখ বুজে সেটাকে ভালভাবে গলাধঃকরণ করে বলল, 'পিসীমার চেয়ে একটু কম ভাল হয়েছে তবে মায়ের চেয়ে অনেক ভাল। পিসীমা ফার্স্ট , তুমি সেকেণ্ড, মা থার্ড।'

ইদানীং সরিৎশেখর কোরা ধুতি পরেন। এক জোড়া মিলের কাপড় সস্তায় কিনে দুটো টুকরো করে নেওয়া যায়। সব দিক দিয়ে খরচ কমিয়েও যেন আর তাল ঠিক রাখতে পারছেন না। হেমলতার সঙ্গে এখন প্রায়ই তাঁর ঝগড়া হয় জিরে মরিচ কয়লা নিয়ে। বিশ সের কয়লায় এক সপ্তাহ যাওয়ার কথা, সেখানে একদিন আগে হেমলতা কোন্ আক্কেলে ফুরিয়ে ফেলেন! এসব কথাবার্তা চলার সময় যদি অনি এসে পড়ত তা হলে আগে ওঁরা চুপ করে যেতেন। কিন্তু ইদানীং আর যেন তার প্রয়োজন হয় না। খালি বাড়িতে দুজন চিৎকার করলে বাইরের লোকের কানে যাবে না। পবম সুখে ওঁদের ঝগড়া করতে দ্যাখে অনিমেষ। পিসীমার মেজাজ আরো খারাপ, কারণ ক'দিন আগে ব্যাঙ্ক থেকে পিসীমার টাকা তুলে দাদু বাড়ির কাজে লাগিয়েছেন।

বাড়িতে এখন মাছ আসে না। হেমলতার যত বয়স হচ্ছে তত মাছের গন্ধ সহ্য করতে পারছেন না। স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, মাছ খাবার ইচ্ছে হলে লোক রাখুন বা হোটেলে গিয়ে খেয়ে আসুন। সরিৎশেখরের মাছ খাওয়া বন্ধ হয়েছিল আগেই, শুধু অনিমেষের জন্য মাছ আসত বাড়িতে। হেমলতার চেঁচামেচিতে তিনি সেটা বন্ধ করে দিলেন এবং হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। জলপাইগুড়িতে মাছের দাম এখন আকাশ-ছোঁয়া। কই মাগুর চল্লিশ টাকা সের বিক্রি হচ্ছে। পোনা মাছ চালান আসে বাইরে থেকে,

সেখানে ঢোকে কার সাধ্য। বাজারের বরাদ্দ টাকার প্রায় আড়াই ভাগ অনির মাছের পেছনে চলে যেত। সেটা বেঁচে যেতে মনটা একটু খারাপ হলেও স্বস্তি পেলেন। সম্প্রতি ইংরেজী কাগজে একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছে আমিষ নিরামিষ নিয়ে। ভেজিটেবল প্রোটিন অ্যানিমেল প্রোটিনের চেয়ে অনেক বেশী কার্যকর। ভারতবর্ষের প্রচুর মানুষ যে নিরামিষ আহার করে তাতে তাদের কার্যক্ষমতা বিন্দুমাত্র কমে না। বরং অনুসন্ধানে জানা গেছে যে নিরামিষাহারী মানুষ দীর্ঘজীবী হয়। কাগজটা তিনি অনিকে পড়তে দিয়েছিলেন। যদিও মাঝে মাঝে তাঁর এই নাতির মুখে এক টুকরো মাছ দিতে পারছেন না বলে মনে মনে আক্ষেপ হয়, কাউকে বলেন না।

বাজার-দর হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। গ্রাম অঞ্চল থেকে মানুষের মিছিল কাজের আশায় শহরে ভিড় করছে। এমনিতেই তাঁদের শহর পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশী খরচের জায়গা, কারণ এখানে ধনীদের প্রাধান্য বেশী। সরিৎশেখরের মাথার ঠিক থাকছে না, হেমলতার সঙ্গে ঝগড়া বেড়ে যাচ্ছে। তাঁর মনে হচ্ছে সবাই ঠকাচ্ছে তাঁকে। যে গয়লাটা দুধ দিয়ে যায় তার সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল অতিরিক্ত জল মেশাচ্ছে বলে। কয়লাওয়ালা কাঁচা কয়লা দিয়ে টাকা লুটছে। পর পর কয়েক বছর বন্যা এসে পলিমাটি ফেলে বাগানটার যে চেহারা হয়েছে তাতে লোক দিয়ে শাকসবজি লাগালে কোন কাজ হবে না। মহীতোষ যে টাকা পাঠায় তা বাড়ছে না। এদিকে বাজার-দর যে থেমে থাকছে না। ছেলের কাছে টাকা চাইতে এখন আর কুণ্ঠা নেই কিন্তু মহীতোষের সাধ্যের সীমাটা তিনি জানেন। যে টাকাটা সে পাঠাচ্ছে তাতে অনিমেষ হোস্টেলে আরামে থাকতে পারে।

মাস শেষ হতে আর দুদিন আছে। সরিৎশেখর কিং সাহেবের ঘাট থেকে বেড়িয়ে ফিরছিলেন। আজ ছুটির দিন, কোর্টকাছারি বন্ধ। স্বর্গছেঁড়া থেকে কোন লোক তাই শহরে আসেনি। অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছিলেন তিনি। আজ সকালে বাজার করার পর ওঁর কাছে তিনটে আধুলি পড়ে আছে। সামনে আরো দুটো দিন, তারপর স্বর্গছেঁড়া থেকে টাকা আসবে। কি করে এই দু-দিন চলবে? চাকরি করার সময় স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি তাঁকে কোনদিন এই অবস্থায় পড়তে হবে। হঠাৎ ওঁর মনে হল রিটায়ার করার পর বেশীদিন বেঁচে থাকার কোন অর্থ হয় না। দীর্ঘজীবী অকর্মণ্য হয়ে থাকলে এইসব সমস্যার সামনে দাঁড়াতেই হবে।

আজকাল জোরে হাঁটলে ভাঙা পা-টা টনটন করে। খুব আস্তে আস্তে তিনি পি ডব্লু ডি অফিসের সামনে দিয়ে হেঁটে আসছিলেন। ওদিকে তিস্তার পাশের রাস্তা দিয়ে হাঁটা যায় না। এতদিন পর তিস্তা বাঁধ প্রকল্প হয়েছে। প্রতি বছরের বন্যা থেকে বাঁচবার জন্য জলপাইগুড়ি শহরের গা ঘেঁষে বাঁধ দেওয়া হচ্ছে। জোর তোড়জোড় চলছে ওখানে। পি ডব্লু ডি-র অফিসটা পেরোতেই একটা জিপ গাড়ি সজোরে ওঁর পাশে ব্রেক কষে দাঁড়াল। এখন খুব সতর্ক হয়ে রাস্তার বাঁ পাশ ঘেঁষে হাঁটেন সরিৎশেখর। চোখ তুলে দেখলেন দুই-তিনজন লোক জিপ থেকে নেমে তাঁর দিকে আসছেন।

ধুতিপরা এক ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যাঁ স্যার, আমার ভুল হয়নি, ইনিই সরিৎশেখরবাবু।' মাথা নেড়ে একজন লম্বাচওড়া টাই-পরা ভদ্রলোক সরিৎশেখরের সামনে এসে হাত জোড় করে নমস্কার করলেন, 'আপনি সরিৎশেখরবাবু?'

একটু অবাক হয়ে ঘাড় নাড়লেন সরিৎশেখর।

'ভালই হল পথে আপনার সাথে দেখা হয়ে। আমরা আপনার বাড়িতে যাচ্ছিলাম। আমি তিস্তা বাঁধ প্রকল্পের অ্যাসিস্ট্যান্ট একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র।'

সরিৎশেখর নমস্কার করে উদ্দেশ্যটা শুনবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

সঙ্গের ভদ্রলোক বললেন, 'স্যার, বাড়িতে গিয়ে কথা বললে ভাল হয় না?'

ইঞ্জিনিয়ার বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ভাল। আপনি বোধ হয় বাড়িতেই যাচ্ছিলেন, তা আসুন আমার গাড়িতেই যাওয়া যাক।'

তাঁর জবাবের জন্য অপেক্ষা না করে ভদ্রলোক জিপের দিকে এগিয়ে গেলেন। এক-একজন মানুষ আছেন যাঁরা কথা বললেই একটা কর্তৃত্বের আবহাওয়া তৈরী হয়ে যায়। যেন তিনি যা বলছেন তার পর আর কোন কথা থাকতে পারে না। সরিৎশেখর বুঝতে পারছিলেন না যে তাঁর সঙ্গে তিস্তা বাঁধ প্রকল্পের কি সম্পর্ক থাকতে পারে! ইঞ্জিনিয়র জিপে বসে আবার ডাকলেন, 'কই, আসুন?'

অগত্যা সরিৎশেখরকে জিপে উঠতে হল। ধারের দিকে জায়গা করে দিলেও সরিৎশেখরের বসতে অসুবিধে হচ্ছিল। শক্ত হাতে সামনের রড আঁকড়ে বসে ছিলেন তিনি, জিপটা হু হু করে টাউন ক্লাবের পাশ দিয়ে ছুটে

যাচ্ছিল। ইঞ্জিনিয়র বললেন, 'আপনার ফ্যামিলি মেম্বার কত, মানে এই বাড়িতে?'

সরিৎশেখর বললেন, 'তিনজন। কেন?'

ইঞ্জিনিয়ার অবাক হলেন,' সে কি! আপনার বাড়ি তো শুনেছি বিরাট বড়। তা এত বড় বাড়িতে তিনজন মানুষ কি করেন?'

সরিৎশেখর এবার ইঙ্গিতটা বুঝতে পারলেন, 'ব্যবহার হয় না ঠিক নয়, আত্মীয়স্বজনরা এলে থাকবে তাই করা।'

ততক্ষণে জিপটা বাড়ির কাছাকাছি এসে গেছে। রাস্তাটা আগে বড় ছিল। কিন্তু যেহেতু জমিটি পি ডব্লু ডি-র, সরিৎশেখর অনেক চেষ্টা করেও তাদের স্টাফদের কোয়ার্টার বানাবার ব্যাপারে বাধা দিতে পারেননি। এখন জমি ঘিরে রাস্তাটা এত সরু হয়ে গেছে যে রিকশা অথবা একটা জিপ কোনক্রমে ঢুকতে পারে। এই নিয়ে বহু চিঠি লিখেছেন তিনি, কোন কাজ হয়নি।

ইঞ্জিনিয়ার বললেন, 'বাবাঃ, এত সরু রাস্তা! মিউনিসিপ্যালিটি অ্যালাউ করল?'

সরিৎশেখর বললেন, 'আপনাদের সরকার বাহাদুরের ব্যাপার, আমরা বললে তো হবে না!'

ভদ্রলোক যেন বিরক্ত হয়েছেন খুব, 'না না, এ খুব অন্যায়। বাড়ি করতে দিলে তাকে যাতায়াতের রাইট দিতে হবে। ঠিক আছে, আমি ব্যাপারটা দেখছি।'

গেট খুলে বাড়িতে ঢুকে সরিৎশেখর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার বলুন তো, আপনাদের আসবার উদ্দেশ্যটা আমি ঠিক ধরতে পারছি না।'

ইঞ্জিনিয়ার তখন কোমরে হাত দিয়ে বাড়িটা দেখছিলেন। এখন ভর-বিকেল, রোদ গাছের মাথায়। নতুন বাড়িটা খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। সরিৎশেখরের দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক বললেন, ' আমরা শহরে ভাল বাড়ি খালি পাচ্ছি না। আজ আপনার বাড়ির খবরটা পেয়ে চলে এলাম। তিস্তা বাঁধ প্রকল্পের ব্যাপারে এ বাড়িটা আমরা চাই।'

'চাই মানে?' হতভম্ব হয়ে গেলেন সরিৎশেখর।

'অবশ্যই ভাড়া চাই। তবে ভেতরটা দেখে নিতে হবে আগে।'

'আপনি বাড়ি ভাড়া নিতে এসেছেন?'

'আমি নয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।'

সরিৎশেখর কি করবেন বুঝতে পারছিলেন না। বাড়িটা ভাড়া দেবার কথা হেমলতা প্রায়ই বলে থাকেন তাঁকে। যেভাবে বাজার-দর বাড়ছে তাতে সামলে ওঠা যাচ্ছে না। এই তো আজই তাঁর পকেটে কয়েকটা আধুলি পড়ে আছে। আগে গল্পচ্ছলে বলতেন এই বাড়ি তাঁর ছেলের মতন, অসময়ে দেখবে। কিন্তু যাকে তাকে ভাড়া দিতে একদম নারাজ তিনি, বিশেষ করে ফ্যামিলিম্যানকে। এর আগে অনেকেই এসেছে তাঁর কাছে। কিন্তু হেগে-মুতে একাকার হয়ে যাবে বলে মুখের ওপর না বলে দিয়েছেন সবাইকে। এখন সরকার যদি তাঁর বাড়ি ভাড়া নেন তা হলে তো ঝামেলার কিছু থাকে না। মাস গেলে ভাড়াটা নিশ্চিত। তা ছাড়া জলপাইগুড়িতে এখন বাড়িভাড়া হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে, খালি পড়ে থাকলে বাড়ি নষ্ট হয়ে যাবে। ভাড়া দিলে প্রতি মাসের টাকাটায় কি উপকার হবে ভাবলে পায়ে জোর এসে যায়। কিন্তু, তবু একটা কিন্তু এসে যাচ্ছে যে মনে! যারা এসে থাকবে তারা লোক কেমন হবে! সরকারী অফিস তো, পাঁচ ভূতের ব্যাপার, বাড়ির ওপর কারো দয়ামায়া থাকবে না।

ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক ততক্ষণে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেছেন। সরিৎশেখর ওঁর পেছন পেছন উঠতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ভাবছেন আপনি'?

সবিৎশেখর সত্যি কথাটা একটু অন্যভাবে বললেন, 'এ বাড়ি ভাড়া দেব কিনা আমি তো এখনও ঠিক করিনি। তা ছাড়া ছেলেদের সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

ভদ্রলোক এবার গম্ভীর হয়ে বললেন, ' কিছু মনে করবেন না। আমাদের ওপর নির্দেশ আছে যে কোন খালি বাড়ি আমরা প্রয়োজন বোধ করলে রিকুইজিশন করে নিতে পারি। যে কয় বছর ইচ্ছে আমরা থাকব—আপনার কিছু বলার থাকবে না। তাই আপনি আমার সাজেশনটা নিন, ভাড়া দিতে রাজী হয়ে যান, নইলে পরে আফসোস করবেন।'

এদিকটা জানতেন না সরিৎশেখর। সঙ্গে সঙ্গে ওঁর মাথা গরম হয়ে গেল। এরা কি ভয় দেখিয়ে তাঁর বাড়ি দখল করতে চায়? সরকারের কি এ ক্ষমতা আছে? ওঁর মনে পড়ল সেই পঞ্চাশ সালে কংগ্রেস থেকে তাঁব বাড়িতে অফিস করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু তখন কেউ ভয় দেখায়নি।

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলালেন তিনি। তারপর হেমলতাকে ডেকে দরজা খুলতে বললেন। অনিমেষ বাড়িতে নেই। খুব বিরক্ত হলেন কথাটা শুনে। আজকাল সে কোথায় কোথায় ঘোরে টের পান না তিনি। মাথায় লম্বা হয়েছে, গালে দু-একটা ব্রণ বের হয়েছে। এই সময় মন চঞ্চল হয়।

সরিৎশেখর ইঞ্জিনিয়ারকে বাড়িটা দেখালেন। দুটো ঘর তাঁর চাই। বাকী ঘরগুলো ওঁরা নিতে পারেন। বাড়ি দেখে খুব খুশী ইঞ্জিনিয়ার। সরিৎশেখরের থাকার ঘর দুটো আলাদা করে দিলে সামনের দিকে সমস্ত বাড়িটাই ওঁদের হাতে আসবে। একদম সাহেবী বন্দোবস্ত, অফিস কাম রেসিডেন্স করতে কোন অসুবিধা নেই। ঘুরে ঘুরে খুব প্রশংসা করলেন সরিৎশেখর বাড়ি বানাবার দক্ষতার। দেখলেই বোঝা যায় নিজে দাঁড়িয়ে থেকে করানো, কোন কন্ট্রাক্টরের ওপর ছেড়ে দেওয়া নয়।

শেষ পর্যন্ত ইঞ্জিনিয়ার বললেন, 'কাল আমার অফিসে আসুন, ভাড়াটা ঠিক করে নেওয়া যাবে।'

সরিৎশেখর এতক্ষণ মনে মনে আঁচ করছিলেন কি রকম ভাড়া পাওয়া যেতে পারে!

এখন বললেন, 'সরকার কত ভাড়া দেবেন মনে হয়?'

ইঞ্জিনিয়ার বললেন, 'আমি এখনই বলতে পারছি না। ওপরতলার সঙ্গে কথা বলতে হবে। সাধারণত সরকার বাড়িভাড়া ঠিক করেন ভ্যালুয়ার দিয়ে, স্কোয়ারফিট মেপে। কিন্তু এখন তার সময় নেই। আমাদের ইমিডিয়েটলি বাড়ি দরকার, তাই এমার্জেন্সি ব্যাপার বলে আমরা নিজেরাই ঠিক করে অ্যাপ্রুভ করে নেব।'

সরিৎশেখর বললেন, 'তবু যদি আভাস দেন!'

ভদ্রলোক হাসলেন, 'দেখুন, এসব কথাবাতা তো এভাবে হয় না। আপনি চাইবেন ভাড়াটা বেশী হোক, আমরা চাইব কম হোক। ভ্যালুয়ার অবশ্যই বেসরকারী ভাড়া থেকে অনেক কম রেট দেবে। তাই মাঝামাঝি একটা ব্যবস্থা করতে হবে।'

ভাড়াটে আসার পর তেরাত্তিরও কাটেনি সরিৎশেখর অস্থির হয়ে উঠলেন। তিস্তা বাঁধ প্রকল্প অফিস বাড়ি ভাড়া নিচ্ছে, সইসাবুদ চুক্তি

হয়েছে, উনি ভেবেছিলেন আর পাঁচটা সরকারী অফিস যেমন হয় তেমনি দশটা-পাঁচটার ব্যাপার, সকাল সন্ধ্যে রাত নিশ্চিন্ত থাকা যাবে। অফিস হলেই গাড়ি আসবে ফলে সরিৎশেখর নিজে যা অনেক চেষ্টা করেও পারেননি সরকার নিজের প্রয়োজনেই বাড়ির দরজা অবধি রাস্তা বের করে নেবে। কিন্তু সে সব কিছুই হল না। প্রকল্পের দুজন ইঞ্জিনিয়র তাঁদের ফ্যামিলি নিয়ে এসে উঠলেন এ বাড়িতে। রেগেমেগে সরিৎশেখর চুক্তিপত্রটা খুলে দেখলেন তাঁর হাত-পা বাঁধা। তিনি শুধু সরকারকে বাড়ি ভাড়াই দিয়েছেন, কিন্তু কোথাও বলেন নি যে পরিবার নিয়ে কেউ বসবাস করতে পারবে না। অথচ চুক্তিতে সই করার আগে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছিলেন যে, এর আগে অনেকের ফ্যামিলি নিয়ে থাকবার জন্য ভাড়ার প্রস্তাব তিনি নাকচ করেছেন। দিনে দিনেই বাড়ির মধ্যে কাঠের একটা পার্টিশন হয়ে গেল, দেওয়ালে পেরেকের শব্দ হতেই সরিৎশেখরের মনে হল ওঁর বুক ভেঙে যাচ্ছে। তড়িঘড়ি ছুটে গেলেন ঘটনাস্থলে, চিৎকার চেঁচামেচিতে কোন কাজ হল না, মিস্ত্রিগুলো বধিরের মত কাজ শেষ করে গেল। সেই বিকেলেই সাধুচরণের কাছে ছুটলেন সরিৎশেখর। সাধুচরণ এখন আর তেমন শক্ত নয়। মেয়ে মারা যাবার পর স্ত্রী একদম উদোম পাগল হয়ে গিয়েছিল, সম্প্রতি তিনিও গত হয়েছেন। দুই ছেলে বিয়ে করে আলাদা হয়ে গিয়েছে, পাগলের সংসারে তারা থাকতে চায়নি। ফলে সাধুচরণের কি অবস্থা তা জানতে বাকি ছিল না সরিৎশেখরের। তবু ওঁরই কাছে ছুটলেন তিনি, বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে লোকটার বুদ্ধি খেলে খুব। সাধুচরণ সব শুনে খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'আপনি এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন?'

'উত্তেজিত হব না? কি বলছ তুমি! আমার বুকে বসে ওরা পেরেক ঠুকবে, সহ্য করব? ও বাড়ি আমার ছেলের চেয়েও আপন, বারো ভূতে লুটেপুটে খাবে, আমি দেখব?'

'আহা, আপনি বাড়ি ভাড়া দিয়েছেন, কে থাকল বা না থাকল তাতে আপনার কি দরকার! শুধু যদি ওরা কিছু ড্যামেজ করে তাহলেই লিগ্যাল অ্যাকশন নেওয়া যেতে পারে।'

'তুমি বলছ আইন আমাকে সাহায্য করবে না?'

'ঠিক এই মুহূর্তে নয়। যারা আসছে তাদের সঙ্গে মানিয়ে গুছিয়ে যদি

থাকা যায় তাহলে খারাপ কি! আপনারা একা একা থাকেন, বিপদে আপদে কাজ দেবে। তা ছাড়া, আপনার মেয়ে তো একদম নিঃসঙ্গ, ভাড়াটের মেয়েদের সঙ্গে ভাব হয়ে গেলে দেখবেন ও খুশি হবে।'

সরিৎশেখর তবু মেনে নিতে পারছিলেন না, 'দিনরাত চ্যাঁ-ভ্যাঁ এই বয়সে সহ্য হবে না। দেওয়ালে থুতু ফেলবে, পেন্সিল দিয়ে লিখবে, আমার বিলিতি বেসিনগুলো ভাঙবে, ওঃ, কি দুর্মতি হয়েছিল তখন রাজী হয়ে গেলাম!'

হাসলো সাধুচরণ, 'উঁহু, রাজী না হলে বাড়ি ওরা জোর করে নিয়ে নিত। সরকার তা পারে। তখন আঙুল কামড়াতে হত।'

কথাটা খেয়াল ছিল না সরিৎশেখরের। সাধুচরণের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকালেন তিনি। হঠাৎ ওঁর মনে হল, ছেলেদের মত এই বাড়িটাও বোধ হয় তাঁকে শেষ বয়সে জ্বালাবে।

অনিমেষ দাদুর ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছিল না। সরকার বাড়ির ভাড়া দেবে, কে থাকল বা না থাকল তাতে কি এসে-যায়। ওর নিজের খুব মজা লাগছিল। ওদের বাড়িতে নতুন কিছু মানুষ এসে থাকছে, রেডিওতে হিন্দী গান বাজছে, এটা কল্পনায় ছিল না। সরিৎশেখর বাইরের বারান্দায় দাঁড়ানো একজন মহিলাকে ভদ্রভাবে বলতে গেলেন যে জোরে হিন্দী গান বাজলে হেমলতার পুজোআচ্চার অসুবিধে হবে, বরং শ্যামাসঙ্গীত কীর্তন আর খবর শুনলে মন ভাল থাকে। কথাটা শুনে মহিলা হেসেই বাঁচেন না, বললেন, 'দাদু, আপনি কি কি পছন্দ করেন না তার একটা লিস্ট দিয়ে দেবেন। হিন্দী গান ভাল না, বুঝলাম। রবীন্দ্রসঙ্গীত?'

এইরকম একটা পরিবেশে নতুন মানুষজন এসে যাওয়ায় সন্ধ্যের পর আর নির্জন থাকল না। তবে যা কিছু আওয়াজ শোরগোল হচ্ছে তা বাড়ির ওদিকটায়। নতুন বাড়ির দু'খানা ঘর সরিৎশেখর নিজেদের জন্য রেখে দিয়েছেন। তার আসা যাওয়ার পথ আলাদা। ভাড়াটেরা দুটো ফ্ল্যাট করে নিয়েছেন। একটাতে মহিলা আর তাঁর স্বামী, অন্যটায় যিনি থাকেন তাঁর বোধ হয় বেশী দিন চাকরি নেই, দেখতে বৃদ্ধ মনে হয়। তাঁর ছেলে আর চাকর আছে। ছেলেটি অনিমেষদের চেয়ে কয়েক বছরের বড়, সব সময়

পাজামা আর গেরুয়া পাঞ্জাবি পরে। আনন্দচন্দ্র কলেজে পড়ে ও, মহিলা এসে পিসীমাকে বলে গিয়েছেন। পিসীমার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেছে ওঁর। আজ বিকেলে অনিমেষের সঙ্গে আলাপ হতে উনি জোর করে ওকে ওঁদের ঘরে নিয়ে গেলেন।

মহিলার নাম জয়া, ঘরে ঢুকেই তিনি বললেন, ‘ আমাকে তুমি জয়াদি বলে ডাকবে ভাই। আমার কর্তার দিকে তাকালে অবশ্য আমাকে মাসীমা বলতে হয়, তোমার কি ইচ্ছে করছে?’

অনিমেষ হেসে বলল, ‘আমার কোন দিদি নেই, আমি দিদি বলব।’

বসবার ঘরে পা দিয়ে সত্যি মজা লাগছিল ওর। এই ঘরগুলো কদিনে জব্বর ভোল পাল্টেছে। সুন্দর বেতের চেয়ার, দেওয়ালে একট বিরাট ঝরনার ক্যালেণ্ডার আব মস্ত বড় একটা বুককেস্—তাতে ঠাসা বই।

জয়াদি বললেন, ‘তুমি কোন্ ক্লাসে পড়?’

অনিমেষ গর্বের সঙ্গে উত্তরটা দিল।

‘ও বাবা, তাহলে তো তোমাকে খুব পড়তে হচ্ছে, আমি ডেকে আনলাম বলে পড়ার ক্ষতি হল না তো!’

‘না, না। আমি বিকেলবেলায় পডতে পাবি না।’

‘তুমি কারো কাছে প্রাইভেট পড?’

‘আগে পডতাম। টেস্টেব পর কোচিং ক্লাসে ভর্তি হব।’

‘তোমার বই পড়তে ভাল লাগে?’

‘বই—পড়ার বই?’

‘হুঁ পডাব বই, গল্পের বই, কবিতার বই।’

‘পড়ার বই-এর মধ্যে অঙ্কটা আমার একদম ভাল লাগে না। আমি চার রকমের অঙ্ক খুব ভালভাবে শিখেছি, যে কোন প্রশ্নই আসুক শুধু তা দিয়েই চল্লিশ নম্বর পেয়ে যাই।’

‘তাই নাকি ! যাঃ!’

‘সত্যি! সবল, চলিত নিযম, ল. সা. গু., গ. সা গু আর সুদের অঙ্ক।’

জয়াদি শুনে শব্দ করে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, ‘আমি তোমার সব খবর জেনে নিচ্ছি বলে কিছু মনে করছ না তো?’

‘না।’

‘আচ্ছা, এবার বল গল্পের বই কি কি পড়েছ?’ অনিমেষ এক পলক চিন্তা

করে নিল, 'বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, বিষবৃক্ষ, কপালকুণ্ডলা, সীতারাম। নীহাররঞ্জন গুপ্তের কালো ভ্রমর—'

সঙ্গে সঙ্গে আবার হাসি জয়াদির। হাসতে হাসতে বললেন, 'তুমি কালো ভ্রমর পড়েছো? ওঃ, দারুন না? দস্যু মোহন? ও বাবা, তাও পড়েছ! কিন্তু শোন, তোমাকে একটা কথা বলি, প্রায় একশ বছর আগে বঙ্কিমচন্দ্র যে সব বই লিখেছেন সেগুলোকে আমরা বলি অমর সাহিত্য। অমর মানে যা কোনদিন পুরোনো হয় না। আর কালো ভ্রমর হচ্ছে আইসক্রীম খাওয়ার মত, ফুরিয়ে গেলেই শেষ। তাই কখনো আনন্দমঠের সঙ্গে কালো ভ্রমরের নাম একসঙ্গে করো না। তাহলে বঙ্কিমচন্দ্রকে অশ্রদ্ধা করা হয়।'

এভাবে কেউ তাকে লেখকদের চিনিয়ে দেয়নি, অনিমেষ জয়াদিকে আরো পছন্দ করে ফেলল, 'আমাকে এখান থেকে বই পড়তে দেবেন?' আঙ্গুল দিয়ে ও বুককেসটাকে দেখাল।

'নিশ্চযই, কিন্তু আর কাউকে দেবে না। বই অন্যের হাতে গেলে তার পা গজিয়ে যায়। ঠিক আছে, আমি তোমাকে বই বেছে দেব। প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্রের সব বই তুমি পড়বে, তারপর শরৎচন্দ্র—।'

'আমি শরৎচন্দ্রের রামের সুমতি পড়েছি।' অনিমেষ মনে করে বলল।

'আচ্ছা। তারপর রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ পড়া হয়ে গেলে তোমার সব পড়া হয়ে যাবে।'

'রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা আমার মুখস্থ। ভীষণ ভালো, না?'

'যত বড় হবে তত ভাল লাগবে। কিন্তু তুমি পড়বে কখন, তোমার তো স্কুলের পড়ার চাপ এখন।'

একটুও দেরি করল না অনিমেষ, 'বিকেলবেলায় পড়ব। এখন থেকে আর বিকেলে খেলতে যাব না, খেললে রাত্রে পড়ার সময় ঘুম আসে।'

'বেশ, তাহলে বিকেলে এখানে বসে আরাম করে পড়বে রোজ; বাড়িতে নিয়ে গেলে পড়ার বই-এর তলায় গল্পের বই লুকিয়ে রাখবে, পড়া হবে না।'

অনিমেষ হেসে ফেলল, 'আমি কাল একটা বই কিছুতেই ছাড়তে পারছিলাম না বলে ওরকম করে পড়েছি। দাদু অল্পের জন্য ধরতে পারেননি।'

'কি বই সেটা?'

'পথের পাঁচালী। এখন যে সিনেমাটা হচ্ছে রূপশ্রীতে, সেই বইটা। ক্লাসের একটা ছেলের কাছ থেকে এনেছি। তুমি পড়েছ?'

হঠাৎ যে ও তুমি বলে ফেলেছে অনিমেষ নিজেই খেয়াল করেনি। জয়াদি আস্তে আস্তে বলল, 'দুর্গাকে তোমার কেমন লাগে?'

মুহূর্তে বুক ভার হয়ে গেল অনিমেষের, 'দুর্গার জন্য আমি কেঁদে ফেলেছিলাম, ওঃ, কি ভাল! আর জানো, পড়তে পড়তে নিজেকে অপু বলে মনে হয়।'

ওর দিকে তাকিয়ে জয়াদি বলল, 'আমারো নিজেকে দুর্গা বলে মনে হয়।'

অনিমেষ খুব দ্রুত প্রতিবাদ করতে গিয়ে চট করে থেমে গেল। ওর মনে হল, মায়ের মুখের সঙ্গে জয়াদির মুখের ভীষণ মিল। ও মাথা নিচু করে বসে থাকল।

জয়াদির সঙ্গে না আলাপ হলে অনিমেষ জানতেই পারতো না কি একটা অদ্ভুত জগৎ বইগুলোর মধ্যে আছে। গোগ্রাসে গিলে যাচ্ছে রোজ, অনেক কিছুই ও বুঝতে পারছে না।

এর মধ্যে শনিবার বাড়ি এসে শুনলে জয়াদি ডেকেছে। পিসিমা বললেন, 'মেয়েটা সাধ করে সিনেমার টিকিট কেটেছিল, কিন্তু ওর বর আসতে পারছে না কাজের জন্য, তুই যা না ওর সঙ্গে।' অনিমেষ সিনেমা দেখতে খুব একটা উৎসাহী ছিল না, তাছাড়া দাদু কি বলবেন সেটাও একটা চিন্তার ব্যাপার ছিল। পিসিমা বললেন, 'বাবা জানতে পারবে না, সন্ধ্যার মধ্যে ফিরে এলেই তো হল।'

জয়াদির সঙ্গে রিকশায় যেতে যেতে অনিমেষ বইটা যে পথের পাঁচালী তা জানতে পারল। আজ শেষ শো, কাল রবিবার থেকে অন্য বই। শুক্রবার থেকে এখানে নতুন ছবি দেখানো হয়, কিন্তু এবার কিছু গোলমাল হয়ে যাওয়ায় পুরোনো ছবিটা থেকে গেছে।

জয়াদি এবং অনিমেষ পাশাপাশি বসে ছবিটা দেখল। হলে আজকে একদম দর্শক নেই। অনেকদিন বাদে সিনেমা দেখতে এল অনিমেষ। মূল ছবির আগে গভর্মেন্টের ছবি দেখাল, তাতে জহরলাল নেহেরু, বিধানচন্দ্র রায়কে দেখতে পেল ও। একবার গান্ধীজিকে দেখাতেই হলের মুষ্টিমেয়

মানুষ অদ্ভুত গলায় হইচই করে উঠল, চিৎকারটা আনন্দের নয় মোটেই। কেন?

ছবি শুরু হতেই অনিমেষের মনে হল ও যেন স্বর্গছেঁড়ায় চলে গেছে। দুর্গা সর্বজয়া ক্রমশ স্বর্গছেঁড়ায় চলে এল ওর সঙ্গে। নিশ্চিন্তপুর আর স্বর্গছেঁড়া কখন মিলেমিশে এক হয়ে গেল তার অজান্তে। তারপর দুর্গা মারা যেতে সেই বৃষ্টির রাত্রে ছাদের ঘরে শুয়ে থাকা মাধুরীর মুখটাকে দেখতে পেল ও। সঙ্গে সঙ্গে ডুকরে কেঁদে উঠল অনিমেষ। ওর সারা শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল। জয়াদির একটা হাত ওর পিঠে এসে নামল, 'এই, কেঁদো না, এটা তো সিনেমা, সত্যি নয়।'

অনিমেষ বুঝতে পারল কথা বলার সময় জয়াদির গলার স্বর জড়িয়ে যাচ্ছে, জয়াদি কোনরকমে কান্নাটাকে চেপে যাচ্ছেন।

ছবি শেষ হবার পর গম্ভীর হয়ে গেল অনিমেষ। ওর মনে হল ও যেন নিজেই কখন অপু হয়ে গিয়েছে। জয়াদিও আর কোন কথা বলছেন না। সন্ধ্যে হবার অনেক আগেই ওরা রিকশায় চেপে বাড়িতে পৌঁছে গেল। পথের পাঁচালী সদ্য সদ্য পড়া ছিল অনিমেষের, তার ওপর এই ছবি দেখা, দুই-এ মিলে অদ্ভুত একটা প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেল ওর মধ্যে। যা বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্র এমন কি রবীন্দ্রনাথ পারেন নি, বিভূতিভূষণ সেটা সহজে যেন পেরে গেলেন। অনিমেষের খুব ইচ্ছে হচ্ছিল, ও যদি কখনো কলকাতায় যেতে পারে তাহলে বিভূতিভূষণের কাছে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকবে।

এবার জলপাইগুড়ি শহরে প্রচণ্ড শীত পড়েছে। প্রবীণেরা এর মধ্যেই বলতে আরম্ভ করেছেন, সেই চল্লিশ সালের পর এত মারাত্মক শীত নাকি তাঁরা দেখেন নি। অনিমেষের এইসব কথা শুনলে বেশ মজা লাগে। লোকেরা যে কি করে সব কথা মনে রাখে! এই যেমন বর্ষাকালে ঝম ঝম করে তিন দিন ধরে আকাশ ফুটো হয়ে বৃষ্টি পড়ল, অথবা জ্যৈষ্ঠ মাসে রাতদুপুরেও ঘেমে গিয়ে হাতপাখার বাতাস খেতে হল, ব্যাস, বৃদ্ধরা বলতে আরম্ভ করেন সেই অমুক সালের পর নাকি এবারের মতন বৃষ্টি বা গরম এর আগে দেখেননি।

তবে এবারের ঠাণ্ডাটা জব্বর কনকনে। ভোরবেলা বিছানা থেকে উঠে

মেঝেতে পা রাখতে একদম ইচ্ছে হয় না। সকাল হচ্ছে দেরিতে, সেই আটটা অবধি সামনের মাঠে কুয়াশারা চুপচাপ বসে থাকে। আবার সাড়ে চারটে বাজতে না বাজতেই অন্ধকার ডালপালা মেলে দেয়। এতদিন ওর কোন সোয়েটার ছিল না। তুষের চাদর গায়ে দিয়ে শীতটা দিব্যি কাটিয়ে দিত। সেই কোন ছেলেবেলার ফুলহাতা পুলওভারটা এখনও সুটকেসে তোলা আছে। ওর বন্ধুবান্ধবরা কত রকমারি সোয়েটার পরে বিকেলে বাঁধের ওপর বেড়াতে বের হয়—অনিমেষের এতদিন ছিল না, পরার প্রশ্নও ওঠেনি। এবার জয়াদি ওকে নীল-সাদা-হলুদ মেশানো একটা সোয়েটার তৈরি করে দিয়েছেন, কথা ছিল টেস্টে অ্যালাউড হলেই ও সেটা পাবে। অনিমেষ জানতো টেস্টে সে কখনই ফেল করবে না, তবু এর আগে তো কখনো টেস্ট দেয়নি, চিরকাল এ সময় অ্যানুয়াল পরীক্ষাই দিয়ে এসেছে, এবার তাই উত্তেজনা ছিল আলাদা রকম। কাল ফল বেরিয়েছে, জেলা স্কুল থেকে এই বছর সবাই টেস্টে পাস করে ফাইন্যাল পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে। অনিমেষের স্থান চতুর্থ: অর্ক, অরূপ, মন্টু এবং অনিমেষ। মন্টুর অবশ্য এই প্লেস পাওয়াতে কিছু যায় আসে না। তবে ইদানীং পড়াশুনায় মনোযোগী হয়ে পড়েছে যেন ও। এবার একটাও প্রশ্ন ইচ্ছে করে ছেড়ে আসেনি।

তিন মাস পর ফাইনাল পরীক্ষা। এবার ফি জমা দিতে হবে। কাল বিকেলে যখন বাড়িতে এসে ও খবরটা দিল তখন জয়াদি পিসীমার কাছে বসেছিলেন। খবর শুনে পিসীমা তো চেঁচামেচি করে দাদুকে ডাকাডাকি করতে আরম্ভ করলেন। জয়াদির সামনে পিসীমার কাণ্ড দেখে অনিমেষের লজ্জা-লজ্জা লাগছিল। কিন্তু জয়াদি চট করে পিসীমার দলে ভিড়ে গেলেন, 'ও বাবা, তুমি ফোর্থ হয়েছ?' জেলা স্কুলের ফোর্থ বয় মানে তো ফার্স্ট ডিভিসন একদম বাঁধা—ইস, এট্টুসখানি ছেলে কলেজে পড়তে চলল।'

চটির শব্দ হতে জয়াদি দৌড়ে চলে গেলেন আচমকা। অনিমেষ দাদুকে দেখে সামনে গিয়ে দাঁড়াল। টেস্টে পাস করলে কি প্রণাম করা উচিত?

সরিৎশেখর নাতির মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাদের বংশে কেউ ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করেনি। তোর এবারের মার্কস কেমন?'

অনিমেষ মাথা নীচু করে বলল, 'তিন নম্বর পেলে ফার্স্ট ডিভিসন হত।'

সরিৎশেখর মাথা নাড়লেন, 'তিন নম্বর কিছুই না, একটু পড়াশুনা করলে ওটা পেতে অসুবিধে হবে না। তুমি এখন বাইরের জগৎ থেকে

মনটা সরিয়ে নাও। জীবনে বার বার ফাইন্যাল পরীক্ষা আসে না।' কথাটা বলে চট করে ঘুরে ঘরের ভেতর চলে গেলেন। অনিমেষ দাদুর এই রকম নিরাসক্ত কথাবার্তায় অভ্যস্ত কিন্তু একটু পরেই চটির আওয়াজ ফিরে এল, 'এই নাও, রোজ খাওদাওয়ার পর দু চামচ করে খাবে।'

একটা বড় শিশিতে সিরাপ মতন কিছু তিনি অনিমেষের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। হতভম্বের মত সেটাকে হাতে নিয়ে অনিমেষ তার গায়ে কোন লেবেল দেখতে পেল না, 'এটা কি?'

সরিৎশেখর খুব নিশ্চিন্ত গলায় বললেন, 'ধীরেশ কবিরাজকে দিয়ে করিয়েছি, ব্রাহ্মী শাক থেকে তৈরী এই টনিকটা খেলে তোমার ব্রেন ভাল হবে, সব ব্যাপারে উৎসাহ আসবে। দেখবে তিন নম্বর পেতে কোন অসুবিধে হবে না।'

অনিমেষ বিহ্বল হয়ে পড়ল। কত আগে থেকে দাদু তার জন্য এত চিন্তা করেছেন। ও শিশিটাকে আঁকড়ে ধরল। সরিৎশেখর বললেন, 'তোমার ফাইন্যাল পরীক্ষার ফি কত, জানো?'

সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ল অনিমেষ, 'না।' টাকা-পয়সার কথা উঠলেই আজকাল ওর খুব অস্বস্তি হয়।

সরিৎশেখর বললেন, 'ঠিক আছে, আমি জেনে নেব। তোমাকে ফার্স্ট ডিভিসন পেতেই হবে অনিমেষ। তোমার মাকে আমি কথা দিয়েছিলাম।'

কথাটা শুনে দাদুর দিকে তাকাল অনিমেষ। সরিৎশেখর এখন অলস পায়ে ভেতরে চলে যাচ্ছেন। মাকে দাদু কবে কথা দিয়েছিলেন? এতদিন শোনেনি তো সে। স্বর্গছেঁড়া থেকে যখন এসেছিলেন, তখন তখনই কেউ দশ বছর বাদে কাউকে ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করানোর কথা দিতে পারে না। ওর মনে হল দাদু গুলিয়ে ফেলছেন। স্মৃতিতে কোন কিছু গোলমাল হয়ে গেলে মৃত ব্যক্তির নাম করে নিজের ইচ্ছেটা স্বচ্ছন্দে চালিয়ে দেওয়া যায়। ধরা পড়ার ভয় থাকে না এবং সেটা বেশ জোরদারও হয়। অনিমেষ হেসে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে জয়াদির গলা পেল ও, 'এ মা, একা একা দাঁড়িয়ে হাসছ যে, পাগল হয়ে গেলে নাকি!'

অনিমেষ ঘাড় ফিরিয়ে দেখল জয়াদি একটা প্যাকেট নিয়ে ফিরে এসেছেন, 'কি ওটা?'

ফস করে নীল-সাদা-হলুদ মেশানো সোয়েটারটা বের করে ওর সামনে

ধরল, 'পরে ফেল।'

জয়াদি ওর জন্য সোয়েটার বানাচ্ছেন, মাঝে মাঝে বুক-পিঠের মাপ নিয়ে যান, এ কথা সবাই জানে। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে অনিমেষের ভীষণ আনন্দ হচ্ছিল। সে চিৎকার করে পিসীমাকে ডাকল, 'পিসীমা—তাড়াতাড়ি!'

সরিৎশেখর যখন কথা বলছিলেন তখন হেমলতা রান্নাঘরে ফিরে গিয়েছিলেন। চিৎকার শুনে ছুটে এলেন, 'ও মা, হয়ে গেছে! বলিসনি তো! কি সুন্দর! আর-জন্মে জয়া তোর কেউ ছিল অনি।'

জয়াদি হেসে বললেন, 'ও মা, এ-জন্মে আমি বুঝি কেউ নই?'

অনিমেষ হাত বাড়িয়ে সোয়েটারটা নিল। কি নরম উল! পিসীমা আর জয়াদিতে মিলে ওকে সোয়েটারটা পরালেন। পিসীমা সমানে জয়াদির হাতের প্রশংসা করে যাচ্ছেন আর জয়াদি ওর চারপাশে ঘুরে ঘুরে সোয়েটারটা ঠিক করে দিচ্ছেন—অনিমেষের খুব লজ্জা করছিল। সুন্দর ফিট করেছে সোয়েটারটা, পিসীমা বললেন, 'তুই পাস করে কলকাতায় গিয়েও এই সোয়েটারটা পরতে পারবি তিন-চার বছর।'

জয়াদি বললেন, 'তখন দেখবেন এটা পছন্দই হবে না।'

পিসীমা বললেন, 'আমি তো বাবা এত ভাল সোয়েটার কাউকে পরতে দেখিনি?'

কলকাতায় পড়তে যাচ্ছে। কথাটা ইদানীং এ বাড়িতে মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। মহীতোষ নাকি সরিৎশেখরকে বলেছেন সেকথা। অনি যদি ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করে তাহলে কলকাতায় পাঠাবেন। এখানকার এ সি কলেজে পড়াশুনা খুব একটা সুবিধের হবে না। কলকাতায় যাবার কথা শুনলেই দমবন্ধ হয়ে আসে আনন্দে। কলকাতা বাংলাদেশের প্রাণ—। বেশী ভাবতে গেলেই অনেক রকম চিন্তা মাথায় আসে। কলকাতার রাস্তায় সিনেমা-স্টাররা ঘুরে বেড়ায়, কবি লেখকরা সেখানে আড্ডা দেন। মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর কলকাতার রাস্তায় হেঁটেছেন। অদ্ভুত একটা রোমাণ্টিক জগৎ তৈরী হয়ে যায় মনে মনে। ফার্স্ট ডিভিসন পেতেই হবে—যেমন করেই হোক। হাতের শিশি আর বুকের সোয়েটারটার দিকে তাকাল সে। সামান্য টেস্টে অ্যালাউড হয়ে যদি এতগুলো মানুষের ভালবাসা পাওয়া যায়, তাহলে ফাইন্যাল পরীক্ষায় সে কেন ডিভিসন পাবে

না? সোয়েটারের নরম ওমটা শরীরে জড়িয়ে অনিমেষ পিসীমা আর জয়াদির দিকে তাকিয়ে এই প্রথমবার আবিষ্কার করল, যারা খুব অল্পেই খুশী হয় তাদের জন্য সব কিছু করা যায়।

টাকা-পয়সা হাতে এলে সরিৎশেখর আবার আগের মত হয়ে যান। বাড়ি ভাড়া নিয়ে যে গোলমাল হয়েছিল সেটা এখন আর নেই, নিয়মিত টাকা পাচ্ছেন। কিন্তু বাজার দর যে রকম বাড়ছে, তাতে পাল্লা দেওয়া মুশকিল। চালের দাম হু-হু করে বেড়ে যাচ্ছে। মহীতোষ আসেন মাঝে মাঝে—নিয়মিত ছেলের নাম করে টাকা পাঠান। মহীতোষের একটা অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে গেছে এর মধ্যে। ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেছেন আর চেহারাটা হয়ে গিয়েছে বুড়োটে-বুড়োটে। এ পক্ষে সন্তানাদি হল না তাঁর। মহীতোষের স্ত্রী স্বর্গছেঁড়া থেকে একদম নড়তে চায় না। তাকে অনেকদিন দেখেননি তিনি। হেমলতা বলতে মহীতোষ বলেছিলেন, 'সে ও-বাড়ি ছেড়ে নড়বে না।'

বয়স তাঁকেও কব্জা করেছে। শরীরের চামড়া ঝুলে পড়েছে। কিন্তু বড়সড় কোন অসুখ তাঁর হয়নি, সেই রিকশার ধাক্কায় পড়ে গিয়ে পা ভাঙা ছাড়া। শীত সহ্য করতে আজকাল একটু কষ্ট হয়। লালইমলির সেই পুরোনো গেঞ্জি, পাঞ্জাবি, মোটা কাপড়ের কোট আর তুষের চাদরে লড়ে যান প্রাণপণে। বাঁচতে খুব ইচ্ছে হয় তাঁর। কত কি জিনিস হচ্ছে পৃথিবীতে, অন্যান্য মানুষের মত চট করে মরে যাবার কোন বাসনা হয় না। কিন্তু মুশকিল হল, শীত পড়েছিল শানিয়ে— তা এক রকম ছিল, সঙ্গে যে আজ রাত থেকে অসময়ের বৃষ্টি নামল। একদম শ্রাবণ মাসের বৃষ্টি।

শীতকালে জলপাইগুড়িতে হঠাৎ হঠাৎ বৃষ্টি আসে। এসে ঠাণ্ডাটা বাড়িয়ে দিয়ে যায়। যে সমস্ত মানুষ জরায় থিতোচ্ছিল তারা টুপটাপ চলে যায় এ সময়। তিস্তায় তখন টানের সময়। শীতের দাপটে ক্রমশ কুঁকড়ে যাচ্ছে নদীটা। তবু জল এখনও টলটলে। স্রোতের ধার নেই, যৌবন ফুরিয়ে যাওয়া বৃদ্ধের মত শুধু জাবর কেটে যাওয়া। বাঁধ প্রায় সম্পূর্ণ। ওপাশে সেনপাড়া ছাড়িয়ে তিস্তার বুকের ওপর পুল বানাবার কথাবার্তা চলছে। কলকাতা থেকে সরাসরি ট্রেনে বাসে আসাম যাওয়া যাবে। পক্ষিরাজ ট্যাকসিগুলো গা-গতর ঝেড়ে মুছে এই কটা বছর কিছু কামিয়ে নেবার জন্য

কিং সাহেবের ঘাটের দিকে আসব আসব করছে। এই সময় সন্ধ্যে থেকেই আকাশ কাঁপিয়ে বৃষ্টি নামল।

ভোর হল, ঘড়ি দেখলে বোঝা যায়—আকাশ তেমনি গোমড়ামুখো। জল ধরবার চিহ্ন নেই। যেন বর্ষা চলে যাওয়ার সময় এই মেঘগুলোকে হিমালয়ের ভাঁজে ভাঁজে ফেলে রেখে গিয়েছিল, নাহলে এই সময়ে এত বৃষ্টি পড়ে কখনো! তিস্তার জল বাড়ছে। এরকমটা কখনো হয় না। লক্ষ্মীপূজোর পর এত জল তিস্তায় বয় না! কিন্তু শহরের মানুষ এবার নিশ্চিন্ত। সেই প্রলয়ঙ্কর বন্যাটাকে রুখে দেবে নতুন তৈরী বাঁধ। তিস্তা সরাসরি শহরটাকে গ্রাস করতে পারল না এবার। কিন্তু করলার জল ছিটকে উঠে এল কিছু কিছু নিচু জায়গায়। হাসপাতাল পাড়াটা এই ঠাণ্ডায় তিনদিক জলের তলায় ডুবে রইল। আহ্লাদী মেয়ের মত করলা যেন গিয়ে মুখ ঘষছে কিং সাহেবের ঘাটের পাশে জননী তিস্তার বুকে।

ঠিক তিন দিন তিন রাতের শেষে বৃষ্টি থেমে রোদ উঠল। হেমলতার অবস্থা খুব কাহিল। গরম বস্ত্র তাঁর বেশী নেই। যতক্ষণ পেরেছেন উনুনের পাশে বসে থেকেছেন। চিরকাল এই কাঠ-কয়লার আগুনগুলো তাঁকে শীত থেকে বাঁচিয়ে রাখে। আপাদমস্তক মোড়া সরিৎশেখর রোদ উঠলে উঠোনে এসে বসলেন। দুজনে গল্প করছিলেন, আজ সন্ধ্যে থেকে শীত ডবল হয়ে পড়বে। রোদ উঠলেই শীত বাড়ে। অনিমেষ বাজারে গিয়েছিল। শুধু আলু, ঢেঁকিশাক আর ট্যাড়শ নিয়ে ফিরে এসে বলল, 'শিকারপুর ফরেস্টের দিকে প্রচণ্ড বন্যা হয়েছে, ভোটপাটি ভেসে গেছে।'

হেমলতা বাজার দেখে বললেন, 'ইস, তুই এতক্ষণ ধরে এই বাজার আনলি?'

অনিমেষ বলল, 'কিছু থাকলে তো আনব। সবাই মারামারি করে নিয়ে নিচ্ছে যা পাচ্ছে।' অনেক দিন পরে বাজারে গিয়ে অনিমেষ অত্যন্ত বিরক্ত। ফেরত টাকাটা সে দাদুর দিকে বাড়িয়ে দিল।

সরিৎশেখর টাকাটা নিয়ে বললেন,'মাছ এনেছো?'

অনিমেষ ঘাড় নাড়লো, 'না'।

সরিৎশেখর রাগ করলেন, 'কি আশ্চর্য! তোমাকে আমি যা বলি শোন না কেন? এখন এই তিন মাস মাছ না খেলে তোমার শরীরে বল হবে কি করে? বেশী পড়াশুনা করতে গেলে শরীরে জোর দরকার হয়।'

অনিমেষ হাসল, 'ত্রিশ টাকা সের কাটাপোনা খাওয়ার ইচ্ছে আমার নেই। অত দামের মাছ তাই সবাই কিনছে না। মাছ না খেলেও আমার চলবে।'

এতদিন ধরে জেলা স্কুলে চেনা গণ্ডীতে পরীক্ষা দিয়েছে অনিমেষ। সেখানকার পরিবেশ এক রকম আর এবার ফাইন্যাল দিতে গিয়ে ও ভীষণ রকম অবাক হয়ে গেল। চার-পাঁচটা স্কুলের ছেলেরা পাশাপাশি পরীক্ষা দিচ্ছে। প্রথম দিন থেকেই প্রশ্নপত্র হাতে নিয়ে অনিমেষের পাশের ছেলেটি সমানে খুঁচিয়ে যাচ্ছে তাকে খাতা দেখাবার জন্য। ছেলেটির গালভর্তি দাড়ি, বয়স হয়েছে। অনিমেষ বিরক্তি প্রকাশ করতে সে বলল, 'আট বছর হল ভাই, এবার পাশ করতে হবেই।' বলে কোমর থেকে বই বের করে ওর দিকে বাড়িয়ে দিল, 'উত্তরগুলো দাগিয়ে দাও।'

'আপনি নকল করবেন?' কোন রকমে কথাটা জিজ্ঞাসা করল সে। জেলা স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে নকল করার রেওয়াজ নেই। বড়জোর কেউ কেউ হাতের চেটোয় কিছু কিছু পয়েন্ট লিখে আনত। একবার একটি ছেলে মুদির দোকানের স্লিপের মত কাগজে খুদি খুদি করে উত্তর লিখে এনেছিল, সুশীলবাবু তাকে ধরতে পেরে ক্লাস থেকে বের করে দিয়েছিলেন। ছেলেটিকে ট্রান্সফার নিতে হয়েছিল। ওই ধরনের কাগজকে বলা হয় চোথা, মন্টুর কাছ থেকে জেনেছিল অনিমেষ। অত খুদি খুদি করে লিখতে যে পরিশ্রম এবং সময় দবকার হয়, সে-সময় উত্তরটা সহজেই মুখস্থ হয়ে যাবার কথা। কিন্তু ফাইন্যাল পরীক্ষা দেবার সময় এই ছেলেটির দুঃসাহস দেখে তাজ্জব হয়ে গেল।

ছেলেটি মুখ খিঁচিয়ে বলল, 'কোত্থেকে এলে চাঁদ? পেছনে চেয়ে দ্যাখ না, টুকলির বাজার বসে গেছে।' মাথা ঘুরিয়ে অনিমেষ দেখল কথাটা এক বর্ণ মিথ্যে নয়। ফস ফস করে বই-এর পাতা ছেঁড়ার শব্দ; খাতাব তলায় কাগজ ঢুকিয়ে ঝুঁকে পড়ে যারা লিখছে তাদের কাছে, যাদের কাছে উত্তর নেই তারা ক্রমাগত অনুরোধ জানিয়ে যাচ্ছে শেষ হয়ে গেলে দেবার জন্য। জেলা স্কুলের আরো কয়েকটি ছেলে ছিল ঘরটাতে, অনিমেষ দেখল তারা

যেন কিছুই ঘটছে না এ রকম ভঙ্গীতে উত্তর লিখে যাচ্ছে। যে ভদ্রলোক গার্ড দিচ্ছিলেন তিনি এখন চেয়ারে বসে মোহন সিরিজের একটা বই পড়ছেন তন্ময় হয়ে।

সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল অনিমেষের। সবাই যদি বই দেখে নকল করে লেখে তাহলে কেউ ফেল করবে না। এইসব মুখগুলো কলেজ, কলেজ থেকে য়ুনিভার্সিটি—ডাক্তার ইঞ্জিনিয়র—সব জায়গায় নকল করে পাস করা যায়? যদি যায় তাহলে ওরা তো কিছুই না জেনে যে যার মত বড় হয়ে যাবে। এক মুহূর্তের জন্য অনিমেষের মনে হল ওর মাথায় কিছু নেই—ও একটাও উত্তর লিখতে পারবে না। চোখ বন্ধ করে চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকল সে। পাশের ছেলেটি বোধ হয় ভাবগতিক দেখে সুবিধে হবে না বুঝতে পেরেছিল

অনিমেষ শুনল সে উঠে দাঁড়িয়ে বলছে, 'স্যার বাথরুম যাব।'

গার্ড ভদ্রলোক বই থেকে মুখ না তুলে বললেন, 'এক ঘণ্টা হয়নি এখনও।'

ছেলেটি বলল, 'এক ঘণ্টা অবধি চেক করতে পারব না।'

'যাও।'

শোনা মাত্রই ছেলেটা বেরিয়ে গেল। অনিমেষ দেখল যাবার সময় সে উত্তরপত্রটা জামার ভেতর ঢুকিয়ে নিল। দ্বিতীয় ঘণ্টার শেষে বাথরুমে গিয়েছিল সে। বাথরুমটা যেন পড়ার ঘর হয়ে গিয়েছে। যারা আসছে তারা কেউ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিচ্ছে না। বিভিন্ন আকারের কাগজের টুকরো থেকে বই-এর পাতার স্তূপ হয়ে গেছে সেখানে। সেই ছেলেটিকে এখানে দেখতে পেল না সে। কিছুই বলার নেই, অনিমেষের লজ্জা করছিল সেখানে জলবিয়োগ করতে। কোন গার্ড বা কর্তৃপক্ষের কেউ একবারও তদারকিতে আসছেন না এদিকে। অনিমেষ ফিরে আসছে, মন্টুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। এক রুমে সিট পড়েনি ওদের, মন্টু ওকে জিজ্ঞাসা করল, 'কটা বাকী আছে তোর?'

অনিমেষ বলল, 'তিনটে।'

খুব সিরিয়স মুখ-চোখ করে মন্টু বলল, 'তাড়াতাড়ি কর, সময় নেই বেশী।'

অনিমেষ মাথা নেড়ে বলল, 'কি অবস্থা দ্যাখ, এরকম টুকলিফাই চলে,

না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।'

মন্টু গম্ভীর মুখে বলল, 'যারা করছে করুক, তোর কি?'

অনিমেষ ফিরে এসে সিটে বসতেই একটা অভিনব কাণ্ড হয়ে গেল। ও দেখল ওর খাতাটা ডেস্কে নেই। ভ্যাবাচাকা খেয়ে এপাশ-ওপাশ দেখতে ও প্রথমে ঠাওর করতে পারল না খাতাটা কোথায়! এমন সময় পেছনের ছেলেটি চাপা গলায় ওকে বলল, 'লাস্ট বেঞ্চিতে নিয়ে গেছে।' অনিমেষ দেখল দুটি ছেলে পাশাপাশি শেষ বেঞ্চিতে বসে একটা খাতা থেকে খুব দ্রুত টুকে যাচ্ছে। ও মোহন সিরিজের দিকে তাকাল, ভদ্রলোক টান-টান হয়ে বসে আছেন। ভীষণ রাগ হয়ে গেল অনিমেষের, দ্রুত শেষ বেঞ্চিতে গিয়ে চট করে খাতাটা কেড়ে নিল। আচমকা খাতাটা উঠে যাওয়াতে ছেলে দুটি হকচকিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার মধ্যে একজন দ্রুত নিজেকে সামলে বলল, 'শেষ লাইনটা বলে দাও গুরু।' কথাটা বলার মধ্যে এমন একটা রোয়াবি ছিল অনিমেষ থ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

এমন সময় পেছন থেকে একটা চিৎকার কানে এল, 'অ্যাই, হোয়াট আর ইউ ডুয়িং দেয়ার? কি নাম তোমার, নম্বর কত?' মোহন সিরিজ বইটাকে এক আঙুলে চিহ্নিত করে দ্রুত ছুটে এসে অনিমেষের সামনে দাঁড়ালেন, 'অ্যাই, তোমার সিট কোথায়?'

ভীষণ নার্ভাস হয়ে অনিমেষ বলল, 'সামনের দিকে।'

'তা এখানে কি করছ? নকলবাজি? আমার ক্লাসে সেসব একদম চলবে না। কোন স্কুল তোমার, নম্বর কত বল?' তর্জনী তুলে গর্জন করলেন ভদ্রলোক।

'আমার খাতা এরা নিয়ে এসেছিল—আমি কিছু জানি না।' অনিমেষ কোনরকমে বলল। একটা ভয় আচমকা ওকে ঘিরে ধরল এইবার। এই ভদ্রলোক যদি রেগেমেগে ওকে ক্লাস থেকে বের করে দেন, অথবা ওর নামে নালিশ করেন তাহলে চিরকালের জন্য ও ব্ল্যাকলিস্টেড হয়ে গেল। নির্ঘাত ফেল করিয়ে দেবে ওকে।

'খাতা নিয়ে এসেছিল আর আমি দেখলাম না, ইয়ার্কি! কে এনেছিল?' ভদ্রলোক ফুঁসে উঠলেন।

এই সময় সেই ছেলেটি উঠে দাঁড়াল, 'আমি স্যার, এই টেবিলের পাশে খাতাটাকে উড়ে আসতে দেখে তুলে রাখলাম। যা বাতাস চারধারে!'

'বাতাস? বাতাস কোথায়? ফ্যান তো বন্ধ। আর উড়ে এল যখন তখন আমায় বললে না কেন? আর উড়ল কেন? তুমি কোথায় ছিলে?'

ভদ্রলোক কি করবেন ঠিক করতে পারছিলেন না। অনিমেষ ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিল ছেলেটার কথা শুনে। কি চমৎকার মিথ্যে কথা বলে ব্যাপারটা ঘুরিয়ে দিচ্ছে। ওর মনে হল এই মুহূর্তে ছেলেটার কথায় সায় না দিলে বাঁচবার উপায় নেই। ও বলল, 'বাথরুমে গিয়েছিলাম আমি। সে সময়—।'

'কি খাও যে এত ঘন ঘন বাথরুম পায়? কিন্তু আমাকে বলোনি কেন?'

যেমন এসেছিলেন তেমনি দ্রুত ফিরে গেলেন ভদ্রলোক। অনিমেষ নিজের সিটে যাবার জন্য পা বাড়াল। যেন একটা পাহাড় চট করে মাথা থেকে নেমে গেল এমন হালকা লাগছে তখন। এমন সময় ছেলেটি আবার ডাকল, 'কই, লাস্ট লাইনটা হোক, আফটার অল আমরা এক পার্টির লোক!'

অগত্যা অনিমেষকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের খাতা থেকে এক নম্বর প্রশ্নটার শেষ লাইনটা ফিসফিস করে পড়ে যেতে হল।

সকাল থেকে টিপটিপ করে বৃষ্টি ঝরছিল। এটা ঠিক সেই উত্তরবঙ্গীয় বৃষ্টি যা কিনা এঁটুলির মত দিনরাতের গায়ে সেঁটে বসে থাকে। রাত্তিরবেলায় ঝমঝমিয়ে আকাশ ভেঙে পড়ে আবার সকালবেলায় ছিচকাঁদুনে মেয়ের মত সুঁচ বেঁধায়। জেলা স্কুলের লম্বা ঢাকা বারান্দায় অনিমেষরা সেই সকাল থেকে গুলতানি মারছিল। খবর আছে আজ রেজাল্ট বের হবে।

অবশ্য এরকম গত কয়েক দিন ধরে রোজই আসছে। হঠাৎ কেউ বলল, রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে—ছোট ছোট স্কুলে—কোথায় কি! গতকাল রেডিওতে নাকি বলেছে এ বছর পার্সেন্টেজ খারাপ নয়। আবার আজ সকালে হেডমাস্টার মশায় এসে বললেন, দারুণ খবর আছে তাঁর কাছে, মার্কশীট না এলে তিনি কিছু বলবেন না।

কদিন থেকে উত্তেজনাটা বুকের মধ্যে দলা পাকাচ্ছিল—যদি খারাপ হয় তাহলে কি হবে?

সরিৎশেখর গতকাল রেডিওতে কলকাতায় ফল বেরিয়ে গেছে শুনে আর ঘুমুতে পারেননি। সারারাত ছটফট করেছেন। ভোরবেলায় উঠেই অনিমেষকে বলেছেন, রেজাল্ট বের হলে অবশ্যই যেন সে বাড়িতে চলে আসে। আজকে তাঁর বেড়াতে যাওয়া হল না। হেমলতা ভোরবেলায় বাবার হাঁকডাকে উঠে পড়ে একশ আটবার জয়গুরু নাম লিখে একমনে জয়গুরু বলে যাচ্ছেন। অনিমেষ যখন বেরুচ্ছে তখন একটা কাগজ ভাঁজ করে তার বুকপকেটে ঢুকিয়ে দিলেন। অনিমেষ গেট খুলে বাড়ি থেকে বের হতে গিয়ে একবার পেছন ফিরে দেখল দাদু আর পিসীমা বাইরের বারান্দায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন এক দৃষ্টিতে। দাদুর দুই হাত জোড় করে বুকের ওপর রাখা, পিসীমার ঠোঁট দুটো নড়ছে।

হাত-পা কেমন ঠাণ্ডা হয়ে যেতে লাগল ওর। চুপচাপ একা একা বাঁধের ওপর দিয়ে জেলা স্কুলের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ওর মনে সেই ভয়টা চট করে ফিরে এল। যদি সেই গার্ড ভদ্রলোক মুখে কিছু না বলে চুপিচুপি ওর নামে রিপোর্ট করে দেন তাহলে কি হবে। আর-এ হয়ে গেলে সে এই বাড়িতে ফিরে আসবে কি করে? অনিমেষ মনে মনে ঠিক করল, যদি সেই রকম হয় তাহলে সে ওই ভদ্রলোককে ছেড়ে দেবে না, তার জন্য যদি তাকে জেলে যেতে হয় তো তাই হোক। জেলে যাবার কথাটা মনে হতেই শনিবাবার ভবিষ্যৎবাণী মনে পড়ে গেল ওর। যাঃ, আঠারো বছর হতে ওর তো এখনও দুই বছর বাকী আছে। কিন্তু ভয়টা কিছুতেই ওকে ছেড়ে যাচ্ছিল না, অস্বস্তিটা থেকেই গেল।

মুখ চোখ সবারই শুকনো। ফিনফিনে বৃষ্টির জলে সবারই জামাকাপড় স্যাঁতসেঁতে। বেরুবার আগে পিসীমা ছাতির কথা বলেছিলেন, ছাতি নিয়ে বের হলে বন্ধুরা খ্যাপায়—এ কথাটা পিসীমাকে বলে বলে বোঝাতে পারে না সে। সকাল ন'টা বেজে গেল, এখনও মার্কশীট এল না। তপন বলল, 'আচ্ছা খেলাচ্ছে, ভাল্লাগেনা। যা করবি করে ফ্যাল।'

শেষ পর্যন্ত ওদের চোখের সামনে দিয়ে একজন স্যার রেজাল্টের কাগজপত্র নিয়ে হেডমাস্টার মশাই-এর ঘরে ঢুকে গেলেন। দমবন্ধ উত্তেজনায় সবাই ছট্‌ফট করছে। স্কুলের মোটকা দারোয়ান অফিসের গেটে দাঁড়িয়ে, সে কাউকে ভেতরে যেতে দেবে না। ওদের পুরো ব্যাচটা হেডমাস্টার মশায়ের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে, অথচ কেউ কোন কথা বলতে

পারছে না। এই সময় অনিমেষ লক্ষ্য করল, ওর হাতের তেলোয় চটচটে ঘাম জমেছে—অদ্ভুত দুর্বল লাগছে শরীরটা। এর মধ্যে একজন স্যার এসে বলে গেলেন ওদের রেজাল্ট নাকি ভাল হয়েছে, মার্কশীট দেখে প্রত্যেকের ফলাফল নামের পাশে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে—সেটাই একটু বাদে নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে দেওয়া হবে। মন্টু অনিমেষ এবং তপন পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল। মন্টু বলল, 'লাস্ট ডে ইন স্কুল।'

তপন ঘাড় নাড়ল, 'যদি গাড্ডা মারি—অহঙ্কার করলে উল্টোটা হয়।' আর এই সময় বৃষ্টিটা নামল আর একটু জোরে। ছাট আসছিল বারান্দায়—ওরা সরে সরে নিজেদের বাঁচাচ্ছিল। তপন আবার কথা জুড়ল, 'আমাদের কার দুঃখে আকাশ কাঁদছে কে জানে। শুনেছি অমঙ্গল কিছু এলে প্রকৃতি জানিয়ে দেয়।'

তারপর দরজা খুলে গেল হেডমাস্টার মশাই-এর ঘরের। তিনি বাইরে এলেন। এখন বর্ষাকাল, তবু তিনি গলাবন্ধ সাদা লং কোট পরেছেন। ওঁর পেছনে ভূগোল স্যার। তাঁর হাতে একটা বিরাট কাগজ ভাঁজ করা। নোটিশ বোর্ডের দিকে ওঁদের এগিয়ে যেতে সবাই নীরবে পথ করে দিল। সেখানে হেডমাস্টার মশাই ঘুরে দাঁড়ালেন। সামনে দাঁড়ানো উদ্‌গ্রীব মুখগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে তিনি যেন সামান্য কাঁপতে লাগলেন, ' এইমাত্র তোমাদের ফলাফল এসেছে—এ খবর তোমরা নিশ্চয়ই পেয়েছ। আজ আমার, আমাদের স্কুলের সব চেয়ে আনন্দের দিন। তোমরা জানো, এ বছর আমি রিটায়ার করব—যাবার আগে আমি যে গৌরবের মুকুট তোমাদের কাছ থেকে পেলাম তা চিরকাল মনে থাকবে। আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি',—এই সময় তাঁর কণ্ঠস্বর চড়ায় উঠে কাঁপতে লাগল, ' আমার স্কুলের কেউ অকৃতকার্য হয়নি। তোমরা আমার মুখ উজ্জ্বল করেছ।' সঙ্গে সঙ্গে যেন পাথরচাপা একরাশ নিঃশ্বাস আনন্দের অভিব্যক্তি হয়ে প্রচণ্ড আওয়াজে ছড়িয়ে পড়ল। হেডমাস্টার মশাই দু'হাত তুলে সবাইকে চুপ করতে বললেন। শব্দ একটু থিতিয়ে এলে তিনি বাঁ হাতে গলার বোতামটা ঠিক করতে করতে বললেন, 'এছাড়া আর একটি খবর আছে। আমাদের স্কুল থেকে একজন এই বছর স্কুল ফাইন্যালে দ্বিতীয় হয়েছে—এই জেলা থেকে আজ অবধি কেউ সে সম্মান পায়নি।'

খবরটা সবাই শুনে থ হয়ে গেল। স্কুল ফাইন্যালে স্ট্যান্ড করা রীতিমত

চাঞ্চল্যকর ব্যাপার। এর আগে এফ ডি আই থেকে একজন নিচের দিকে স্ট্যাণ্ড করতেই শহরে হইচই পড়ে গিয়েছিল। কে সেই ছেলে? অরূপ? টেস্টে ওর রেজাল্ট সব চেয়ে ভাল ছিল। এই সময় হেডমাস্টার মশাই গলা তুলে ডাকলেন, 'অর্ক—অর্ক আছ্ এখানে?'

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা পেছনে দাঁড়ানো অর্ককে জড়িয়ে ধরল হইচই করে। হেডমাস্টার মশাই দেখলেন এই মুহূর্তে ওকে আলাদা করা অসম্ভব। তিনি একজনকে বলে গেলেন, অর্ক যেন যাবার সময় দেখা করে যায়।

ভূগোল স্যার ততক্ষণে নোটিশ বোর্ডে কাগজটা টাঙিয়ে দিয়েছেন। সবাই সেটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে একমাত্র অর্ক ছাড়া। সবাই একসঙ্গে নিজের রেজাল্ট দেখতে চায়। অনিমেষ কিছুতেই ভিড় ঠেলে এগোতে পারছিল না। ও দেখল অর্ক দূরে দঁড়িয়ে মেজাজে নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে ওদের দিকে তাকিয়ে হাসছে। তাজ্জব হয়ে গেল অনিমেষ, এই মুহূর্তে কেইবা সিগারেট খেতে পারে! ভিড়টার দিকে তাকাল সে—যদি থার্ড ডিভিসন হয়ে যায়—'আর-এ' হয়নি বোঝা যাচ্ছে, হলে হেডমাস্টার মশাই নিশ্চয় বলতেন। আর পারল না অনিমেষ অপেক্ষা করতে, ভিড়ের একটা দিক সামান্য ফাঁক হতেই সে ঢুকে পড়ল সেইখান দিয়ে। তারপর ঠেলেঠুলে একেবারে নোটিস বোর্ডের ছয় ইঞ্চির মধ্যে ওর চোখ চলে এল। প্রথমে সার দেওয়া পিপড়ের মত নামগুলো চোখে ভাসল। সহ্য হয়ে এলে ও প্রথম থেকে নামগুলো পড়তে লাগল। অরূপ ফার্স্ট ডিভিসন—একটা দাঁড়ি, অর্ক একটা দাঁড়ি, তারপর দুটো দাঁড়ি—দুটো—দুটো—একটা—দুটো—নিজের নাম চোখে আসতেই দৃষ্টিটা পিছনে ডান দিকে সরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কে যেন পেছন থেকে কোমর জড়িয়ে ধরে ওকে ওপরে তুলে ধরে চিৎকার করে উঠল। নোটিস বোর্ডের ওপরে মাথা উঠে যাওয়ায় নিজের নামের পাশে এক দাঁড়িকে বিরাট লম্বা দেখল সে।

সমস্ত শরীরে লক্ষ কদম ফুলের আনন্দ—তপনের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সময় নিল অনিমেষ। তপন সেকেন্ড ডিভিসন পেয়েছে এবং মন্টু ফার্স্ট ডিভিসন। বারোজন ফার্স্ট ডিভিসন, আঠারোজন সেকেন্ড, বাকীরা থার্ড ডিভিসন। মন্টু এগিয়ে এসে সাহেবী কায়দায় গম্ভীর মুখে ওর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল। তপনের কোন আপসোস নেই—ও

জানতো দ্বিতীয় ডিভিসনই ওর বরাদ্দ। ওরা বেশ দৃঢ় পায়ে বাইরে হেঁটে এসে অর্ককে খুঁজল—না, অর্ক কোথাও নেই। হেডমাস্টার মশাই-এর ঘরেও যায়নি।

তপন বলল, 'আমরা এখন কলেজ স্টুডেন্ট—আঃ, ফাইন!'

মন্টু বলল, 'সত্যি, শেষ পর্যন্ত বড় হয়ে গেলাম। ভাবাই যায় না।'

বাইরে সমানে বৃষ্টি হচ্ছে। একটুও তোয়াক্কা না করে ওরা রাস্তায় নেমে পড়ল।

এখন এই বৃষ্টিতে হাঁটতে অনিমেষের ভীষণ ভাল লাগছিল। ও একবার ভাবল, দাদুকে একছুটে বলে আসে খবরটা কিন্তু বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে ইচ্ছেটা চেপে গেল। আজ বাংলাদেশে ও একাই শুধু স্কুল ফাইন্যাল পাস করেনি। বৃষ্টিতে হাঁটতে হাঁটতে ওরা শহরটাকে ভিজতে দেখল। শহরের লোকেরাও বিভিন্ন ছাউনির তলায় দাঁড়িয়ে তিনটি কাকভিজে তরুণের ব্যাপার দেখে অবাক হল। গার্লস স্কুলের দিকে যেতে যেতে তপন হঠাৎ গান ধরল, 'এখন আর দেরি নয়. ধর্ গো তোরা হাতে হাতে ধর্ গো। আজ আপন পথে ফিরতে হবে সামনে মিলন-স্বর্গ।'

ও এক লাইন গাইছে, অনিমেষ আর মন্টু পরের লাইনটা আবৃত্তি করছে। এই বৃষ্টির জল গায়ে মুখে মেখে গান গাইতে গাইতে ওরা ঝোলনাপুলের ওপর এসে দাঁড়াল। অনিমেষদের সুরের ঠিক নেই কিন্তু একটা খুশির জোয়ার সুরকে ছাপিয়ে যাচ্ছিল। এক ভদ্রলোক ছাতি মাথায় আসছিলেন, মন্টুর চেনা—হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি, রেজাল্ট বেরিয়েছে? পাস করেছ, মনে হচ্ছে?' গাইতে গাইতে ঘাড় নাড়ল মন্টু, মুখে জবাব দিল না।

গার্লস স্কুলের কাছে এসে গানটা থেমে গেল। আর তখনই ওরা একটা মেয়েকে দেখতে পেল। বৃষ্টির মধ্যে একা একা হেঁটে যাচ্ছে। ওরা দেখল মেয়েটার মুখ কান্নায় মুচড়ে গেছে। সামলাতে পারছে না বেচারা। ওদের তিনজনেরই মন খারাপ হয়ে গেল আচমকা। চুপচাপ দাঁড়িয়ে মেয়েটার চলে যাওয়া দেখতে দেখতে মন্টু বলল, 'চল বাড়ি যাই।' যেন এই কথাটার জন্যই ওরা এতক্ষণ অপেক্ষা করে ছিল। তিনজনেই তিন দিকে কোন কথা না বলে দৌড়তে লাগল।

বাড়ির গেটে হাত দিতেই অনিমেষ দেখল পিসীমা ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন

বারান্দায়। যেন সে চলে যাওয়ার পর থেকে একচুলও নড়েননি। দাদুকে দেখতে পেল না সে। পিসীমা ওকে দেখেছেন, তাঁর চোখদুটো অনিমেষের মুখের ওপর। পায়ে পায়ে কাছে এগিয়ে গেল অনিমেষ। হেমলতা ভাইপোর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, কোন কথা বলতে পারছিলেন না। অনিমেষ ইচ্ছে করে চুপ করে ছিল। ওর বেশ মজা লাগছিল পিসীমার অবস্থা দেখে। কি বলবেন কি করবেন বুঝতে পারছেন না তিনি। শেষ পর্যন্ত অনিমেষ ঝুঁকে পড়ে হেমলতাকে প্রণাম করল, ' আমি পাস করেছি, ফার্স্ট ডিভিসন হয়েছে।'

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে জড়িয়ে ধরলেন হেমলতা। অনিকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন, আতিশয্যে চিৎকারটা কান্নায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। অনিমেষ দেখল পিসীমার মুখ ওর বুকের ওপর—ও অনেক লম্বা হয়ে গিয়েছে। কান্না মেশানো গলায় হেমলতা তখন বলছিলেন, 'অনিবাবা, তুই পাস করেছিস -ও মাধু দ্যাখ —তোর অনি ফার্স্ট ডিভিসন পেয়েছে—মাধু চোখভরে দ্যাখ।'

মায়ের নাম শুনে থর থর করে কাঁপতে লাগল অনিমেষ। এই সময় জুতোর শব্দ তুলে সরিৎশেখর দরজায় এসে দাঁড়ালেন। অনিমেষ তখনও হেমলতার দু'হাতের বাঁধনে আটক। সরিৎশেখর গম্ভীর মুখে নাতিকে দেখলেন, তারপর বললেন, 'আশা করি ফার্স্ট ডিভিসন হয়েছে?'

বাবার গলা শুনে হেমলতা অনিকে ছেড়ে দিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, ' হ্যাঁ হ্যাঁ—আপনার নাতি মুখ রেখেছে—আপনি মাধুকে কথা দিয়েছিলেন।'

নিজের শরীরটাকে যেন অনেক কষ্টে সামলে নিলেন সরিৎশেখর, 'কথা তো সবাই দিতে পারে, রাখে কয়জন। এই আনন্দের খবরের জন্য এতকাল বেঁচে আছি, হেম।'

অনিমেষ ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে দাদুকে প্রণাম করল। সরিৎশেখরের হাতটা ওর মাথার ওপর এলে অনিমেষ অনুভব করল দাদুর শরীর কাঁপছে। বিড়বিড় করে কিছু একটা বলছেন। অনিমেষ উঠে দাঁড়ালে সরিৎশেখর গম্ভীর গলায় বললেন, 'কিন্তু এতে আমি সন্তুষ্ট নই অনিমেষ, তোমাকে আরো বড় হতে হবে।

—আমি ততদিন বেঁচে থাকব।'

সরিৎশেখর দিন ঠিক করে রেখেছিলেন পঞ্জিকা দেখে। বিদেশযাত্রা এবং জ্ঞানার্জনের প্রশস্ত সময় আগামী মঙ্গলবার। নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস ছাড়ে রাত্রে, কিন্তু বিকেলবেলায় জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকেই যাত্রা শুরু করা যায়। এসব আগে-ভাগেই ছকে রেখেছিলেন তিনি। কিন্তু মুশকিল হল আজ কাগজে দেখলেন বুধবার কলকাতায় বামপন্থীরা হরতালের ডাক দিয়েছে। বাড়িতে কাগজ রাখা বন্ধ করেছিলেন তিনি, শুধু রবিবার দুটো কাগজ নেন। বাকি ছয় দিন কালীবাড়ির পাশে নিত্য কবিরাজের দোকানে বসে পড়ে আসেন। নাতির পাসের খবর সবাইকে দিয়ে সেদিনের কাগজটা হাতে তুলতেই সব গোলমাল হয়ে গেল। ব্যাটারা আর হরতাল ডাকার দিন পেল না! সরিৎশেখরের হঠাৎ মনে হল নাতিকে তিনি একটা অনিশ্চিত এবং অগ্নিগর্ভ হাঁ-মুখের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। কলকাতা শহরকে বিশ্বাস করতে পারা যায় না, অন্তত এই কাগজগুলো পড়ে মনে হয় কলকাতা থেকে যতদূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল! রাতদিন মারামারি, মিছিল, হরতাল, ছাত্র-আন্দোলন সেখানে লেগেই আছে। অনিমেষ সেখানে গিয়ে নিজেকে কতটা নিরাপদে রাখতে পারবে? একেই ছেলেটার মাথায় এই ধরনের একটা ভূত সেই পনেরই আগস্ট থেকে চেপে আছে—সেটা উস্কে উঠবে না তো? তেমন হলে তিনি নিজে কলকাতায় যাবেন। কিশোরী মিত্তিরের বাড়ি শোভাবাজারে। এককালে এই অঞ্চলে ছিলেন তিনি, সরিৎশেখরের ভারী অন্তরঙ্গ। অনিমেষের দেখাশোনার ভার তিনি নিয়েছেন চিঠির মাধ্যমে। অতএব তেমন কিছু হলেই খবর পাবেন সরিৎশেখর। কলকাতায় না গেলে অনিমেষের ভবিষ্যৎ এই শহরের চারপাশেই পাক খাবে। আনন্দচন্দ্র কলেজ থেকে আহা-মরি ফল করে পাস করার আশা পাগলও করবে না। অতএব প্রেসিডেন্সী অথবা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে অনিমেষকে ভর্তি করতে হবেই। তাঁর ইচ্ছা ও সেন্ট জেভিয়ার্সে ভর্তি হোক। মিশনারি কলেজ, ইংরেজীটা ভাল শিখবে, সহবত পাবে।

সরিৎশেখর এখনও বিশ্বাস করেন ইংরেজীতে উত্তম ব্যুৎপত্তি না থাকলে জীবনে বড় হওয়া যায় না।

আজ নাতিকে স্বর্গছেঁড়ায় পাঠালেন সরিৎশেখর। যাবার আগে বাপের সঙ্গে দেখা করে আসুক। মাতাপিতার আশীর্বাদ ছাড়া কোন সন্তান জীবনে উন্নতি করতে পারে না। অনিমেষকে তাই তিনি স্বর্গছেঁড়ায় পাঠালেন, দু'চার দিন থেকে আসুক। সাধারণত ছেলেটা সেখানে যেতে চায় না—এবার বলতেই রাজী হয়ে গেল।

কুচবিহার লেখা বাসে চেপেছিল অনিমেষ। ময়নাগুড়ি রোডে এলে টিকিট কাটার সময় জানতে পারল সেটা স্বর্গছেঁড়ায় যাবে না, ধূপগুড়ি থেকে ঘুরে অন্য পথ ধরবে। এখন নেমে পড়াও যা ধূপগুড়িতে নামাও তা। মিছিমিছি বেশী পয়সা খরচ হয়ে গেল। ধূপগুড়িতে নেমে ও স্বর্গছেঁড়ার দিকে একটা মিষ্টির দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। হাটবার হলে ঘন ঘন বাস পেত কিন্তু আজ বোধ হয় অপেক্ষা করতে হবে। বার্নিশ থেকে পরের বাসটা, অথবা মালবাজার মেটেলি থেকে বাস এলে সেটাতে উঠতে হবে। অথচ এখান থেকে স্বর্গছেঁড়া বেশী দূর নয়— মাইল আটেক। দৌড়েই চলে যাওয়া যায়।

অনেক দিন পরে স্বর্গছেঁড়ায় যাচ্ছে সে। অথচ সেই প্রথমবারের মত উত্তেজনা হচ্ছে না, এখন সমস্ত মন বসে আছে বুধবার সন্ধ্যেবেলার দিকে তাকিয়ে। মঙ্গলবার ঠিক ছিল, কিন্তু হরতালের জন্য দাদু দিনটা পিছিয়ে দিলেন। বৃহস্পতিবার কলকাতায় পৌঁছবে সে। ভাবতেই সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল ওর। এতদিন ধরে বিভিন্ন বই, খবরের কাগজ আর মানুষের মুখে মুখে শুনে মনের মধ্যে কলকাতা এক স্বপ্নের শহর হয়ে গেছে—সেখানে যেতে পাবার সুযোগ পেয়ে অনিমেষ আর কিছু ভাবতে পারছিল না।

বাস থেকে নামতেই বাড়ির বারান্দায় ছোটমাকে দেখতে পেল অনি। একা দাঁড়িয়ে আছে। দ্রুত কাছে গিয়ে প্রণাম করতেই ছোটমা হাত ধরল, 'কি হল?'

অনি লাজুক হাসি হাসল, 'ফার্স্ট ডিভিসন।'

ছোটমা চোখ বন্ধ করল। যেন আনন্দের একটা বড় ঢেউ সামলে নিয়ে বলল, 'এবার কলকাতায় যাবে তো? দিন ঠিক হয়েছে?' অনিমেষ ঘাড়

নাড়ল 'হুঁ, বুধবার।'

বারান্দায় উঠে ছোটমা ঘুরে দাঁড়াল। তারপর চট করে ডান হাতের মধ্যমা থেকে একটা আংটি খুলে অনিমেষের বাঁ হাতটাকে ধরে ফেলল। অনিমেষ কিছু বোঝার আগেই ছোটমা আংটিটা ওর বাঁ হাতের অনামিকায় পরিয়ে দিল, 'অনিমেষ, আমি তো হাজার হোক তোমার মা, তোমাকে কোনদিন কিছু দিতে পারিনি—এইটে কখনো হাত থেকে খুলবে না, কথা দাও।' হাতটা মুখের সামনে তুলে ধরতেই অনিমেষ দেখল চকচকে নতুন সোনার আংটির বুকে বাংলায় 'অ' অক্ষরটা লেখা রয়েছে। তার মানে ছোটমা তাকে দেবে বলেই আংটিটা করিয়ে রেখেছিল। অনিমেষের বুকটা ভার হয়ে গেল, কোনরকমে সে বলল, 'তুমি জানতে আমি ফার্স্ট ডিভিশন পাব?'

আস্তে আস্তে ছোটমা বলল, 'আমি রোজ ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতাম যে।'

ব্যাগটা মাটিতে রেখে অনিমেষ ছোটমাকে প্রণাম করল। খুব শান্ত হয়ে প্রণাম নিয়ে অনিমেষের নত মাথায় নিজের দুই হাত চেপে ধরল ছোটমা।

চাবি বের করে যখন অনিমেষকে দরজা খুলতে বলল ছোটমা, ঠিক তখন পেছনে সাইকেলের আওয়াজ হল। এতদিন কড়ায় তালা লাগানো হত, অনিমেষ গা-তালাটাকে আগে দ্যাখেনি। সাইকেলের শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, মহীতোষ নামছেন। চোখাচোখি হতেই মহীতোষ যেন কি করবেন বুঝতে পারছেন না। সাইকেলটাকে রেখে প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে কয়েক পা এগিয়ে এলেন কথা না বলে। অনিমেষ দেখল বাবার চেহারাটা কেমন বুড়ো-বুড়ো হয়ে গিয়েছে, একটু রোগা লাগছে। সিঁড়ির ধাপে পা দেবার আগেই অনিমেষ দ্রুত নেমে গিয়ে ওঁকে প্রণাম করল, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছি।' কথাটা শুনেই মহীতোষ দু'হাতে ছেলেকে জড়িয়ে ধরলেন। বাবার মাথা তার সমান, আলিঙ্গনে দাঁড়িয়ে থাকতে ওর অসুবিধে হচ্ছিল। মহীতোষ ওকে জড়িয়ে ধরে ওপরে উঠে এলেন, 'খোকাকে খেতে দাও।'

চটপট অনিমেষ বলল, 'আমি খেয়েছি।'

বিকেলে খবরের কাগজটা দিয়ে গেলে মহীতোষ সিগারেট ধরিয়ে বাইরের ঘরের সোফায় বসেছিলেন কাগজ হাতে। অনিমেষ বেরুতে যাচ্ছিল, তিনি ওকে ডাকলেন। কলকাতায় যাবার ব্যাপারে বাবার সঙ্গে এখন অবধি কোন কথাই হয়নি। মনের মধ্যে একটা ধুকপুকুনি আছে—কোথায় গিয়ে উঠবে, কিভাবে কলেজে গিয়ে ভর্তি হবে—কত টাকা লাগবে। নিজের থেকে মহীতোষের সঙ্গে আলোচনা করতে ওর সঙ্কোচ হচ্ছিল। এখন তিনি ডাকতেই ও ঘুরে দাঁড়াল। মহীতোষ সিগারেট ধরাতে ধরাতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কবে যাওয়া যেন ঠিক হল?'

বাবার দিকে তাকিয়ে অনিমেষ বলল, 'বুধবার।'

'টিকিট কাটা হয়েছে?' মহীতোষ কাগজের ওপর থেকে চোখ

সরাচ্ছিলেন না।

অনিমেষের মনে হল এখন বাবার চেহারাটা যেন আমূল পাল্টে গেছে, দুপুরে কুলিদের আক্রমণের সময়কার চেহারাটা যেন উধাও হয়ে গেছে। খুব গম্ভীর এবং চিন্তামগ্ন দেখাচ্ছে। ও বলল, 'না। হলদিবাড়ি থেকে থ্রু কোচ আসে সেটায় উঠব।'

'আর কেউ যাচ্ছে বন্ধুবান্ধব?'

'কয়েকজন যাবে কলকাতায় পড়তে, তবে একসঙ্গে যাবে কিনা জানি না।'

'যেতে পারবে তো একা?'

'হুঁ।'

'আমি সঙ্গে গেলে ভাল হত, তা নিজেই যাও। কেউ দেখিয়ে দিয়ে শেখার চেয়ে নিজে ঠেকে শিখলে লাভ হয় বেশী। আমার এক বন্ধু আছে, বউবাজারের কাছে থাকে, তাকে লিখেছি তোমার কথা। সে সাহায্য করবে। তাছাড়া তোমার ছোটকাকা আছে কলকাতায়। সে ব্যস্ত লোক — সময় পাবে কিনা জানি না। আমাকে হঠাৎ চিঠি দিয়েছে তুমি কলকাতায় পড়তে গেলে যেন ওকে জানানো হয়। বুধবার রওনা হবে — উম্, তাহলে এখনই টেলিগ্রাম করে দিতে হয় দেবব্রতকে। কোন্ কলেজে ভর্তি হবে?'

'জানি না। প্রেসিডেন্সি কলেজে—।'

'হ্যাঁ, প্রথমে ওখানেই চেষ্টা করবে দেবব্রত, না হলে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়বে। সায়েন্স নিয়ে ইন্টারমিডিয়েট পাস করে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হবে, এটাই আমার ইচ্ছা।'

'সায়েন্স!' অনিমেষ ঠোঁটটা কামড়াল, 'আমার ইচ্ছা আর্টস নিয়ে পড়ব। দাদুও চান ইংরেজীতে আমি যেন এম-এ পাশ কবি।'

সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে হাতের কাগজটা নামিয়ে রাখলেন মহীতোষ, 'না, না, আর্টস নিযে পড়লে সারা জীবন কষ্ট করতে হবে। এখন সায়েন্স ছাড়া কদর নেই, তোমাকে ডাক্তারী পড়তে হবে।'

অনিমেষ যেন চোখে আতঙ্ক দেখল, 'কিন্তু আমার যে আর্টস ভাল লাগে।'

হাত নেড়ে যেন মহীতোষ কথাটা উড়িয়ে দিলেন, 'শখের ভাল লাগা আর বেঁচে থাকা এক কথা নয়। আর্টস পড়ে এম-এ পাশ করে তুমি কি

করবে? স্কুল-কলেজে মাস্টারি? কত টাকা পাবে মাইনে? সারা জীবন কষ্ট পাবে, মনে রেখো। তাছাড়া আমার আর চাকরি করতে ভাল লাগে না। যদ্দিন না তুমি দাঁড়াচ্ছ ততদিন আমাকে করতে হবে। তাই ডাক্তারী পাশ করলে তোমার টাকার অভাব হবে না।'

অনিমেষ কোনরকমে ঢোঁক গিলে বলল, 'আমার অঙ্ক একদম ভালো লাগে না।'

মহীতোষ বললেন, 'চেষ্টা করলে সবকিছু সম্ভব। এই যে আমি, আমার কখনো ইচ্ছে ছিল না এই চা-বাগানে চাকরি করি। কিন্তু তোমার দাদুর পক্ষে আমাকে আর পড়ানো সম্ভব ছিল না তখন, আর আমাকে বাধ্য হয়ে এই চাকরি নিতে হল। তা চেষ্টা করে আমি তো অনেক বছর কাটিয়ে দিলাম। সেদিক দিয়ে তুমি ভাগ্যবান।'

অনিমেষ বলল, 'যদি ভাল রেজাল্ট না হয়?'

এবার মহীতোষ বড় বড় চোখে ছেলের দিকে তাকালেন, 'তাহলে বুঝব তুমি পড়াশুনায় যত্ন নাওনি, শোন. তোমার মা'র ভীষণ সাধ ছিল তোমাকে ডাক্তার করার।'

এই ধরনের একটা বোঝা ওর ওপর চাপিয়ে দেওয়া অনিমেষ কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না। এ ব্যাপারে যেন ওর কোন বক্তব্য থাকতে পারে না। বাবা এবং দাদু যা বলবেন তাই ওকে মেনে নিতে হবে। আর ওঁদের বক্তব্যের প্রতিবাদ করলেই অমোঘ অস্ত্রের মত মায়ের নাম করে একটা বক্তব্য চাপিয়ে দেওয়া হবে। যেন মা যা বলে গেছেন, ও তার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবে না। অনিমেষের সন্দেহ, মা সত্যিই এইসব বলে গিয়েছেন কি না। ওর স্থির বিশ্বাস, মা যদি আজ বেঁচে থাকতেন তাহলে নিশ্চয়ই সে তাঁকে বুঝিয়ে রাজী করাতে পারত। ও এখন কি করবে? যদি সে বাবাকে মুখের ওপর বলে দেয় যে সায়েন্স নিয়ে পড়া তার পক্ষে সম্ভব নয়, তাহলে কি বাবা তার কলকাতায় যাওয়া বন্ধ করে দেবেন, কি জানি! সংশয়ের দোলায় দুলতে দুলতে ও ঠিক করল, এ ব্যাপারে দাদুর ওপর নির্ভর করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। বাবা নিশ্চয়ই দাদুর মুখের ওপর কোন কথা বলতে পারবে না। অতএব এখন চুপ করে থাকাই ভাল।

মহীতোষ খবরের কাগজটা আবার তুলে নিলেন, যেন ও ব্যাপারে যা বলার তা বলা হয়ে গেছে. 'আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি তোমাকে মাসে

একশ কুড়ি টাকা পাঠালেই ভালভাবে চলে যাবে। দশ-বারো টাকার বেশী হাতখরচ লাগা উচিত নয়। আর বাজে ছেলেদের সঙ্গে একদম মিশবে না। কলকাতা হল এমন একটা জায়গা যেখানে একটু আলগা হলেই নষ্ট হয়ে যেতে বেশী সময় লাগে না। কলেজ ছাড়া হোস্টেলের বাইরে কোথাও যাবে না, আর কখনই ইউনিয়ন বা পলিটিক্যাল পার্টির সংস্রবে যাবে না। রাজনীতি একটি ছাত্রের জীবন যেভাবে বিষিয়ে দেয় অন্য কিছু সেভাবে পারে না। যা হোক, আমি চাই তুমি মাথা উঁচু করে আমার সামনে ডাক্তার হয়ে এসে দাঁড়াও।'

ছোটমা বোধ হয় আগে থেকেই বিছানাপত্র ঠিক করে রেখেছিলেন। মহীতোষের একটা পুরোনো হোল্ডল ছিল, সেটাই পরিষ্কার করে বিছানাপত্র ঢুকিয়ে বেঁধে দেওয়া হল। ঝাড়িকাকু সেটাকে মাথায় নিয়ে ওর সঙ্গে চলল। সকালে মহীতোষ তাঁর বন্ধু দেবব্রতবাবুর ঠিকানা লেখা একটা চিঠি দিয়ে দিয়েছেন অনিমেষকে। টেলিগ্রাম করে দেওয়া হয়েছে, যাতে তিনি অবশ্যই স্টেশনে আসেন। প্রিয়তোষকে তিনি পরে জানাবেন, যদি ভরতি হতে অসুবিধে হয় তবেই যেন ওর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। মহীতোষ ভাই-এর সাহায্য নেওয়া ঠিক পছন্দ করছেন না।

টাকা-পয়সা যত্ন করে ওর সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হল। ছোটমা বার বার করে এ ব্যাপারে সজাগ হতে বললেন ওকে। যাবার সময় যখন অনিমেষ ওঁদের প্রণাম করল, তখন মহীতোষ অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন, 'যখন যা দরকার হবে আমাকে জানিও, সঙ্কোচ করবে না।'

কুচবিহার থেকে আসা বাসে জিনিসপত্র তুলে ও যখন উঠতে যাচ্ছে তখন হঠাৎই ঝাড়িকাকু এল। এসে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। এতক্ষণ ধরে অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রেখেছিল অনিমেষ, কিন্তু কান্না বড় ছোঁয়াচে রোগ। তবু সে কোন রকমে ঝাড়িকাকুকে বলল, 'এই, তুমি কাঁদছ কেন?'

সমস্ত বাসের লোক অবাক হয়ে দেখল, ঝাড়িকাকু কান্না গিলতে গিলতে বলল, 'আমি আর বেশীদিন বাঁচব না রে, তোকে আর আমি দেখতে পাব না—তুই ফিরে এসে দেখবি আমি নেই, মরে গেছি।'

দাঁড়াতে পারল না অনিমেষ, ঠোঁট কামড়ে দ্রুত বাসে উঠে পড়ল।

বাসসুদ্ধ লোক এখন ওর দিকে তাকিয়ে আছে, সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। ঝাড়িকাকু সরে রাস্তার পাশে যেতেই বাসটা ছেড়ে দিল। দুহাতে নিজের গাল চেপে সেই বেঁটেখাটো প্রৌঢ় মানুষটাকে ওর দিকে তাকিয়ে থাকত দেখল সে। হঠাৎ ওর সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল, সত্যি যদি আর ঝাড়িকাকুকে না দেখতে পায়? চোখ বন্ধ করে ফেলল অনিমেষ।

হু-হু করে বাসটা ছুটে যাচ্ছে। সেই ইউক্যালিপটাস গাছগুলো—ওদের কোয়ার্টারগুলো,স্বর্গছেঁড়া লেখা বাগানের বিরাট বোর্ডটা যেন দৌড়ে দৌড়ে পেছনে চলে যেতে লাগল। ওদের বাড়ির বারান্দায় কি ছোটমা দাঁড়িয়ে ছিল? ঠিক বুঝতে পারল না অনিমেষ। সবুজ গালচের মত চা-বাগানটা যেন ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। দূরের ফ্যাক্টরী বাড়িটার ছাদ চোখে পড়ল। মহীতোষ বোধ হয় এতক্ষণে সেখানে ফিরে গিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছেন। হঠাৎ এই মুহূর্তে অনিমেষের বাবার জন্য হঠাৎ কষ্ট বোধ হল। ওর মনে হল ও যেন বাবাকে ঠিক বুঝতে পারেনি। কেমন একা একা হয়ে আছেন উনি, সেখানে অনিমেষ কেন, ছোটমাও কোনদিন পৌঁছাতে পারেনি।

পিতাপুত্রের মধ্যে সন্তোষজনক কথাবার্তা হয়েছে শুনে সরিৎশেখর খুশি হলেন। ঠিক এইরকমটাই চাইছিলেন তিনি। পিতামাতার আশীর্বাদ ছাড়া কোন সন্তান বড হতে পারে না, এই কথাটা তিনি বার বার করে বলতে লাগলেন.তোমার মায়ের কাছ থেকে যখন তোমায় আমি চেয়ে এনেছিলুম তখন তুমি এই একটুখানি ছিলে। সেই থেকে তোমাকে বুকে আগলে এত বড় করেছি। এখন তুমি ভালভাবে পাস করেছ, কলকাতায় পড়তে যাচ্ছ, আমার দায়িত্ব শেষ। আমি তো কেয়ারটেকার হয়ে ছিলাম. কাজে ফাঁকি দিইনি কখনো।

কোত্থেকে দুধ যোগাড় হল কে জানে. পিসীমা পায়েসের ব্যাপারে বিকেল থেকে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। জয়াদি নেই। এখন যে কি হয়েছে, জয়াদি প্রায়ই বাপেরবাড়ি যাচ্ছেন। জয়াদির বর একা-একাই থাকেন, সুনীলদা মারা যাবার পর সেই যে তার বাবা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন, আর কোন নতুন ভাড়াটে আসেনি। শোনা যাচ্ছে সরকার এই বাড়ি ছেড়ে চলে

যাবে। হয়তো তাতে দাদুর ভালোই হবে, কারণ দাদু প্রায়ই অভিযোগ করতেন যে সরকার তাঁকে কম ভাড়া দিচ্ছে। কিন্তু আবার নতুন ভাড়াটের সঙ্গে যোগাযোগ করা, এবং ভাড়া ঠিক করা এবং তাতে যে সময় যাবে সেটা ম্যানেজ করা—দাদুর সাহায্য করার কোন লোক যে এখানে নেই। দাদুর দিকে তাকালেই আজকাল বোঝা যায় যে বয়স তাঁকে চারপাশ থেকে কামড়ে ধরেছে। ভীষণ কষ্ট হল অনিমেষের দাদুর জন্য।

এখান থেকে চলে গেলে আর কিছু না হোক দুজন মানুষকে ছেড়ে যেতে হবে যাঁরা তাকে আগলে রেখেছিলেন। পৃথিবীর আর কোথাও গিয়ে, জীবনের কোন সময়ে কি আর কাউকে সে পাবে এমন করে যে তাকে ভালবাসবে।

খোলা উঠোনে দাঁড়িয়ে সে মুখ তুলে পরিষ্কার আকাশের দিকে তাকাল। দূরে এক কোণায় বাচ্চা মেয়ের কাঁপা হাতে পরা বাঁকা টিপের মত অর্ধেক চাঁদ আকাশে আটকে আছে।মাথার ওপর অনেক তাবার ভিড়। যেন হইচই পড়ে গেছে সেখানে। আজ অনেকদিন পর কেন বার বার ছেলেটাকে মনে পড়ে যাচ্ছে? এই রকম তারার রাতে সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকত সেখানে অনেক তারার মধ্যে একটা তারা খুব জ্বলজ্বল চোখ করে তাব দিকে তাকাত আর কিছুক্ষণ চোখাচোখি হওয়ার পর সেই তারাটা যখন মায়ের মুখ হয়ে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলত, সে-সময় ওই তারাটাকে না দেখতে পেলে ওব কান্না পেত। এখন অনিমেষ আকাশের দিকে মুখ করে অনেক তাবার মধ্যে সেই তাবাটাকে খুঁজতে চাইল। আশ্চর্য, তারাও পাল্টে যায় নাকি! কারণ ওখানে অনেকগুলো জ্বলজ্বলে তারা একসঙ্গে জ্বলছে, কাউকে আলাদা করা যাচ্ছে না।

এখন আর তেমন করে মায়ের কথা মনে পড়ে না। মায়ের ছবি আছে, খুব সুন্দর চেহারা। মাঝে মাঝে সেদিকে তাকালে নিজেকে খুব একা মনে হয় কিন্তু তার বেশি নয়। তার একটা ভাই হতে যাবার আগেই দুর্ঘটনায় মা মারা গেছেন —এই খবরটা আর কোন ভাবপ্রবণ ঘটনার মধ্যে তাকে টেনে নিয়ে যায় না।

অনিমেষ উঠোন পেরিয়ে পাশের দরজা খুলে বাড়ির সামনে চলে এল। আশেপাশের সব বাড়ির আলো নিবে গেছে। এখন আর মাইকের শব্দ শোনা যাচ্ছে না যেটা সন্ধ্যেবেলায় ছিল। অনিমেষ ঢেঁকিরশাকের জঙ্গলটা

ছাড়িয়ে ভাড়াটের ঘরের সামনে ওদের সদর দরজার দিকে এগোল। চাঁদটা বোধ হয় সামান্য ওপরে উঠেছে, কারণ এখন চারদিক মশারির মধ্যে ঢুকে দেখলে যেমন দেখায় তেমন দেখাচ্ছে। অন্যমনস্ক হয়ে কয়েক পা হেঁটে সামনে তাকাতে ওর চোখ যেন ঝাপসা দেখাল। জয়াদির ঘরের সামনে বারান্দায় কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে। ওপাশের থামের গায়ে হেলান দিয়ে যে আকাশের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে সে যে জয়াদি তা বুঝতে দেরি হল না অনিমেষের। জয়াদি ওখানে কি করছে? এভাবে কেন জয়াদি দাঁড়িয়ে থাকবে? মানুষের যখন খুব দুঃখ হয় তখনই এরকম ভঙ্গীতে সে দাঁড়াতে পারে— অনিমেষ এটুকু বুঝতে পারছিল। জয়াদিকে ডাকতে গিয়ে থেমে গেল সে।

অনিমেষ নিঃশব্দে আবার নিজের ঘরের দিকে চলল। দবজা বন্ধ করে ও যখন উঠোন পেরিয়ে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াচ্ছে তখনই সরিৎশেখরের ঘরের দরজা খুলে গেল। অনিমেষ দ্রুত নিঃশব্দে জায়গাটা পেরিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে গিয়ে আলো নেবাল। এখন এত রাত্রে দাদু তাকে দেখলে অনেক রকম প্রশ্নের সামনে পড়তে হবে। তার চেয়ে সে শুয়ে পড়েছে এটা বুঝতে দেওয়া ভাল।

খাটে শুয়ে সে অন্ধকার ঘরে চুপচাপ কিছুক্ষণ পড়ে থাকল। না, আজ রাত্রে ওর কিছুতেই ঘুম আসবে না। অন্ধকার ঘবেব দেওয়ালে কাঁচের জানলায চোখ বোলাতে গিয়ে সে শক্ত হয়ে গেল। একটা মুখ কাঁচের জানলার বাইরে থেকে মুখ চেপে ভেতরটা দেখবার চেষ্টা করছে। কে? চোর নয় তো! সঙ্গে সঙ্গে ওর মেরুদণ্ডে যেন একটা ভয় ঠান্ডা অনুভূতি নিয়ে ঘোরাফেরা করতে লাগল। বিছানা থেকে ওঠার ক্ষমতাটা সে এই মুহূর্তে হারিয়ে ফেলেছে, গলা থেকে কোন শব্দ বেরুচ্ছে না। বাইরের জ্যোৎস্নার পটভূমিতে ভেতর থেকে একটা আবছা অন্ধকার মেশানো মুখের ছায়া কাঁচের ওপর লেপ্টে আছে এখনও। সে কি করবে? অনিমেষ অনেক চেষ্টা করে যখন উঠে বসতে পারল তখন আর ছায়াটা জানালায় নেই। কাঁপুনি শরীরে নিয়ে অনিমেষ আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর পা টিপে টিপে সে জানালার পাশে এসে দাঁড়াল। বাইরে জ্যোৎস্নায় এখন উঠোনটা পরিষ্কার হয়ে আছে। অনিমেষ প্রথম চমকটা কাটিয়ে উঠে খুব ধীরে হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে যাওয়া শরীরটাকে

দেখতে পেল। এই শরীরটাকে সে জন্ম থেকে জানে। দাদুর এই রকম হেঁটে যাওয়া অসহায় ভঙ্গী সে আগে কখনো দেখেনি, লাঠি না নিয়ে দাদু এসেছিলেন। অনিমেষ বুঝতে পারছিল না, সরিৎশেখর এত রাত্রে এই জানালায় মুখ দিয়ে কি দেখছিলেন?

খাওয়া-দাওয়ার পর থেকেই সরিৎশেখর তাড়া দিচ্ছিলেন। সেই কোন সন্ধ্যেবেলায় ট্রেন অথচ দাদু এমন করে তাডা দিচ্ছেন যেন আর সময় নেই। জিনিসপত্র গুছিয়ে বাইরে রাখা আছে। দাদু গিয়ে একজন পরিচিত রিকশাওয়ালাকে বলে এসেছেন, সে খানিক আগে এসে বসে আছে। অনিমেষ দেখল ট্রেন ছাড়তে এখনও আড়াই ঘণ্টা বাকি। আজ জলপাইগুড়ি শহরে হরতাল বিচ্ছিন্ন ভাবে হয়েছে। দিনবাজার এলাকায় দোকান বন্ধ করা নিয়ে মারামারি হয়েছে। তবে অন্যদিনের চেয়ে আজকের দিনটা আলাদা সেটা বোঝা গিয়েছিল। রিকশা চলেছে তবে তা সংখ্যায় অল্প। সরকারী অফিস বা স্কুলগুলো হয়নি। কিন্তু সিনেমা হল খোলা ছিল— সরিৎশেখর রিকশাওয়ালার কাছ থেকে এইসব সংবাদ আরো বিশদভাবে জেনে নিচ্ছিলেন।

নিজের ঘরে অনিমেষ যখন জামাকাপড় পরছে তখন হেমলতা দরজায় দাঁড়িয়ে। তাঁর মুখটা থমথম করছে, 'শেষ পর্যন্ত অনিবাবা কলকাতায় চললি?'

অনিমেষের বেশি কথা বলতে ভয় করছিল, ও চেষ্টা করে হাসল।

'গিয়েই চিঠি দিয়ে খবরাখবর জানাবি আর প্রত্যেক সপ্তাহে যেন চিঠি

পাই।' হেমলতা মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন।

'আচ্ছা।' অনিমেষ চুল আঁচড়াতে লাগল।

'বেশী বাইরে ঘুরবি না, বাজে আড্ডা দিবি না। যত তাড়াতাড়ি পড়াশুনা শেষ করে চলে আসতে পারিস সেই চেষ্টা করবি। তোর যা খাওয়াদাওয়ার ধরন—ওখানে পেট পুরে খেতে দেবে কিনা জানি না।'

'বাঃ, খেতে দেবে না কেন?' অনিমেষ বলল।

হেমলতা চুপ করে রইলেন।

অনিমেষের হয়ে গেলে হেমলতা ওর হাত ধরে ঠাকুরঘরে নিয়ে গিয়ে প্রণাম করতে বললেন। পিসীমার মন বুঝে অনিমেষ মাটিতে মাথা ঠেকাতে ওর চুলে হাত পড়ল। অনিমেষ শুনল বিড়বিড় করে পিসীমা মন্ত্র বলে যাচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত একটা ডুকরে-ওঠা কান্নার মাঝখানে পিসীমা বললেন, 'ঠাকুরের সামনে বসে তুই আমাকে কথা দে যে এমন কিছু করবি না যাতে তোর জেল হয়। বল আমাকে ছুঁয়ে বল।'

গলা বুজে এসেছিল অনিমেষের, কোন রকমে বলল, 'আচ্ছা'।

'আচ্ছা না, আমাকে ছুঁয়ে বল, কথা দিলাম।' পিসীমা ওর হাতে ধরলেন।

আর সেই সময় সরিৎশেখরের চিৎকার শোনা গেল, 'কি হল তোমাদের, তখন থেকে বলছি কেউ শুনছ না। এদিকে ট্রেনের সময় যে হয়ে এল।'

অনিমেষ উঠে দাঁড়িয়ে পিসীমাকে প্রণাম করল, 'আরে আগে আমাকে কেন, বাবাকে করবি তো।' বলতে বলতে অনিমেষকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। আর সেই মুহূর্তে কান্নার কোন সঙ্কোচ থাকল না।

সরিৎশেখর আর অপেক্ষা করতে রাজী নন। পিসীমাকে নিয়ে অনিমেষ বাইরে বেরিয়ে এল। জয়াদি ওঁদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে। আজ সকালে জয়াদির সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা হয়েছে। একবারও কালকের কথা তোলেননি তিনি, অনিমেষও ঘুণাক্ষরে জানায়নি কাল রাতে সে ওঁকে দেখেছে। যা কিছু গল্প কলকাতাকে নিয়ে। এখন চোখাচোখি হতে জয়াদি ম্লান হাসলেন,'চললে?'

মাথা নাড়ল অনিমেষ। বুকের মধ্যে এখন একটা সমুদ্র ফুঁসছে— যে কোন মুহূর্তেই বাঁধ ভেঙে যেতে পারে। মুখ ফিরিয়ে অনিমেষ দেখল তার

জিনিসপত্র রিকশায় তোলা হয়ে গিয়েছে। দাদু পিসীমার কেচে দেওয়া লংক্লথের পাঞ্জাবি আর মিলের ধুতি পরে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। ওকে দেখে আর একবার ঘড়ি দেখে নিলেন,'তাড়াতাড়ি কর। এই সময় যোগটা খুব ভাল আছে।'

জয়াদি বললেন, 'আপনি স্টেশনে যাচ্ছেন তো?'

সরিৎশেখর রিকশার দিকে এগোতে এগোতে বললেন,' কালীবাড়িতে যেতেই হবে, কাছেই যখন, ঘুরে আসি।'

অনিমেষ পিসিমার দিকে ফিরে বলল,'পিসীমা, আমি যাচ্ছি।'

পেছন থেকে জয়াদি বলে উঠলেন,'যাচ্ছি বলো না, বলো আসছি।'

হেমলতা চট করে থানের আঁচল হাতে জড়িয়ে দাঁত দিয়ে চেপে ধরে সে অবস্থায় ঘাড় নাড়লেন। ছোট ছোট পা ফেলে অনিমেষ বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে রিকশায় চাপল, ঘাড় ঘুরিয়ে সে আবাব নিজেদের বারান্দার দিকে তাকাল। বিকশা এখন চলতে শুবু করেছে। আশ্চর্য, পিসীমা এখন এই মুহূর্তে আর বারান্দায় নেই। কেমন খাঁ খাঁ করছে জায়গাটা। নিঃশব্দে টপটপ করে জল পডতে লাগল অনিমেষের দু-গাল বেয়ে।

রিকশাটা যখন টাউন ক্লাবের কাছ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে তখন অনিমেষ পাশে বসা সরিৎশেখরের গলা শুনতে পেল, 'তোমাকে অনেক দূরে যেতে হবে অনিমেষ। এইভাবে ভেঙে পড়লে চলবে না। চোখেব জল মুছে ফেল।' চট করে শক্ত হয়ে গেল অনিমেষ। পাশাপাশি রিকশায় বসে সে দাদুর শরীর থেকে আর্ণিকা হেয়ার অয়েলের গন্ধ পেল। গন্ধটা ওকে এক লহমায় অনেকদিন আগে যেন টেনে নিয়ে গেল। যেদিন সরিৎশেখর ওর সঙ্গে স্বর্গছেঁড়ার রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কলকাতায় যাবার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। এখন জরা এসে শরীর দখল করা সত্ত্বেও এই মুহূর্তে সেই মানুষটি যেন একটুও পাল্টায়নি। কাল রাত্রে দেখা সেই সরিৎশেখরকে এখন চেনা অসম্ভব।

টাউন ক্লাবের মাঠ, পি ডব্লিউ ডি'র অফিস, করলা নদীর পুল পেরিয়ে রিকশাটা এফ ডি আই স্কুলের মোড়ে চলে এল। এখন বিকেল। দোকানপাট এ চত্বরে অন্যদিনের মত খোলা। হরতাল শেষ হবার কথা ছটায়—কিন্তু দেখে মনে হয় এখানে হরতাল আদৌ হয়নি। রাস্তাঘাটে লোকজন আড্ডা মারছে। এত দূর পথ এল, আশ্চর্য, একটাও চেনা মুখ ওর চোখে পড়ল না।

স্টেশনের সামনেটা জমজমাট। রেডিও বাজছে দোকানে। রিকশা থেকে নেমে ওরা মালপত্র নিয়ে প্ল্যাটফর্মে এলো। সরিৎশেখর চশমার খাপ থেকে টাকা বের করে ফাঁকা কাউন্টারে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটলেন। ট্রেন আসতে অনেক দেরি। প্ল্যাটফর্মে লোকজন বেশী নেই। কুলিকে জিজ্ঞাসা করে থ্রু কোচ কোথায় দাঁড়ায় জেনে সেখানে মালপত্র নামানো হল। পেছনেই একটা বেঞ্চি, সরিৎশেখর সাবধানে সেখানে বসে নাতিকে পাশে ডাকলেন।

'তোমার পিসী যে খাবার দিয়েছে রাস্তায় তাই খেয়ো, বুঝলে?' দাদুর কথা শুনে অনিমেষ ঘাড় নাড়ল। দু পায়ের মধ্যিখানে লাঠিটাকে রেখে হাতলের ওপর গলা চেপে সরৎিশেখর কথা বলছেন, 'টাকা-পয়সা সব সাবধানে নিয়েছ তো?'

'হ্যাঁ।'

'গিয়েই চিঠি দেবে।'

'আচ্ছা।'

'যে ভদ্রলোক তোমায় নিতে আসবেন তিনি তোমাকে চিনবেন কি করে তাই ভাবছি, কোনদিন দেখেননি তো!'

'টেলিফোন বুথের সামনে মালপত্র নিয়ে দাঁড়াতে হবে। আমার বর্ণনা দিয়ে ওঁকে চিঠি লিখেছেন। তাছাড়া ওঁর ঠিকানা আছে আমার কাছে।'

'জানি না কি হবে। কলকাতায় ঠিকানা খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। উটকো লোকের কথায় কান দিও না।'

'কিছু হবে না।'

'তোমার কি সব ফাঁড়া আছে শুনেছি—রাজনীতি থেকে দূরে থেকো। আমাদের মত লোকের ওসব মানায় না।'

অনিমেষ কোন জবাব দিল না। অনেকদিন বাদে দাদুর পাশে বসে এইভাবে কথা বলতে ওর ভারী ভাল লাগছিল। এতদিন ধরে এক বাড়িতে থাকা সত্ত্বেও তিল তিল করে যে ব্যবধান তৈরী হয়ে গিয়েছিল সেটা এখন হঠাৎই যেন মিলিয়ে গেছে। অনিমেষ চুপচাপ বসে থাকল।

কুলিদের চিৎকারে, যাত্রীদেব ব্যস্ততায় একসময় স্টেশনটা চঞ্চল হয়ে উঠল।এত কুলি কোথায় ছিল কে জানে—অনিমেষ ট্রেন-টাইম ছাড়া কখনো এদের দেখতে পায়নি। সবিৎশেখর বেঞ্চি ছেড়ে সামান্য এগিয়ে

ঝুঁকে বাঁদিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন,'সিগনাল দিয়েছে দেখছি, রেডি হও।'

কথাটা শুনেও অনিমেষ উঠতে চেষ্টা করল না। ওর মনে হচ্ছিল বুঝি জ্বর এসে গেছে শরীরে, হাত পা কেমন ভারী বলে বোধ হচ্ছে। যাবার সময় যত এগিয়ে আসছে— অনিমেষের এখন খুব ইচ্ছে করছিল ট্রেনটা দেরি করে আসুক। অথবা আজ তো ট্রেনটা নাও আসতে পারত। কত কি তো পৃথিবীতে রোজ হয়ে থাকে।

এই সময় বেশ কিছু মালপত্র নিয়ে একটি পরিবার যেন সমস্ত প্ল্যাটফর্মে আলোড়ন তুলে এদিকে এগিয়ে এল। অনিমেষ দেখল কুলিকে শাসন করতে করতে একজন মহিলা আগে আগে আসছেন, তাঁর পেছনে বয়স্ক রোগা এক ভদ্রলোক আর ওদের বয়সী অতিরিক্ত স্বাস্থ্যবতী একজন মেয়ে। মুখ দেখলেই বোঝা যায় মেয়েটি মহিলার কন্যা। ওর সামনে এসে কুলি বলে উঠল,'খাড়াইয়ে মেমসাব। থুরু গাড়ি ইহাই লাগে গা।'

মহিলা সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ঘুরিয়ে ভদ্রলোককে ডাকলেন,'আঃ, একটু তাড়াতাড়ি এসো না, ওকে হেল্প কর।' কিন্তু ততক্ষণে কুলি নিজেই মালপত্র নামিয়ে নিয়েছে।ভদ্রলোক কাছে এলে মহিলা বললেন, 'পই পই করে বললাম ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কাটো— চিরটাকাল কিপ্টেমি করে কাটালে। এখন এই পাহাড় নিয়ে গুঁতোগুঁতি করে ছোটলোকের মত থার্ড ক্লাসে ওঠ, নিজে তো এখানে ফূর্তি লুটবেন।'

ভদ্রলোক চাপা গলায় বলে উঠলেন,'আঃ, কি হচ্ছে কি, এটা স্টেশন! আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয় তুমি জান। আর মেয়েরা একা থার্ড ক্লাসেই সেফ।'

অনেকক্ষণ থেকেই অনিমেষ সোজা হয়ে বসেছিল। ওরা যখন প্রথম এদিকে এগিয়ে এসেছিল তখন ও বুঝতে পারেনি, কিন্তু মহিলাকে খুব পরিচিত বলে মনে হচ্ছিল। কোথায় ওঁকে দেখেছে এটাই মনে করতে পারছিল না সে। কিন্তু যেই উনি কথা বলতে শুরু করলেন তখনিই তিস্তার চরের সেই সকালবেলার ট্যাক্সিটা ওর চোখের সামনে এসে দাঁড়াল। সেই কাবুলিওয়ালাদের গান, তার শরীরে ভার রেখে বসা এই মহিলা, সেই গুড-বয়-মার্কা ছেলেটি আর সর্বদা ঠুকে কথা বলা ভদ্রলোক— ও স্পষ্ট দেখতে পেল। অনিমেষ তখনই এই ভদ্রলোকের দিকে লক্ষ্য করল, কোন মানুষের চেহারা এত পাল্টে যায়? কি রোগা এবং কালো হয়ে গেছেন ইনি,

পরনে প্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট। এঁকে একা দেখলে সে কখনই চিনতে পারত না। অথচ মহিলাটি একই রকম আছেন, তেমনি স্লিভলেস ব্লাউজ, কড়া প্রসাধন আর মেজাজী কথাবার্তা। তুলনায় ভদ্রলোক অনেক নিষ্প্রভ, ওঁকে দেখলেই মনে হয় ইদানীং খুব অর্থকষ্টে রয়েছেন। ওঁরা ওকে চিনতে পারেননি, কয়েক বছর আগে সামান্য এক ঘণ্টার সঙ্গীকে মনে রাখার কথাও নয়। অনিমেষের সেই কুষ্ঠ রোগীটার কথা মনে পড়ল। ওকে হাত দিয়ে জল থেকে টেনে তুলেছিল বলে ভদ্রলোক কার্বলিক সাবান ব্যবহার করতে বলেছিলেন। হাসি পেল অনিমেষের, সে-সব না করেও তো ও অক্ষত আছে। সেদিন ভদ্রমহিলা ওর ছোঁয়াচ বাঁচাতে ভদ্রলোকের সঙ্গে ঝগড়া মিটিয়ে নিয়েছিলেন।

সরিৎশেখর ফিরে এসে বেঞ্চিতে বসে বললেন,'বেশ ভিড় হচ্ছে, হরতাল বলে লোকে আজকাল ভয় পায় না।' এই সময় মহিলার বোধ হয় বেঞ্চিটা নজরে পড়ল। তিনি মেয়েকে নিয়ে বাকি বেঞ্চিটা দখল করলেন। কাছাকাছি হতেই অনিমেষ সেই মিষ্টি গন্ধটা টের পেল, ট্যাক্সিতে বসে যেটাকে ফুলের বাগান বলে মনে হয়েছিল। কি আশ্চর্য, এতগুলো বছরেও তিনি গন্ধটাকে সযত্নে বাঁচিয়ে রেখে এসেছেন। সরিৎশেখরের মুখের পাশটা দেখতে পাচ্ছিল অনিমেষ, তিনি অস্বস্তি বোধ করছেন।

এই সময় ভদ্রলোক কিছু করতে হবে বলেই যেন যেচে কথা বললেন, 'আপনারা কলকাতায় যাচ্ছেন?'

সরিৎশেখর তাঁর দিকে একটু লক্ষ্য করে ঘাড় নাড়লেন,'না, আমার নাতি একাই যাচ্ছে।'

ভদ্রলোক অনিমেষকে জিজ্ঞাসা করলেন,' তুমি বুঝি কলকাতায় পড়?'

সরিৎশেখরই জবাবটা দিলেন,'ও এবার ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করেছে, কলকাতায় কলেজে ভরতি হতে যাচ্ছে।'

'বাঃ, গুড! আমার মেয়েও বেরিয়েছে এবার, তবে ও শান্তিনিকেতনে পড়বে। ওর মা আর ও যাচ্ছে— বোলপুরে নামবে।'

ভদ্রলোক কথা শেষ করা মাত্রই মহিলা বলে উঠলেন,'বোলপুরে আমার ভাই থাকে, খুব বড় প্রফেসর। তা তুমি ভাই বোলপুর অবধি আমাদের একটু হেল্প করো, কি করবে তো?'

অনিমেষ মাথা নাড়ল। সে দেখল দাদু সামনের দিকে মুখ করে বসে

আছেন আর মহিলার হাসি হাসি মুখের পেছনে ওর মেয়ে ভ্রূ কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। 'কি নাম তোমার, ভাই?' মহিলা আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

'অনিমেষ।' নাম বলে অনিমেষ একটু আশা করল ওরা হয়তো চিনতে পারবেন।

এক সময় প্ল্যাটফর্মটা চঞ্চল হয়ে উঠল। দূরে আশ্রমপাড়া ছাড়িয়ে কোথাও ইঞ্জিনটা হুইসিল দিয়ে এগিয়ে আসছে। ওদিকের আকাশে কালো ধোঁয়া পাক খাচ্ছে। সরিৎশেখর এতক্ষণে কথা বললেন,'তোমার ট্রেন এসে গেছে।'

হইহই চেঁচামেচির মধ্যে ট্রেনটা প্ল্যাটফর্ম জুড়ে দাঁড়াল। গাড়িটা কিন্তু আজ একদম খালি, এমন কি থ্রু-কোচেও ভিড় নেই। অনিমেষ নিশ্চিন্তে জানালার পাশে একটা জায়গা পেয়ে জিনিসপত্র রেখে নিচে নামতে যাবে এই সময় ভদ্রমহিলা কন্যাসমেত উপরে উঠে এলেন। অনিমেষকে দেখে বললেন,'জায়গা পেয়েছ?' ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলল সে। 'বাথরুমটা কোথায়? জল-টল আছে কিনা কে জানে!' কথাটা যেন শুনতে পায়নি এমন ভঙ্গীতে অনিমেষ নিচে নেমে এল। ওর মনে হচ্ছিল যাওয়াটা খুব সুখকর হবে না, এই মহিলা ওকে আচ্ছা করে খাটাবেন।

প্ল্যাটফর্মে দাদু দাঁড়িয়েছিলেন। ওকে নেমে আসতে দেখে বললেন, 'টিকিটটা তোমাকে দিয়েছি তো?'

অনিমেষ বলল,'হ্যাঁ।'

'তুমি গিয়েই চিঠি দেবে।'

'আচ্ছা।'

'আর বাইরের লোকের সঙ্গে বেশী আত্মীয়তা করার কোন প্রয়োজন নেই। সবার সঙ্গে মানসিকতায় নাও মিলতে পারে।'

অনিমেষ দাদুর দিকে তাকাল। ও চলে যাচ্ছে অথচ দাদুর মুখ দেখে মনে হচ্ছে না তিনি একটুও দুঃখিত। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর সরিৎশেখর বললেন, 'এবার তুমি উঠে পড়, এখনই ট্রেন ছেড়ে দেবে। জিনিসপত্র নজরে রাখবে—পথে চুরি-টুরি খুব হয়।'

এবার অনিমেষ নিচু হয়ে সরিৎশেখরকে প্রণাম করল। ওর হাত তাঁর শুকনো পায়ের চামড়া যেটুকু কাপড়ের জুতোর বাইরে ছিল সেখানে

রাখতেই ও মাথায় স্পর্শ পেল। সরিৎশেখর দু'হাত দিয়ে তার মাথা ধরে বিড়বিড় করে কিছু কথা উচ্চারণ করছেন। অনিমেষ শেষ বাক্যটি শুনতে পেল,'বিদ্যা দাও, বুদ্ধি দাও, হৃদয় দাও।' ও ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াতেই, সমস্ত শরীর সিরসির করে বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল, অনিমেষ আর নিজেকে সামলাতে পারল না, ঝরঝর করে জল দু'চোখ থেকে গালে নেমে এল। সরিৎশেখর সেদিকে তাকিয়ে খুব নিচু গলায় বললেন,'চোখ মোছ অনিমেষ, পুরুষমানুষের কান্না শোভা পায় না।'

নিজেকে সামলাতে কষ্ট হচ্ছিল ওর, ঠোঁট বেঁকে যাচ্ছিল। এই মানুষটির সঙ্গে আজন্মকাল তার কেটেছে, তাব সব কিছু শিক্ষা এঁর কাছে, অথচ আজ অবধি সে এঁকে ঠিক চিনতে পারল না। সরিৎশেখর ধীরে ধীরে একটা হাত তুলে অনিমেষের কাঁধে রাখলেন,'অনিমেষ, আমি অশিক্ষিত এবং খুব গরীব। কিন্তু আমার পিতাঠাকুব আমাকে বলেছিলেন মানুষ হতে। আমি চেষ্টা করেছি, তোমাকেও সেই চেষ্টা করতে হবে। তুমি কলকাতায় গিয়ে শিক্ষিত হও, তোমার স্থিতি হোক সেটাই আমার আনন্দ। আমি যা পারিনি, আমার ছেলেরা যা করেনি তুমি তাই কর। মানুষের জন্ম পূর্ণতার জন্যে, তোমার মধ্যেই সেটা আমি পেতে পারি। আমার জন্যে ভেবো না, যতদিন তুমি মাথা উঁচু করে না ফিরে আসছ ততদিন আমি বেঁচে থাকব। আই উইল ওয়েট ফর ইউ। যাও, তোমাব গাড়ি হুইসল দিয়েছে।'

'দাদু, আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।'

'হয় ভাই, সহ্য করে নিলেই আনন্দ। যে-কোন সৃষ্টির সময় যন্ত্রণা যদি না আসে তাহলে সে সৃষ্টি বৃথা হয়ে যায়। তোমার আজ নতুন জন্ম হতে যাচ্ছে—কষ্ট তো হবেই।' সরিৎশেখর বললেন।

এই মুহূর্তে অনিমেষের অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করছিল, এই মানুষটিকে জড়িয়ে ধরে ছেলেবেলায় সে যেমন ঘুমোত তেমনি কিছু করতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু সে কিছুক্ষণ পাথরের মত মুখটার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে ফিরে দাঁড়াল। ও দেখল সেই ভদ্রলোক ট্রেন থেকে নেমে আসছেন। উনি কখন উঠেছিলেন তা সে লক্ষ্য করেনি। ভদ্রলোক নেমে বললেন,'উঠে পড় ভাই, গাড়ি এখনই ছাড়বে।'

একটা একটা করে সিঁড়ি ভেঙে অনিমেষ দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। সরিৎশেখর এগিয়ে এলেন, 'চিঠি দেবে। আর হ্যাঁ, মহীকেও লিখবে।'

অনিমেষ ঘাড় নাড়ল।খুব আস্তে ট্রেনটা চলছে। সরিৎশেখর লাঠি হাতে ওর সামনে হাঁটছেন। অনিমেষ কান্না গিলতে গিলতে বলল,'দাদু!'

সরিৎশেখর বললেন,'এসো ভাই। আমি অপেক্ষা করব।'

এক সময় আর তাল রাখতে পারলেন না সরিৎশেখর। ট্রেনটা গতি নিয়েছে। খানিক এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। সন্ধ্যের অন্ধকার নেমে এসেছে পৃথিবীতে। অনিমেষ ঝুঁকে পড়ে দাদুকে দেখতে লাগল। অনেক লোকের ভিড়ে নিঃসঙ্গ মানুষটা একা দাঁড়িয়ে আছেন। ও হাত নাড়তে গিয়ে থমকে গেল, সরিৎশেখর ডান হাতের পাঞ্জাবিতে নিজের চোখ মুছে পেছন দিকে হাঁটতে আরম্ভ করেছেন। অনিমেষ আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। হঠাৎ সমস্ত চরাচর যেন অস্পষ্ট, একটা সাদা পর্দার আড়ালে চলে গেল। স্টেশনের আলো, মানুষ সব মিলেমিশে একটা পিণ্ড হয়ে ছিটকে সরে গিয়েছে কখন, জলপাইগুড়ি শহরের বাড়ি-ঘর-দোর কেমন ছায়া-ছায়া পাণ্ডাপাড়ার রেলক্রসিং বোধ হয় হুস করে বেরিয়ে গেল। যে কালো রাতট চুপচাপ জলপাইগুড়ির ওপর নেমে এসেছে, এই ছুটন্ত ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়ে অনিমেষ তাকে দেখতে পাচ্ছিল না। দৃষ্টি যখন অগম্য হয় তখন কল্পনা স্রষ্টা হয়ে যায়। কিন্তু চোখের জলের আড়াল চোখেব এত কাছে যে অনিমেষ দাদুর মুখকেই ভাল করে তৈরী করে নিতে পারছিল না। সন্ধ্যে পার হওয়ায় বাতাস এসে ওর ভেজা গালে শুধুই শীতলতা এনে দিচ্ছিল। অনিমেষ চোখ মোছার চেষ্টা কবল না।

॥ শেষ ॥